অন্তর্ভারতীয় পুস্তকমালা

নালুকেট্টু

লেখক

এম. টি. বাসুদেবন্ নায়ার

অনুবাদিকা

নিলীনা আব্রাহাম

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া

নয়া দিল্লী

ভূমিকা

কেরলের ভাষা মালয়ালমের প্রথম উপন্যাস হ'লো "কুন্দলতা"—লেখক আপ্পু নেডুঙ্গাডী। অবাস্তব কাহিনী আর রোম্যান্সে ভরা এই উপন্যাসের কাঠামোটা কিন্তু ছিল নতুন ধরণের। উপন্যাসের আখ্যানভাগের অনেকখানিই সেক্সপীয়ারের 'সিম্বেলিন' এবং স্কটের 'আইভ্যানহো' থেকে নেওয়া। উপন্যাসের কাহিনী সুখপাঠ্য হলেও এর ঘটনা এবং চরিত্রগুলি স্থানীয় নয় বলে উপন্যাসের বাস্তবতা অনেকখানি নষ্ট হয়েছে।

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে লেখা কুন্দলতার বিষয়বস্তু অবাস্তব রোম্যান্স কাহিনী ; কিন্তু তার দু'বছর পরেই লেখা চান্দ মেননের ইন্দুলেখা। ইন্দুলেখায় কিন্তু এই অবাস্তবতা আর রোম্যান্সের দর্শন মেলে না। ইন্দুলেখার কাহিনী উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকের কেরালা সমাজের আলেখ্য।

বর্তমান উপন্যাসে লেখক একটা মাতৃমুখ্য বৃহৎ একান্নবর্তী নায়ার পরিবারের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। কেমন ভাবে এই মধ্যযুগীয় প্রথা আজকের সমাজে অচল হয়ে পড়েছে এই উপন্যাসে লেখক তারই একটা আশ্চর্য ছবি এঁকেছেন। একটি একান্নবর্তী মাতৃমুখ্য নায়ার সমাজের ভাঙন এবং বর্তমান কালের ব্যবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর অসুবিধা—এই হলো উপন্যাসের বিষয়বস্তু। তাই নায়ার সমাজের একটা সামাজিক পটভূমিকা পাঠকদের দেওয়া আমি আবশ্যক বলে মনে করি।

অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে ভারতবর্ষের উত্তর দিক থেকে আর্যবৈদিক ব্রাহ্মণদের আসার আগে কেরালার সমাজে বর্ণবিভাগ বলে কিছু ছিল না। জীবিকানির্বাহের ভিত্তিতে অবশ্য কিছুটা বিভাগ ছিল—যেমন কৃষক, ধীবর, তন্তুবায় ইত্যাদি। কিন্তু বৈদিক ব্রাহ্মণদের চতুর্বর্ণের ওপর ভিত্তি করে সমাজের বিভাগ তখনও হয়নি। উত্তরের

এই বৈদিক ব্রাহ্মণেরা সংখ্যায় অল্প হলেও কেরলে এসেই তাঁরা পুরোহিতের স্থান খুব তাড়াতাড়ি অধিকার করে নিয়েছিলেন। সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করে নিতে পেরেছিলেন বলেই কেরলের সমাজকেও তাঁরা খুব শীঘ্রই চতুর্বর্ণের ওপর গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁরা নিজেরা ছিলেন শীর্ষে। তারপর তাঁরা রাজা আর প্রধান প্রধান সর্দারদের নিয়ে ক্ষত্রিয়দের গড়ে তুললেন।

দশম শতাব্দীতে কেরালার চের এবং তামিলনাডুর চোল রাজাদের মধ্যে একশ বছরের যুদ্ধ শুরু হয়। ১০১৯ সালে চেলদের রাজধানী মহোদয়পুরমের পতনে এ যুদ্ধের শেষ হয়। চোলদের আক্রমণকে প্রতিহত করার প্রত্যক্ষ প্রচেষ্টার ফলে কেরলের সমাজে একটা সামরিক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। কেরলের ইতিহাসে বর্ণিত আত্মঘাতী সৈন্যদল এই সামরিক সম্প্রদায়ের নায়ারদের নিয়েই তৈরী। এই সময়ই আমরা প্রথম নায়ারদের কথা শুনতে পাই। প্রথমে নায়ার শব্দটিতে কোন একটা বিশেষ সম্প্রদায়কে বোঝাতো না। নায়ার বলতে এই আত্মঘাতী সৈন্যদলের একটা উচু পদমর্যাদাকে বোঝাতো। কিন্তু এই সামরিক সেবার ভিত্তিতেই একটা সম্প্রদায় খুব তাড়াতাড়ি গড়ে উঠলো। অপর একটি রাজ্যের সঙ্গে জীবন-মরণ সংগ্রামে লিপ্ত এই নায়ারদের ভূমিকা তাদের খুব শীঘ্রই শাসক-সম্প্রদায়ের খুব কাছাকাছি নিয়ে এল। এর ফলে সমাজে তাদের একটা বিশিষ্ট স্থান নির্দিষ্ট হলো। ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় যুবকদের নায়ার যুবতীদের বিয়ে করার অনুমতি দেওয়া হলো।

কেরলের চের রাজাদের ইতিহাস দেখলে দেখা যায় যে তাঁরা প্রথমে পিতৃমুখ্য সমাজের অধীন ছিলেন। কেরলের মাতৃমুখ্য সমাজের উদ্ভব খুব সম্ভব এই চের এবং চোল রাজাদের যুদ্ধের সময় থেকে। ব্রাহ্মণরা যখন উত্তর থেকে কেরলে আসতে শুরু করলেন তখন তাঁদের দলে মেয়েদের চেয়ে পুরুষদের সংখ্যা ছিল অনেক বেশী। তাই ব্রাহ্মণ পরিবারের বাড়ীর বড় ছেলে ছাড়া অন্য ছেলেরা ক্ষত্রিয় অথবা নায়ার মেয়েদের বিয়ে করতে পারতো কিন্তু তাদের সম্পত্তিতে

তাদের ছেলে মেয়েদের কোন অধিকার থাকত না। এর ফলে মাতৃমুখ্য সমাজ এবং মায়ের সম্পত্তির অধিকারের অর্থনৈতিক প্রথা ধীরে ধীরে গড়ে উঠলো। চোলদের সঙ্গে যুদ্ধে যত অধিক সংখ্যায় নায়ার পুরুষদের মৃত্যু ঘটতে লাগলো তত এই বিবাহ প্রথা এবং মাতৃমুখ্য সমাজের ভিত্তি দৃঢ় হলো।

পুরোহিতের অধিকারের সঙ্গে নাম্বুদিরী ব্রাহ্মণেরা দেশের শাসক-সম্প্রদায়ের সঙ্গে বৈবাহিক বন্ধনের মধ্যে দিয়ে এক রকমের রাজনৈতিক ক্ষমতারও অধিকারী হলেন। এর ফলে বিরাট স্থাবর সম্পত্তির মালিকানা থেকে তাঁরা যে অর্থনৈতিক ক্ষমতা পেলেন তাই দিয়ে ব্রাহ্মণেরা কেরালার সমাজকে চতুর্বর্ণের একটা মধ্যযুগীয় পিরামিড করে গড়ে তুললেন। এই পিরামিডের ওপরের ভাগ ছিলেন এই গোঁড়া ব্রাহ্মণেরা আর নায়ারেরা। এই অগ্রভাগ থেকে কেরলের অন্যান্য সম্প্রদায়—যেমন খৃষ্টান ও মুসলমানেরা বাদ পড়েছিলেন। এতে অবশ্য তাঁদের পক্ষে শাপে বর হয়েছিল। কেননা তাঁরা ব্যবসা বাণিজ্য বা জীবিকার অন্য পথ বেছে নিয়ে নিজেদের উন্নতি করতে পেরে-ছিলেন। কেরল যখন ছোটছোট রাজ্য বা জমিদারীতে বিভক্ত ছিল, যখন প্রত্যেক ছোটখাটো রাজা বা জমিদার নিজেদের সৈন্য-সামন্ত রাখতেন তখন অবশ্য নায়ারদের খুব রবরবা ছিল। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে মার্তণ্ডবর্মা যখন এইসব ছোটখাটো রাজ্যগুলোর মধ্যে ঝগড়া বিবাদ মিটিয়ে তাদের একটা সুদৃঢ় কেন্দ্রীয় শক্তির অধীনে আনলেন তখনই নায়ারদের দুঃখকষ্ট শুরু হলো। এতদিন নায়াররা শুধু যুদ্ধবিগ্রহ করেই তাদের জীবিকা উপার্জন করছিল; এখন যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যাওয়াতে অন্য কোন কাজ নিতে তাদের অহঙ্কারে লাগছিল। যে ভূমিপ্রথা কালের সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে যাচ্ছিল গর্বের সঙ্গে তাকে আঁকড়ে ধরার ব্যর্থতাকে উপহাস করে কুঞ্চন নাম্বিয়ার তাঁর লেখায় অনেক ব্যঙ্গকৌতুকের সরস চিত্র এঁকেছেন।

"ইন্দুলেখা" এবং তার পরবর্তী উপন্যাসে আমরা সমাজের শীর্ষস্থানীয় লোকেরা জমি থেকে উৎপাদন বাড়াবার চেষ্টা না করে তার থেকে

কেমন ভাবে কোনোরকমে জীবিকা নির্বাহ করছে ,তার একটা অস্পষ্ট ছবি পাই। এছাড়া কেমন ভাবে মাতৃমুখ্য পরিবারের কর্তাব্যক্তির সঙ্গে তার ভাগ্নে-ভাগ্নীদের সংঘর্ষ লাগছে তাও দেখানো হয়েছে। মাতৃমুখ্য একান্নবর্তী পরিবার যে আজকালকার দিনে অচল, তার চিত্রও এ উপন্যাসে ফুটে উঠেছে। "ইন্দুলেখা"-য় আমরা আরও দেখতে পাই যে সমাজের প্রতিটি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় কি ভাবে পরিবর্তনশীল সমাজের সঙ্গে খাপ খাওয়াবার চেষ্টা করছে। কিন্তু উপন্যাসের এই ধারা দৃঢ়ভাবে দানা বাঁধবার আগেই আর এক ধরণের উপন্যাসের আবির্ভাব ঘটে। সেটা মহাকাব্যের মত বিশাল ঐতিহাসিক উপন্যাস। শ্রী সি. ভি. রামন পিল্লে ১৮৯১—১৯২০-এর মধ্যে তিন খণ্ডে এক বিরাট উপন্যাস লিখলেন। নায়াররা যখন তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা হারিয়ে ফেলছিল সেই সময় শ্রী রামন পিল্লে তাঁর উপন্যাসে নায়ারদের লুপ্ত গৌরব ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করেন। কেমনভাবে রাজনীতি-কুশল নায়ার রাজা কেশবদাস অষ্টাদশ শতাব্দীতে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যকে হায়দার আলি এবং টিপু সুলতানের আক্রমণ থেকে রক্ষা করে তাকে সমৃদ্ধি আর ঐশ্বর্যের পথে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন তারই একটা ছবি আমরা এই উপন্যাসে পাই। হয়তো তাঁর এই তিন খণ্ডের উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে শ্রীরামন পিল্লে নায়ারদের প্রতি সমাজের কৃতজ্ঞতার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছিলেন।

নাম্বুদিরী সমাজে মেয়েদের স্থান ছিল রান্নাঘরে। বেশীর ভাগ মেয়েরই ঋতুমতী হবার আগে বিয়ে হয়ে যেতো। অনেক সময় ধনী ও বৃদ্ধ লোকেদের সঙ্গেও তাদের বিয়ে দেওয়া হতো। যৌথ পরিবারের বদলে একক পরিবারের প্রয়োজনীয়তা নায়ার সম্প্রদায়ই বেশীভাবে অনুভব করেছেন। মুসলমানদের ধর্মের গোঁড়ামি, রক্ষণশীল সমাজ, খৃষ্টানদের পশ্চিমী যাজকদের সংস্পর্শে আধুনিকতার হাওয়া ইত্যাদি বিষয় নিয়ে এই সময় অনেক উপন্যাস লেখা হয়েছে।

এর পরবর্তী অধ্যায়ের উপন্যাস রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আন্দোলনের ওপর ভিত্তি করে লেখা। শ্রীরেবুকাড্ তাঁর উপন্যাসে

জমিদার আর প্রজাদের এই সংঘর্ষের কথা লিখেছেন। তাকাড়ী এবং কেশবদেবও তাঁদের উপন্যাসে লিখেছেন গ্রাম এবং সহরের সর্বহারাদের কথা।

শ্রী এম. টি. বাসুদেবন্ নায়ারের উপন্যাসের আলোচনা এখন এখানে করা হচ্ছে। বাসুদেবন নায়ারের উপন্যাসগুলি ঘটনার বৈভবে সমৃদ্ধ; কিন্তু এতে বাস্তবতার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের কথা নেই। ১৯৬৭ সালে "আস্রয়" নামে তাঁর একটি অদ্ভুত গল্পে তিনি বহু বছর গ্রাম-ছাড়া একটি লোকের কথা লিখেছেন। একদিন সে গ্রামে ফিরে আসে। এসে দেখে কাউকেই সে চেনে না। কেউই তার দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিতে প্রস্তুত নয়। এতে তিনি দেখাতে চেয়েছেন মানুষ যে-জগতে তার স্থান পেতে চায় সে-জগৎ কোন দিনই তার কাছে ধরা দেয় না—সে বড় দূরে, বড় অচেনা।

"নালুকেট্টু" উপন্যাসের বিষয়বস্তু এক একান্নবর্তী নায়ার পরিবারের অবক্ষয়। নালুকেট্টু যেন একটা প্রতীক। একান্নবর্তী পরিবারের এক বিশেষ ধরণের বাড়ী এই 'নালুকেট্টু'। এ বাড়ীর ভেতরে চারিদিকে বারান্দা, তার সঙ্গে লাগানো ঘর, মাঝে একটা ছোট খোলা উঠোন। এর বাইরে বার বাড়ী, গোলাবাড়ী ইত্যাদি। একান্নবর্তী পরিবারের সমস্ত লোকেরা এ বাড়ীর মধ্যে মিলে-মিশে থাকে।

একটি ছেলের জীবন সংগ্রামের কাহিনী গল্পটির মুখ্য বিষয়বস্তু। তার মা বাড়ীর গুরুজনদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার ভালোবাসার লোকটিকে বিয়ে করেছিল। সেইজন্য তার পরিবারে তার স্থান হয়নি। কিন্তু সেই স্ত্রীলোকটির ছেলে কি করে তার পিতৃপুরুষের ভিটেতে ফিরে এল, সেই সংগ্রামের কাহিনী এই উপন্যাসে বর্ণনা করা হয়েছে। ছেলেটি তার মামার বাড়ীতে স্থান পেল বটে কিন্তু আইনগত অধিকারে বাড়ীর কর্তার হৃদয়ে স্থান পেল না। ছেলেটি তার মার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে মামার বাড়ী চলে যায়। ছেলেটির মা তার ছেলের পড়াশুনোর জন্য একটি দয়ালু লোকের সাহায্য নেয়। কিন্তু সেই নিয়ে মার সম্পর্কে যেসব অপবাদ শোনে তাতে

সে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করে এবং মাকে ত্যাগ করে। মামার বাড়ীতে গিয়ে সে ভালো ভাবে পড়াশুনো করে বিদেশে একটা কাজ পায়। অনেকদিন পরে সে আবার তার পরিবারে ফিরে আসে কিন্তু ততদিনে সে পরিবারের শ্রী নষ্ট হয়ে গেছে, তার আভিজাত্যও হারিয়েছে। ছেলেটি কিন্তু আর সেই একান্নবর্তী পরিবারকে বাঁচিয়ে রাখতে চায় না। সে তার বুড়ো দাদামশায়ের কাছ থেকে বাড়ীটা কিনে নেয়। এ বাড়ী কিনে নেওয়ার উদ্দেশ্য হলো বাড়ীটা ভেঙে ফেলে আর একটা ছোট নতুন বাড়ী করা। এ বাড়ীর সঙ্গে তার জীবনের অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতা জড়িয়ে ছিল—তাই এ বাড়ীকে সে আর আগের মতো রাখতে চায় না।

ছেলেটির অবচেতন মন তাকে জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে কি ভাবে বাধা দিচ্ছিল এই উপন্যাসে তারই চিত্র ফুটে উঠেছে।

কৃষ্ণচৈতন্য

প্রথম অধ্যায়

এখন ও ছোট কিন্তু একদিন ও বড় হবে। বড় হলে একটা জোয়ান লোকের মত গায়ে খুব জোর হবে। তখন আর কাউকে ভয় করার দরকার হবে না। তখন ও বেশ মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। কেউ যদি জিজ্ঞেস করে, 'কেরে তুই?' একটুও ঘাবড়ে না গিয়ে জোর গলায় বলবে, 'আমি গো, আমি কোন্তন্নী নায়ারের ছেলে, আপ্পুন্নী।'

তখন একবার সেয়হু আলির সঙ্গে দেখা না ক'র যাবে না। তখন ও নেবে ওর এতদিনকার প্রতিশোধ। সেয়হু আলির গলা যখন ওর হাত দুটোর মধ্যে ছটফট্ করবে তখন বলবে, 'তুইই তো, তুইই তো আমার—।'

সেয়হু আলি কুট্টির সঙ্গে ওর এই ভাবে সংঘর্ষের দৃশ্য প্রায়ই ওর চোখের সামনে ভেসে ওঠে। কুণ্ডঙ্গলদের বাড়ীর সামনে চাঁপাফুল গাছটার ছায়ায় কোন এক ছুটির দুপুরে একা বসে থাকার সময়, কোনো নিদ্রাহীন রাতে যখন চোখ বন্ধ ক'রেও চোখে ঘুম আসে না, তখন এ দৃশ্য প্রায়ই ওর চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

সেয়হু আলি কুট্টি কে? আপ্পুন্নী তাকে দেখেনি এখনও। যেন দেখা না হয় এই তার প্রার্থনা। ও বড় হোক, বড় হওয়ার পর দেখা হলেই ভালো হয়। কিন্তু সেদিন সন্ধ্যায় যখন ও বাজারে গিয়েছিল তখন সেয়হু আলি কুট্টির কথা ওর মনেও ছিল না। হঠাৎ যে ঐ লোকটার সঙ্গে ওর দেখা হয়ে যাবে তা ও স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি।

সেদিন স্কুল থেকে বাড়ী ফিরতে ওর একটু দেরীই হ'য়েছিল। মন্দিরের পাশ দিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে বাড়ী ফিরছিল। পথে মন্দিরের মালাকারের কাজু বাদামের বাগান। ঢিল ছুঁড়ে ওরা কতকগুলো কাজুফল পাড়লো। পারাঙ্গোড আর অচ্যুত কুরুপের কাজু বাদামের

গাছগুলোর দিকে ওদের তাক্ ছিল না। ও ছেলে দুটো বড় পাজী। দেখতে পেলে ওদের মা, বাবাকে বলে দেবে। কিন্তু মালাকর কিছু বলবে না। ফল যত ইচ্ছে পাড় কিন্তু বাদামগুলো তাকে দিতে হবে। লোকটার ছেলেমেয়ে কেউ নেই। তাই পাড়ার ছেলেমেয়ে-গুলোকে সে একটু ভালোই বাসে। বাদাম পাড়া শেষ হ'লে ওরা উঁচু টিলাটার ওপরে উঠে ভিজে ঘাসগুলো পা দিয়ে মাড়িয়ে মাড়িয়ে তার মধ্যে দিয়ে পথ করেছে। এটা বেশ মজার খেলা। কি ভাবে যে সময় চলে গেছে একটুও জানতে পারেনি।

স্কুল থেকে সোজা বাড়ীতে ফিরলে মার দেখা কোনদিনই পাওয়া যায় না। বামুনদের বাড়ী কাজ সেরে ফিরতে ফিরতে মার একটু দেরীই হয়। ও রোজ স্কুল থেকে ফিরে বই-খাতাপত্র রেখে হাতমুখ ধুয়ে রান্নাঘরে ঢোকে। উঁচুতে দড়ি দিয়ে বাঁধা ফেন-ভাতের হাঁড়িটা নীচে নামিয়ে একচুমুকে খেয়ে শেষ করেই ছুটে বেরিয়ে পড়ে। বাড়ীর কাছাকাছি থাকে এক বুড়ী। সে সকলের সরকারী দিদিমা। বুড়ীর কুঁড়ে ঘরে গিয়ে খানিকক্ষণ গল্প করার পর মা ফিরে আসে। সেদিন কিন্তু বেশ দেরীই হয়ে গিয়েছিল। ও যখন ফিরল মা তখন রান্নাঘরে। উনুনে ভাতের হাঁড়ি বসানো। ধানের তুষ গুঁজে মা উনুনে আগুন জ্বালছে।

—কি রে আজ এত দেরী যে ?

—এমনিই মা।

—কতবার না তোকে বলেছি, আপ্পুন্নী, যে সন্ধ্যে হওয়ার আগে বাড়ী ফিরবি।

আপ্পুন্নী এর উত্তরে কিছু বলে না। ও জানে যে মা এর বেশী আর বকবে না। ও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এক চুমুকে ফেন-ভাত খেল। খাওয়া শেষ হ'লে মা বলল—খোকা, ইউসুফের দোকান থেকে দুআনার নারকোল তেল নিয়ে আয় বাবা।

আপ্পুন্নী বাইরে তাকালো। রোদ একেবারে পড়ে গেছে। তখনও অন্ধকার হয়নি। কিন্তু আকাশ কালো হয়ে আসছে। অন্ধকার

হয়ে গেলে ওদের গলিটার তু-পাশের কেয়াঝোপের মধ্যে দিয়ে যেতে ওর সত্যিই ভয় করে। আর ওই রাস্তার এক পাশেই নাকি ভূতের ওঝা এরোমনকে পুড়িয়েছে। ওর একদম যেতে ইচ্ছে করছিল না।

—কাল কিনলে হবে না ?

—না বাবা, ঘরে এক ফোঁটা তেল নেই। যা না এক ছুটে গিয়ে নিয়ে আয়।

আপ্পুন্নীর কিন্তু তখনও ভয় করছে। ভয়ের কথা মাকে বললে মা তক্ষুণি ওকে যেতে বারণ করবে। কিন্তু ভয় করছে মাকে বলতে কেমন যেন লজ্জা করছে। ওকি এত ছোট ছেলে ? ও এখন ক্লাস এইটে পড়ে। ক্লাশের আবার মণিটার !

—কি হোল রে আপ্পুন্নী ? যা তাড়াতাড়ি নিয়ে আয়। তাড়াতাড়ি আনলে পেঁয়াজভাজা ভাত দেব।

নাঃ, আর কোন ভয় বা দ্বিধা নেই।

—তাড়াতাড়ি বোতল আর পয়সা দাও। পেঁয়াজভাজা ভাত ছোটখাট কিছু ব্যাপার নয়। এর স্বাদ তুতিনবার মাত্র আপ্পুন্নী পেয়েছে। পেঁয়াজ কেটে কড়াতে নারকেল তেল ঢেলে মা উনুনে বসাবে। পেঁয়াজ থেকে ধোঁয়া বেরোবামাত্র মা হাতা করে ভাত কড়ায় ঢালবে। তারপর সেই গরম গরম ভাত মা যখন ওর সামনে রাখে তখন তার থেকে এমন চমৎকার একটা গন্ধ বেরোয়—ভাবলেই জিভে জল আসে।

মার কাছ থেকে বোতল আর পয়সা নিয়ে আপ্পুন্নী এক ছুটে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল। গলির সামনে এসে ভয়ে এক নিমেষের জন্য দাঁড়িয়ে পড়লো। নাঃ, খুব বেশী অন্ধকার হয়নি। কিন্তু তুপাশে ঘন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কেয়া ফুলের ঝাড়গুলো। কেয়াফুলের ঝাড়ে নাকি গোখরো সাপের বাসা। কেয়া ফুলের গন্ধ গোখরো সাপের খুব প্রিয়। বিষধর সাপেরা নাকি সুন্দর গন্ধ, সুন্দর গান আর সুন্দরী মেয়ে খুব ভালোবাসে

নাঃ, ভয় করার কিছু নেই। এই গলির প্রতিটি খোয়া, প্রতিটি

গর্ত ও খুব ভালো করে চেনে। আস্তে আস্তে হাঁটলেই ভয়। আপ্পুন্নী তাই এক ছুটে কেয়া ঝাড়ের শেষে মাঠের সামনে এসে থামলো।

আর একটু গেলেই বাজার। নদীর ধারেই দোকানপাট। সব দোকানগুলোই খড়ে ছাওয়া। মাত্র একটা দোকান টালি দেওয়া, কিন্তু ওখানে বেচাকেনা হয় না। দোকানের ওপরে কে যেন থাকে। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে, দোকানে দোকানে লম্প জ্বলতে শুরু করেছে। বেশীর ভাগই ধোঁয়া ভরা চোদ্দ নম্বরের লম্প। ইউসুফের দোকানে শুধু পেট্রোম্যাক্সের আলো। গ্রামের মধ্যে ইউসুফের দোকানই সবচেয়ে বড়। ওখানেই শুধু বিষুর[1] জন্য বাজী, পটকা, ইত্যাদি কিনতে পাওয়া যায়। কিছুদিন হোলো পট্টাম্বী থেকে একটা দরজী এসেছে। কুডালুরে ঐ প্রথম দরজি। ও ওর সেলাই-এর কল রেখেছে ইউসুফের দোকানে, ওখানেই সেলাই করে। আপ্পুন্নী আজ অনেকদিন ধরেই ভাবছে যে মাকে বলবে কাপড়অলার কাছ থেকে ওর জামা যেন না কেনে, ওর তিনটে জামাই কাপড়অলার কাছ থেকে কেনা—কোনোটাই ফিট্ করে না। দুটো ঢোলা ঢোলা আর অন্যটা আঁটো। কাপড় কিনে দর্জিকে দিয়ে করালে কত ভাল হয়। দর্জি যখন ওর মাপ নেবে তখন দোকানের সব লোক ওর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবে। জামা যখন কাটবে, সেলাই করবে তখন—দাঁড়িয়ে দেখতেও তো কত মজা।

আপ্পুন্নী যখন ইউসুফের দোকানে পৌঁছোলো তখন দোকানে খুব ভিড়। মাঠ থেকে কাজকর্ম সেরে বাড়ী ফেরার পথে খেত মজুরেরা জিনিষপত্র কিনতে এ সময় ভিড় করে। আপ্পুন্নী ভিড় থেকে সরে একপাশে দাঁড়িয়েছিল। উঃ, কি ভীষণ দেরী হয়ে যাচ্ছে। কেয়াফুলের ঝাড়ে সন্ধ্যেবেলায় গোখরো সাপেরা সব ঘুমোতে আসে। আর রাস্তার সামনেই ভূতুড়ে ওঝা এরোমনকে পুড়িয়েছে। ও তাড়াতাড়ি বলল—দু আনার নারকোল তেল।

[1] কেরালার নতুন বছর

এত লোকের ভিড়ে ইউসুফ ওর গলা শুনতে পেল না। আপ্পুন্নী ভিড়ের মধ্যে ঠেলেঠুলে ঢোকার চেষ্টা করে ক'বার দেখলো। খেত-মজুরদের সঙ্গে ছোঁয়াছুয়ি হ'লে কিছু হবে না। বাড়ী ফিরে চান তো করতেই হবে কিন্তু ওদের কাছাকাছি আসতেই ঘামে ভরা নোংরা কালো কালো দেহগুলো থেকে একটা বিশ্রী গন্ধ ভক্ করে নাকে ভেসে এল। ও আবার পেছনে ফিরে এল। পেট্রোম্যাক্সের চারিদিকে অসংখ্য পোকা উড়ছে। ও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই দেখছে। তখনই তুজন লোক ইউসুফের দোকানে ঢুকলো। সাদা সার্ট পরা কাঁচা-পাকা গোঁফঅলা একটা মোটাসোটা বেঁটে লোক। চোখ তুটো তার লাল। আর একজন হলো পদ্মনাভন্ নায়ার। পদ্মনাভন্ নায়ারকে আপ্পুন্নী চেনে। ফেরীঘাটের কাছে অনেকদিন চায়ের দোকান দিয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত চালাতে পারেনি—দোকান উঠিয়ে দিতে হয়েছিল। পদ্মনাভনের তুটো ছেলে ওর সঙ্গে পড়ে। আপ্পুন্নী আর একটু একপাশে সরে দাঁড়ালো।

—দোকান যে জমজমাট ইউসুফ সাহেব। সাদা সার্ট পরা মোটা লোকটা চেঁচিয়ে বলল। দোকানের লোকজনেরা ওর আওয়াজ শুনে ফিরে তাকালো। টেবিলের সামনে বসে খুচরো পয়সা গুণে রাখছিল ইউসুফ। ও লোকটাকে দেখতে পায়নি। জিজ্ঞেস করলো —কে ?

কলাপাতায় ধনেপাতা মুড়তে মুড়তে লাল দাঁত দেখিয়ে হেসে দোকানের লোকটা বলল—আরে আপনি ? আপনি তাহ'লে বেঁচে আছেন !

দোকানের মালিক ইউসুফ তখন উঠে দাঁড়িয়েছে। সাদা সার্ট পরা লোকটাকে দেখে বলল—আরে তুমি ? কখন এলে ?

—সাড়ে পাঁচটার গাড়ীতে।

দোকানের বারান্দায় একটা টুলের ওপর বসে বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে খেতমজুর মেয়েগুলোর দিকে তাকিয়েছিল পদ্মনাভন্ নায়ার।

থুথু ফেলতে যাবার সময় পদ্মনাভন্ আপ্পুন্নীকে দেখতে পেল। —কিরে আপ্পুন্নী, কি কিনতে এসেছিস ?

আপ্পুন্নী সোজাসুজি পদ্মনাভনের মুখের দিকে না তাকিয়ে বলল, —নারকোল তেল।

হঠাৎ খেতমজুরদের মধ্যে একটা গুঞ্জন উঠলো। সাদা সার্ট পরা লোকটা পদ্মনাভন্‌কে জিজ্ঞেস করলো—ছেলেটা কে ?

—আমাদের কোন্তুন্নী নায়ারের ছেলে। ভডাকেপাটের[1]—হঠাৎ সমস্ত গুঞ্জন বন্ধ হয়ে গেল। আপ্পুন্নীর কাছে যে দুটো লোক দাঁড়িয়েছিল তারা হঠাৎ নিজেদের মধ্যে কথা বলতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। সামনে যারা দাঁড়িয়েছিল তারা একটু সরে দাঁড়ালো। এবার ধাক্কাধাক্কি না করে আপ্পুন্নী সহজেই সামনে এগিয়ে গেল। দোকানের লোকটা ওর হাত থেকে বোতল নিয়ে টিনে হাতা ডুবিয়ে দু আনার তেল দিল। এক ফোঁটা তেল বেশীও দিল। পয়সা দিয়ে বোতলের মুখ পাতা দিয়ে এঁটে বাইরে বেরিয়ে আসার সময় সাদা সার্ট পরা লোকটা ওকে জিজ্ঞেস করলো—খোকা, একা একা যাচ্ছ নাকি ?

ওকে জিজ্ঞেস করছে কিনা আপ্পুন্নী প্রথমে তা বুঝতে পারলো না। লোকটা আবার বলল—বড্ড অন্ধকার হয়ে গেছে যে খোকা।

আপ্পুন্নী এ কথা শুনে কি যেন খুব আস্তে আস্তে বলল যাতে কেউ না শুনতে পায়। গ্রামের মোড়লের বাড়ীতে কাজ করে কোচ্চী। ও আপ্পুন্নীকে ডেকে বলল—দাঁড়াও গো খোকাবাবু, একা একা যেও না। আমিও ঐ পথে যাচ্ছি, আমার সঙ্গে এসো।

কোচ্চী জিনিষপত্র সব আঁচলে বেঁধে পানের বাটাটা হাতে নিয়ে ওর পেছন পেছন চলল। পাশের দোকানটার লম্প থেকে খড়ের গাদি জ্বালিয়ে বলল—চল খোকাবাবু।

আপ্পুন্নীর ভয় একেবারে দূর হ'য়ে গেল। গলিটা পার হবার

[1] পরিবারের নাম

সময় কেয়াফুলের হালকা গন্ধ যেন বাতাসে জড়িয়ে রয়েছে বলে মনে হলো। নাঃ, ভয় পাবার কিছু নেই—সঙ্গে কোচ্চী রয়েছে, পায়ের কাছে আলোও দেখা যাচ্ছে। পথে যেতে যেতে ও জিজ্ঞেস করলো —কোচ্চী লোকটা কে রে ?

—কোন্ লোকটা খোকাবাবু ?

—ইউসুফের দোকানে—

—ওঃ, ওতো সেয়দু আলি কুট্টি।—মুণ্ডাতায়েতের সেয়দু আলি —গ্রামের বাইরে আজ অনেকদিন। সেয়দু আলি কুট্টি !

ওর সারা শরীরের মধ্যে দিয়ে একটা শিহরণ বয়ে গেল। মোটা, বেঁটে—শক্ত হাত দুটো—সারা দেহ লোমে ভর্ত্তি। গোল গোল লাল চোখ। এই সেয়দু আলি কুট্টি। ওকেই না—

মন্দিরের প্রাঙ্গণে সারারাত কথাকলি নাচ দেখার পর ভোরবেলায় চোখ খোলার সঙ্গে যে দৃশ্য প্রায়ই ওর চোখের সামনে ভেসে উঠতো তা হচ্ছে ভীমের দুঃশাসন বধ। দুঃশাসনের বুকের ওপর বসে ভীম তার পেট চিরে নাড়ীভুঁড়ি বার করছে। ওই রকম ভাবে ও যদি সেয়দু আলি কুট্টির বুকের ওপর—

নাঃ, ওর অত শক্তি নেই। ও এখনও বড় হয়নি। আপ্পুন্নী হাঁফাচ্ছিল। গায়ে ওর অত জোর নেই, কিন্তু ছোট্ট টিলাটার পাশ দিয়ে যাবার সময় ওকে এক ধাক্কায় আপ্পুন্নী নীচে ফেলে দিতে পারে। অথবা একটা পাথর ছুঁড়ে ওর মাথায় মারতে পারে।

—ছোটবাবু, এবার তুমি একা চলে যাও।

আপ্পুন্নীর সম্বিত ফিরে এল। ও বাড়ীর দরজার কাছে এসে গেছে।

—আপ্পুন্নী।

ও মার ডাক শুনতে পেল। বাড়ীর দরজার সামনে মা খুব চিন্তিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ও হাঁফাতে হাঁফাতে বেড়া খুলে বাড়ীর ভেতর ঢুকলো।

—ভগবান ! আমি যে ভাবনায় ছটফট করছি।

আপ্প‌ুন্নী একটা কথাও বলল না। হ্যাঁ, ও লোকটাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছে। ওর ঘাড়ে গর্দানে মাথাটা থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে।

—কিরে আপ্প‌ুন্নী, এত দেরী হলো যে ?

—দোকানে বড্ড ভিড় ছিল মা। বলে নোংরা তোয়ালে জুড়িয়ে আপ্প‌ুন্নী কুয়োতে চান করতে গেল। মা ওর মাথায় কুয়ো থেকে জল তুলে ঢালতে লাগলো। এখনও ওর মা ওকে স্নান করিয়ে দেয়। প্রথমে ও মাথা মোছে। কিন্তু মা পরে চুল ঝাঁকিয়ে বলে—এঃ, চুল থেকে জল যে একেবারে ঝরেনি। তারপরে বেশ শুকনো করে চুল মুছিয়ে দেয়।

পেঁয়াজ ভাজা ভাতে আজ যেন তেমন স্বাদ ছিল না। সামনের দরজা, রান্নাঘরের দরজা সব বন্ধ করেছে মা। বাসনপত্র পরিষ্কার করে উপুড় করে রেখে মা ঘরে ঢুকে ওর বিছনা পাতলো। কাছেই মার মাদুর। বাতি নিভিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘর অন্ধকারে ভরে গেল। হঠাৎ আপ্প‌ুন্নীর আজ অকারণে ভয় করতে লাগলে। ঘাড়ে গর্দানে মাথা আর দুটো লাল চোখ ও অন্ধকারে দেখতে পেল।

—মা ঘুমোলে ?

—না। কেন ? কিছু বলবি ?

—এই এমনি—কিছু না।

ও জোর করে চোখের পাতা দুটো বন্ধ করে প্রার্থনা করতে লাগলো—হে ভগবান, আমার চোখে ঘুম দাও।

—মা।

ছেলের গায়ে হাত রেখে মা ওকে জড়িয়ে ধরে বলল—কিরে খোকা ?

আবার দ্বিধা...বলবে কি বলবে না।

—হ্যাঁ মা, বলছিলাম কি জানো, আমার সঙ্গে সেয়দু আলি কুট্টির দেখা হয়েছিল।

কোন্ সেয়দ্ আলি কুট্টি মা তা জিজ্ঞেস করলো না। ছেলেকে ভালো করে জড়িয়ে ধরে মা বলল—খোকা ঘুমো।

ওর মা ওকে এ ঘটনার কথা কিছু বলেনি, এসব কথা ও জানতে পেরেছে পাড়ার বুড়ী দিদিমার কাছ থেকে। ওদের বাড়ীর দক্ষিণ দিকে বুড়ীর ছোট্ট কুঁড়ে ঘরটা। বুড়ী পাড়ার সকলের দিদিমা। যখনই সময় পায় আপ্পুন্নী এই বুড়ীর কাছে গিয়ে হাজির হয়। তবে বুড়ী সব সময় বাড়ীতে থাকে না। কখনও কখনও হলদে শালটা গায়ে জড়িয়ে বুড়ী সকাল বেলাই লাঠি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। ঐ শালটা কলম্বো থেকে কে যেন ওকে এনে দিয়েছিল। একবার বেরোলে বুড়ী বাড়ী ফিরে আসে তিন চার দিন পর। ওর যাওয়ার কয়েকটা গোণা জায়গা আছে। তুটো তিনটে বামুনের বাড়ী আর তুটো তিনটে বড় লোকদের বাড়ী। এসব জায়গা থেকে বুড়ী চাল, নারকেল পায়। ভিক্ষে করে পাওয়া নয়। না চাইতেই ওকে দেওয়া উচিত—এমনি বুড়ীর ভাবখানা। বুড়ী বলে—আমি কি ভিক্ষে করতে বেরিয়েছি যে চাইলে তবে দেবে? কুডালুরে বুড়ী দিদিকে জানে না এমন লোক নেই। যৌবনে বুড়ীর তিনবার বিয়ে হয়েছিল, কিন্তু ছেলেমেয়ে হয়নি। প্রথম পক্ষের বর ওকে ফেলে চলে যায়। দ্বিতীয় আর তৃতীয় পক্ষের ঘর করতে ও যায়নি। বুড়ীর সত্তর বছর বয়স হয়েছে। কিন্তু এখনও বাচ্চাদের সঙ্গে খেলা করে। হাততালি দিয়ে নাচানাচি করে। বড়লোকদের বাড়ীতে গেলে সেখানে তু'এক দিন থাকে। চলে আসার সময় বাড়ীর মেয়েরা ওকে চাল পয়সা ইত্যাদি দেয়। চাল আর পয়সা পেলে বুড়ী খুব খুশী—পাড়ায় পাড়ায় তাদের নাম করে বেড়ায়। একদিন ছিল যখন বুড়ীর শক্তি ছিল, সামর্থ্য ছিল। তখন পাড়ার এমন বাড়ী ছিল না যেখানে বুড়ী গিয়ে সাহায্য না করেছে। যে বাড়ীতে প্রসব বেদনা উঠেছে অথবা যেখানে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়েছে সে সব জায়গায় বুড়ীকে দেখা যেত। গ্রামের অনেকেরই জন্ম বুড়ীর হাতে। কারুর কারুর মৃত্যুও। কেউ যদি ঠাট্টা করে বলে—কি বুড়ী দিদি,

তোমাকে কি যমের অরুচি ধরলো? এখনও ডেকে নেয়নি যে—তাতে বুড়ী খুব রেগে যায়। বলে—বলি ও মুখপোড়া ছেলে, আমাকে যমের বাড়ী পাঠানোর জন্যে তোর এত তাড়া কিসের র‍্যা। পরে নিজেকে আশ্বাস দেওয়ার ভঙ্গীতে বলে—আমার এখনও যাওয়ার সময় হয়নি রে।

বুড়ী বাড়ী ফিরে ওর কুঁড়ে ঘরে একনাগাড়ে অনেকদিন থাকে। তখন আপ্পুন্নীর খুব মজা। ও বুড়ীর ঘরে গিয়ে বসলেই হলো। বাইরে থেকে ফিরে আসার পর বুড়ী যা কিছু ভালো খাবার দাবার নিয়ে আসবে তা সব আপ্পুন্নীর। কত কি জিনিষ, মিষ্টি আম, কাঁঠালের পাঁপড়, এটাসেটা। বেড়িয়ে আসার পর বুড়ীর অনেক কিছু গল্প করার থাকে। আপ্পুন্নী খায় আর চুপচাপ বসে বুড়ীর গল্প শোনে। ওর বাবার সম্বন্ধে ও যা কিছু শুনেছে তা সব এই বুড়ীর কাছে থেকে—কোন্তুন্নী যখন মরলো, তখন আপ্পু তুই এই এতটুকু, বলে বুড়ী ওর বুড়ো আঙুলের মাপ দেখায়। বুড়ী সব ছেলেদের 'আপ্পু' বলে আর সব মেয়েদের 'আম্মু' বলে ডাকে।

ওর বাবার মৃত্যু স্বাভাবিক মৃত্যু নয়। কে যেন তাকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলেছে।

—বুঝলি আপ্পু, তোর বাবার মতো অমন একটা ভালো লোক এ গ্রামের কোথাও পাওয়া যেতো না। যেমনি শরীর, তেমনি স্বাস্থ্য। আর তেমনি ভাল মানুষ। আমার সঙ্গে দেখা হলেই আমাকে পান কেনার পয়সা দিত।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বুড়ী আপ্পুন্নীর মাথায় হাত বুলিয়ে বলে—তোর মার কপালে এত সুখ সইলো না।

বাবার কথা আপ্পুন্নীর খুব আবছা আবছা মনে পড়ে। কিন্তু ওকে দেখলেই লোকে ওকে ওর বাবার কথা বলে। ওর বাবাকে গ্রামের সকলে খুব ভালোবাসতো। সব কিছুতেই কোন্তুন্নী নায়ারকে চাই। বিয়ে, শ্রাদ্ধ, বাড়ী তৈরীর কাজ—সব তাতে ওর বাবা। কিন্তু হলে হবে কি, বাবার মা বাবাকে দুচক্ষে দেখতে পারতো না।

—ও পকীড়া[1] খেলে মরুক, পাজী বদমাইশ—ওর ঠাকুমা প্রায়ই একথা বলতো। ওর বাবা ঠাকুমার একমাত্র সন্তান ছিল। ঠাকুমা মারা যাবার পর বাবা এ সংসারে একেবারে একা হয়ে পড়ল। কোন্তুন্নী নায়ার খুব নাম করা পকীড়া খেলুড়ে ছিল। ওনম[2], বিষু[3], তিরুবাতীরা[4] উৎসবের সময় গ্রামের বটগাছের নীচে শান বাঁধানো বেদীতে পকীড়া খেলা হতো। কুডালুর আর পেরুম্বলম—এই দুই গ্রামের মধ্যে প্রতিযোগিতা হতো। নামকরা পকীড়া খেলুড়েরা সব দলে দলে আসতো। তাদের আর এখন দেখতে পাওয়া যায় না। এখনকার খেলোয়াড়রা সব কাঁচা—খেলা আগের মতো তেমন গরম হয়েও ওঠে না। এসব অবশ্য পাড়ার বুড়োদের কথাবার্তা।

গ্রামে কোথাও ছক্কা পাড়ার শব্দ শুনলে 'রা হেই ছক্কা' বলে খেলোয়াড়দের চীৎকার শুনলে আপ্পুন্নীর সঙ্গে সঙ্গে বাবার কথা মনে পড়ে। এই স্মৃতি চারণের মধ্যে অবশ্য কোনো ব্যথার স্পর্শ নেই—বরঞ্চ মনে মনে একটা অহঙ্কারই জেগে ওঠে।

কুড়ালুরের সবচেয়ে বড় কুট্টন্ নায়ার গল্প করে—হ্যাঁ, খেলুড়ে ছিল বটে কোন্তুন্নী নায়ার। 'এই আমি ছক্কা ফেললুম' বলে যখন ছক্কা ছুঁড়তো ঠিক ছয়ই তখন পড়তো। কি বলবো ভাই, আমার নিজের

[1] অনেকটা বাঘবন্দীর মত খেলা। মাটিতে ছক কেটে ঘুঁটি রেখে খেলা হয়, কিন্তু লুডোর মত ছক্কা ছুঁড়ে খেলা হয়। ছক্কার আকার খুব বড় হয়। ছক্কা পেতলের বা ব্রোঞ্জের হয়।

[2] ওনম—কেরালার সবচেয়ে বড় জাতীয় উৎসব। নতুন ধান কাটার পর এ উৎসব শুরু হয়।

[3] বিষু—কেরালার নতুন বছর।

[4] তিরুবাতীরা—উচ্চবর্ণের হিন্দু মেয়েদের উৎসব। শিবের মত বর পাওয়ার জন্য মেয়েরা পৌষমাসে এ উৎসব পালন করে। শিবরাত্রির মতো মেয়েরা সারাদিন উপোস করে থাকে, সারারাত জাগে। সারাদিন উপোস করার পর সন্ধ্যেবেলায় ফলমূল খায়। তিরুবাতীরার অনেক গান আছে। সে গান গাইতে গাইতে মেয়েরা দোলনায় দোলে।

চোখে দেখা। সেদিন পেরুম্বলমের সঙ্গে খেলার শেষ দিন। ওদিকের দল হচ্ছে মারারেরা। ওরা প্রায় জেতে জেতে। হারলে আমাদের মানসম্ভ্রম সব যায়। আমাদের দলের নামজাদা খেলুড়ে আচ্চুমান ছক্কা হাতে নিয়ে হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে।

—হায় ভগবান! আমরা যে হেরে যেতে বসেছি।

সত্যি কথা বলতে কি ওদের সঙ্গে খেলায় আচ্চুমানের সাহসও ছিল না। আমার দিকে তাকিয়ে আচ্চুমান বলল—কিরে কুট্টন, আমাদের গ্রামের যে মান যায়। কিন্তু আচ্চুমান একেবারে হাল ছেড়ে দেয়নি। চীৎকার করে বলল—ছেলেপিলেদের মধ্যে কে আছ, এগিয়ে এস। আর তখনই কে যেন বলে উঠল—আপনার ছক্কা দুটো আমায় দিন। চেয়ে দেখি কোন্তুন্নী নায়ার। ছক্কা নিয়ে এক মিনিট চোখ বুজে কি যেন ধ্যান করলো। তারপর ছক্কা দুটো ছুঁড়লো—একেবারে বারো। সকলের চোখ তখন ছক্কা দুটোর দিকে। আবার ছক্কা ছুঁড়লো এবারেও বারো, পরের বার ছয়। কুডালুরের মানরক্ষা সেবার করলো কোন্তুন্নী। সেসব দিনের কথা ভাবতে গেলে আজকেও গায়ে কাঁটা দেয়।

কুডালুরের সবচেয়ে বড় খেলুড়ে কুট্টন নায়ার। কুট্টন নায়ার একুশ বছর বয়সের মধ্যে কুট্টিপুরম্, ভলাঞ্চেরী ও আরও অনেক জায়গার বড় বড় খেলোয়াড়দের ধরাশায়ী করে দিয়েছে। সেই কুট্টন নায়ার আরও কত গল্প করে ওর বাবার সম্বন্ধে। একবার দক্ষিণে খুব বড় এক খেলোয়াড় ছিল। লোকটা ছিল গাছি। সকলে তার কাছে হেরে যায় শুনে আপ্পুন্নীর বাবা ওনমের সময় তার গ্রামে রওনা দিল। বাবার সঙ্গে আপ্পু পানিক্করও ছিল। আপ্পু পানিক্কর গল্প করে—প্রথম দিন সকালে খেলা আরম্ভ হলো, আর তিনদিনের দিন বাবা জিতলো। খেলা দেখতে সে কি ভিড়! গাছি অনেক চেষ্টা করেও বাবাকে কিছুতেই হারাতে পারলো না। তিনদিনের দিন বাবাকে গড় করে বলল—আপনার সঙ্গে এ দাস আর কোনদিন খেলবে না। গাছি বাবাকে একটা চার পাউণ্ডের পেতলের ছক্কা উপহার

দিয়েছিল। সেই ছক্কা দিয়ে বাবা কানোত্তের পান্নিক্করদের হারিয়ে দিয়েছিল। এরকম আরও কত কি গল্প করার আছে ওর বাবার সম্বন্ধে।

গ্রামের অল্পবয়সী যুবকেরা ওর বাবার অন্ধ ভক্ত ছিল। অনেকে বাবার সঙ্গে দিনরাত ঘুরতো। সকলেই ওর বাবাকে ভালোবাসতো। কিন্তু বাবার বিয়ের পর বাবার এইসব বন্ধুরা অনেকে বাবার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। কারণ ওর বাবা নাকি ওর মার বংশের মুখে কালি লেপেছে। মার বংশ বড় বংশ—ভডাকেপাট্ বংশের নাম। সেই বংশের অপমানে ওর বাবার ওপর অনেকের রাগ হয়েছে, আক্রোশ জন্মেছে। ওর বাবা বড় বংশের ছেলে ছিল না। প্রায় তিন চার পুরুষ আগে ওর বাবার বংশের কোন এক মেয়ে নাকি নষ্ট হয়েছিল। এ ছাড়া ওর বাবা ছুৎমার্গে বিশ্বাস করতো না—সব জাতের লোকের সঙ্গেই মেলামেশা করতো। মুসলমানদের দোকানে গিয়ে চা খেতো। মুসলমানদের দোকানে গিয়ে চা খাওয়াটা সকলের চোখে খুব খারাপ লাগতো। মুসলমানদের দোকান থেকে চা খেলে হিন্দুদের জাত যায়—এতো সবাই জানে। কিন্তু ওর বাবা এটা মানতো না। কাজেই এটা একটা গুরুতর দোষ। তার ওপর পকীড়া খেলা। ভডাকেপাটের কর্তারা বাবার এই পকীড়া খেলাকে খুব খারাপ কাজ মনে করতেন। তার ওপর আবার পকীড়া খেলার সময় বাবা মাঝে মাঝে তাড়িও খেত। এরকম লোকের হাতে ভডাকেপাট বংশ তাদের মেয়ে দেয় না।

মার এক ভাই ছিল। সে আজ অনেকদিন হ'লো মারা গেছে। মার সেই ভাই-এর নাম ছিল মাধবন। মাধব মামা আর ওর বাবা খুব বন্ধু।

একদিনের কথা। সেদিন ওর মার মামা বাড়ী ছিল না। গোলা-বাড়ীতে[1] তখন বাইরের লোকের ঢোকার নিয়ম ছিল না। সন্ধ্যের

[1] এটা একটা আলাদা বাড়ীর মতো। নীচে একটা ঘরে বিরাট কাঠের সিন্দুকের মধ্যে সারা বছরের ধান জমা রাখা হয়। ওপরে বাড়ীর কর্তার জন্য একটা ঘর থাকে—সেখানে তিনি রাত্রে শোন।

সময় গোলাবাড়ীর ওপরে বসে ওর বাবা আর মাধব মামা কথাবার্তা বলছিল। সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছিল তা ওরা বুঝতে পারেনি। বাড়ীর সদর দরজার কাছে দাদুর গলার স্বর শুনে দুজনেই চমকে উঠলো।

—কে ওখানে গোলাবাড়ীর ওপরে?

দুজনেই নেমে এল। খড়ম পায়ে বুকে হাত বুলোতে বুলোতে বাড়ীর কর্তা[1] তখন উঠোনে পায়চারি করছেন।

—মাধব কে ও?

ওর বাবা উত্তর দিল—আমি তাড়াত্তেলের[2] কোন্তুন্নী নায়ার।

—সন্ধ্যের পর এখানে বাইরের লোকের ঢোকার মানেটা কি?

—আমি অন্তঃপুরে ঢুকিনি। এ বাড়ীর একজন পুরুষ মানুষের সঙ্গে কথা বলছিলাম।

দাদু পায়চারি করতে করতে বললেন—বারান্দায় দাঁড়িয়ে কথাবার্তা বল। কথা শেষ হলে চলে যাও। তা না, গোলাবাড়ীর ওপরে বসে আড্ডা মারা। ভডাকেপাটের গোলাবাড়ীর ওপরে ওঠার সাহস তাড়াত্তেলের বংশের ছেলেদের হয় কি করে?

ওর বাবা রাগ চেপে বলল—আমি কোন গোপন কাজ করতে আসিনি। কোন্তুন্নী নায়ার চাইলেই এ বাড়ীর মেয়েকে অনায়াসে নিয়ে যেতে পারে।

—বেরিয়ে যাও এখান থেকে, দাদু চীৎকার করে উঠলেন।

বাবা গলা খাঁখারি দিয়ে হ্যাক করে খানিকটা থুথু ফেলে উঠোন থেকে নেমে গেল। যাবার আগে আর একবার থুথু ফেলে বলল—ওঃ, আমার বড় বংশরে!

বুড়ীদিদির কাছে আপ্পুন্নী এই সব গল্প শুনেছে। বাড়ীর দক্ষিণ দিকের বারান্দায় দাঁড়িয়ে একজন সব দেখছিল। সে হচ্ছে ওর

[1] মাতৃমুখ্য সমাজে মামাই বাড়ীর কর্তা। এখানে আপ্পুন্নীর মার মামা এ বাড়ীর কর্তা।

[2] তাড়াত্তেল—বংশের নাম।

মা। মার তখন পূর্ণ যৌবন। ভডাকেপাটের কর্তার ছোট ভাগনী ছিল মা। মার তখন বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক হয়ে গেছে। বারো মাইল দূরে অনেক সম্পত্তির মালিক আর খুব বড় বংশের ছেলে পাত্র। উঠোনে ম্যারাপ বাঁধা হয়ে গেছে। গ্রামের সমস্ত সম্ভ্রান্ত নায়ার পরিবারদের নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। বিয়ের ভোজের জন্য কোটিকুন্নত্ থেকে বামুনদের আনানো হয়েছে। কিন্তু সে বিয়ে আর হলো না। বরযাত্রী আর বর বাড়ীর ভেতর ঢোকার পর জানা গেল যে মেয়ে পালিয়েছে। আপ্পুন্নী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো—সে আবার কি বুড়ীদিদি?

—কোন্তন্নী পারুকুট্টিকে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। আপ্পুন্নী রাবণের সীতাহরণের গল্প শুনেছে। পুষ্পক বিমানে করে রাবণ সীতাকে চুরি করে নিয়ে পালিয়ে যায়। রাবণ মহাপাজী লোক। কারণ পাজীলোক ছাড়া শ্রীরামচন্দ্রের বউকে চুরি করার ধৃষ্টতা আর কার হবে? অর্জুনও সুভদ্রাকে চুরি করে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন। অর্জুন ছিলেন মহাবীর। তীর-ধনুক ছোঁড়ায় অর্জুনের সমকক্ষ আর কেউ ছিল না। সন্ন্যাসী-বেশে অর্জুন এসেছিলেন শ্রীকৃষ্ণের বাড়ী। সেখান থেকে সুভদ্রাকে নিয়ে দে-ছুট। অর্জুন সত্যিই চালাক। অর্জুনকে বাধা দিতে এসে যাদবেরা অর্জুনের নাগাল পায়নি।

মালয়ালম বইয়েতে অর্জুন আর সুভদ্রার কাহিনী পড়ার পর আপ্পুন্নীর মনে পড়ে কেমন করে চান্দু নায়ার ওর বাবার মাকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার বিবরণ দিয়েছিল। এও এক রকমের সুভদ্রা হরণের কাহিনী। এ কাহিনী বর্ণনা করার অধিকার ঐ একটি মাত্র লোকেরই যেন আছে।

—আমি আমার নিজের চোখে দেখেছিরে ভাই। উঃ, অমন একটা ছেলে আর জন্মাবে না। চান্দু নায়ার বর্ণনা দেয়—ধানের খেতে তখন এক বুক জল। তার ওপর আবার জোঁকে ভর্তি। ধানের খেতে এক বুক জল দেখে কোন্তন্নী পারুকুট্টিকে কাঁধের ওপর নিয়ে

হাঁটতে লাগলো। লণ্ঠন নিয়ে পেছন পেছন আসছিলাম আমি। বললাম—ওরা যদি আমাদের পেছন নেয়?

কোন্তুন্নী একবার পেছন ফিরে দেখলো। তারপর বলল—চান্দু, আমি পুরুষ মানুষ। আর জন্মালেই মরতে হবে।

বুড়ী দিদি যখন ওর বাবার গল্প বলে তখন ঠিক যেন বইয়ে পড়া কাহিনীর মত মনে হয়। মাকে নিয়ে বাবা কোন্ এক বন্ধুর বাড়ী কয়েকদিন ছিল, তারপর আস্তে আস্তে সব গুছিয়ে নিল। নাম্বুদিরীদের[1] কিছু জায়গা ওর বাবা কিনে নিল। বাবা সেখানে একটা ছোটখাট বাড়ী করেছিল।

—দুতিন বছরের মধ্যে কোন্তুন্নী ওর জমিতে এত ফুল-ফল ফলিয়েছিল যে লোকে চেয়ে চেয়ে দেখতো।

ওর মার বাড়ীর লোকেরা মার শ্রাদ্ধশান্তি করে তাকে ভুলতে চেষ্টা করেছে। বংশের মুখে কালি দিয়েছে যে মেয়ে তাকে তারা মৃত বলেই ধরে নিয়েছিল। গ্রামের লোকেরা বেশ কিছুদিন ওর বাবার কথা বলাবলি করেছে। ভডাকেপাটের বংশের মেয়ে নিয়ে পালিয়েছিল ওর বাবা, চাট্টিখানি কথা নয়।

আপ্পুন্নীর তখন বছর তিনেক বয়েস। নদীর ধারের অনেকটা জমি ওর বাবা লীজ নিয়েছিল। সেয়দু আলি কুট্টি আর ওর বাবা মিলে তাতে টোপিওকা[2] পুঁতে ছিল। অনেকখানি জায়গা জুড়ে পোঁতা হয়ে ছিল। টোপিওকার ফলন এত ভাল হয়েছিল যে যে-কেউ হাজার টাকা আগাম দিয়ে ফসল কিনে নিতে রাজী হতো। পল্লীপুরম্ থেকে দোকানদাররা এসে সমস্ত টোপিওকা কিনে নিল, তারা আগামও দিল। সেদিন রাত্রে সেয়দু আলি কুট্টি বাবাকে ওর

[1] কেরালার ব্রাহ্মণদের নাম্বুদিরী বলা হয়।

[2] কন্দ জাতীয় তরকারী। কেরালার গরীব লোকেদের প্রধান খাদ্য। ভাতের বদলে টোপিওকা খাওয়া হয়।

বাড়ীতে রাতের খাওয়ার নিমন্ত্রণ করেছিল। একথা শোনার পর আপ্পুন্নীর মনে একটা সন্দেহ জাগলো।

আচ্ছা বুড়ীদিদি, মুসলমানের বাড়ীতে আমরা কি পাত পাড়তে পারি ?

—তোর বাবা সবার বাড়ীতেই পাড়তো। রাত্রে তুজনে মিলে মাংস আর পরোটা খেল। মাংসে যেন কি রকম একটা বিশ্রী স্বাদ। সেয়তু আলিকে জিজ্ঞেস করতে বলল, বুড়ো পাঁঠার মাংস, তাই স্বাদ নেই। খাওয়া শেষ করে বাবা বাড়ী ফেরার পথ ধরল, কিন্তু বাড়ী পর্যন্ত পৌঁছোতে পারলো না। পথের এক জায়গায় পেটের ব্যথায় বাবা বসে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে হুড়হুড় করে বমি। পেট টিপে ধরে কোন রকমে তু'পা হাঁটতে গিয়ে বাবা পড়ে গেল।

আপ্পুন্নীর চোখতুটো তখন জলে ভরে গেছে।

—তখন ও পথে চান্দু আসছিল। তরকারী বিক্রী করে রোজ ও পথে চান্দু বাড়ী ফেরে।

—কে পথের মাঝখানে ?

—আমি, চান্দু।

—সেকি, কি হয়েছে আপনার ?

—সেয়তু আলি কুট্টি আমার সর্বনাশ করেছে, চান্দু।

শুনতে শুনতে আপ্পুন্নীর জলে ভরা চোখ তুটো থেকে টপটপ করে জল ঝরতে লাগলো। চান্দু তখন বাবাকে কোনো রকমে টেনেটুনে বাড়ীতে নিয়ে গেল। মা তখনও আলো জ্বালিয়ে বাবার জন্য অপেক্ষা করছিল। আপ্পুন্নী ঘুমোচ্ছিল। একবার শুধু 'পারুকুট্টি' বলে ডেকেই ওর বাবা লুটিয়ে পড়লো।

—মেয়েটার কপালটাই খারাপ, কপালটাই খারাপ—বুড়ী বিড়বিড় করলো।

আপ্পুন্নী ততক্ষণে ফোঁপাতে শুরু করেছে।

সারা গ্রামে কোন্তুন্নী নায়ারের এই রকম অস্বাভাবিক মৃত্যু একটা আলোড়ন তুলেছিল। অনেকে অনেক কিছুই বলাবলি করেছিল।

কিন্তু কিছুই হলো না। লোকে বলে যে আন্তন্নী মুদেলালী নাকি পয়সা দিয়ে লোকের মুখবন্ধ করেছিল। ওর শত্রুদের মধ্যে আর একজনের নাম আপ্পুন্নী মনের মণি-কোঠায় জমা রাখলো—সে হচ্ছে আন্তন্নী মুদেলালী। পরে অবশ্য জেনে ছিল যে আন্তন্নী মরে গেছে। ভালোই হোলো শত্রুর সংখ্যা একজন কমলো।

চণ্ডালদের কাছ থেকে বিষ কিনে মাংসের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

বুড়ী মাঝে মাঝে বলে—তুই খুব বড় বংশের ছেলে, আপ্পুন্নী।

একথা অনেকবার নিজের মনেও বলেছে। যে বংশের ছেলে ও, সে বংশে আগে দশ হাজার মণ ধান হতো। সে অবশ্য অনেক আগের কথা। বুড়ী দিদির যখন দ্বিতীয়বার বিয়ে হয় তখন ভডাকেপাটের পরিবারে ভাগাভাগি শুরু হয়। ভাগের সময় বাড়ীতে চৌষট্টী জন লোক ছিল।

—চৌষট্টীজন লোকের বাড়ী!

—তখন নাকি দুটো নালুকেট্টু ছিল। এখন তার অর্ধেকও নেই। তবে একটা নালুকেট্টু, গোলাবাড়ি, জমিজমা এখনও আছে। বুড়ী-দিদি মাসের মধ্যে একবার ওখানে যায়।

—ওঃ, একটা বংশ বটে। এখনও গিয়ে ও বাড়ীর উঠোনে দাঁড়ালে কেমন যেন ভয় ভয় করে।

ওর মা ওকে সকালে ফেন-ভাত খেতে দিয়ে বামুনদের বাড়ীতে কাজে বেরোয়। মা সদর দরজা দিয়ে বেরোবার সময় বুড়ীদিদি কাছেপিঠে কোথাও থাকলেই বলবে—কি ভাগ্য মেয়েটার! ভডাকেপাটের বংশের মেয়ে—সে কিনা আজ অপরের বাড়ী ধান ভানতে যায়! কপালের লিখন! কপালের লিখন!

ভডাকেপাটের বংশে জন্মে সেখানে নালুকেট্টুতে বড় হওয়ার গল্প আপ্পুন্নী অনেক দিন থেকেই শুনছে। বুড়ীদিদি, আম্মিনীউম্মা[1],

[1] কেরালায় মুসলমানেরা মাকে ‘উম্মা’ বলে।

কোচ্চী সকলেই এ পরিবারের গল্প করে। শুনতে শুনতে সকলের আড়ালে মা চোখ মোছে।

—আহা কুঞ্চিকলআম্মার সবচেয়ে ছোট মেয়ে তোর মা। কত আদরযত্নেই না মানুষ হয়েছে। কেউ তাকে মাটিতে বসায়নি পিঁপড়ে কামড়াবে বলে। ওর প্রথম ঋতুর সময় ১০ মণ চালের ভাত রাঁধা হয়েছিল।

এমনভাবে মানুষ হ'য়েছে ওর মা, আর আজ? সকালে আপ্পুন্নীর ওঠার আগেই মার চান করা, ভাত রাঁধা, সব হয়ে যায়। মা ওর সকালের খাওয়ার ফেন-ভাত থালায় ঢেলে কলাপাতায় একটু নারকোলের আচার রেখে বাকী ফেন-ভাত রেখে দেয়। বিকেলে স্কুল থেকে ফিরে এসে ও খাবে। তারপর বারান্দায় ওর স্কুলে যাওয়ার কাপড়চোপড় রেখে মা কাজে বেরিয়ে যায়।

বামুনদের বাড়ী কাজে যাওয়ার সময় আপ্পুন্নী যদি কোনদিন আসতে চায় তো মার একটুও ভাল লাগে না। একদিন কিন্তু ও মার সঙ্গে গিয়েছিল। তখন ওর পাঁচ ছয় বছর বয়স হবে। এখনও পর্যন্ত অপ্পুন্নীর সে কথা বেশ স্পষ্ট মনে আছে। খুব বড় বাড়ী, ওখানে ধান সেদ্ধ করা, শুকোতে দেওয়া, ধান ভানা—মার কাজ।

বামুনদের বাড়ীর বৌ কানে বড় বড় মাকড়ী দুলিয়ে সব সময় ওর মাকে একটা না একটা হুকুম করছে। পেছন দিকের দরজা দিয়ে সোজা গেলে বামুনদের রান্না ঘরের উঠোন। মার সঙ্গে ও প্রথম যেদিন এসেছিল সেদিন বামুনদের বউ জিজ্ঞেস করেছিল—পারু, ছোঁড়াটা কে?

ও ছেলেমানুষ হ'লে কি হবে? বউটির বলার ধরণ আপ্পুন্নীর একটুও ভালো লাগেনি। ওর মার নাম পারু নয়—পারুকুট্টি; ও ছোঁড়া নয়—ছেলে। ঢেঁকির কাছে ও বসেছিল। মার তখন হাত ভর্তি কাজ। সদর দরজার কাছে মন্দার গাছের ছায়ায় পায়ে মল পরা, গলায় মালা দোলানো, মাথায় চুল চুড়ো করে বাঁধা একটা বাচ্চা ছেলে খেলা করছিল। বাচ্চাটা হচ্ছে বামুনদের বড় ছেলের ছেলে।

বামুনদের বড় ছেলে বারান্দায় বসে সব সময় পান খাচ্ছে আর হ্যাক হ্যাক করে পানের পিচ ফেলছে।

বামুনদের দুপুরের খাওয়া শেষ হবার পর বড় বৌ ওর মাকে ডাকলো—ও মেয়ে!

রান্নাঘরের দরজার কাছে দুটো কলাপাতা—একটার ওপর আর একটা। মা পাতাদুটো নিয়ে ঢেঁকির কাছে একটা ভালো জায়গা দেখে রাখলো। দুটোতেই উচ্ছিষ্ট ভাত তরকারী রাখা হয়েছে। আমের রস চুষে নেওয়া আঁটিগুলো পর্যন্ত তার সঙ্গে আছে দেখে আপ্পুন্নীর গা ঘিনঘিন করতে লাগলো।

—আমি ও ভাত খাবো না।

—খিদে পায়নি তোর?

—আমি খাব না, আমি ও ভাত খাব না—কোন রকমে কান্না সামলে ও বলল।

তখন ওর মা উচ্ছিষ্ট পাতাগুলোকে সরিয়ে রেখে ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলল—সব তোর মার ভাগ্য, খোকা।

ওর মাথার ওপর মার উষ্ণ অশ্রু ঝরে পড়লো।

তারপরে ও আর কোনদিন মার সঙ্গে বামুনদের বাড়ী যায়নি। মা যখন সন্ধ্যেবেলায় কাজ থেকে ফিরে আসে তখন চুপড়ী করে কিছু চাল নিয়ে আসে। সারা শরীরে মার ধানের তুষ গুঁড়ো লেগে থাকে। সন্ধ্যের অন্ধকার ঘনিয়ে এলে পর মা ওকে সঙ্গে নিয়ে কুয়োতে চান করতে যায়।

বামুনদের বাড়ীর পাশে মন্দিরের খুব বড় পুকুর। পুকুরের একেবারে উত্তর দিকটায় বড় বড় পাথর আর মধ্যে মধ্যে গর্ত। ওই গর্তেতে নাকি কুমীরেরা ডিম পাড়ে, বাচ্চা বড় করে। দক্ষিণ দিকে নতুন একটা ঘাট তৈরী হয়েছে। একটার পর একটা সিঁড়ি নেমে গেছে। এই পুকুরে চান করতে এলে ওর ক্লাশের অনেক বন্ধুর সঙ্গে ওর দেখা হয়। চান করতেও বেশ মজা লাগে। কিন্তু মা পুকুরে গিয়ে চান করতে চায় না। বাড়ী থেকে বামুনদের বাড়ী

আর বামুনদের বাড়ী থেকে বাড়ী—এই হচ্ছে মার বাইরে বেরোনো।

রাতে মা সকাল সকাল শোয়, কিন্তু আপ্পুন্নী যদি ঘুমের মধ্যে উসখুস করে তো মার ঘুম ভেঙে যায়। আশঙ্কাকুল স্বরে জিজ্ঞেস করে—কি হয়েছে রে আপ্পুন্নী ?

ছোটবেলায় মা ওর পেছনে হাত চাপড়াতে চাপড়াতে ওকে গান গেয়ে গেয়ে ঘুম পাড়াতো। কেষ্টঠাকুরের গান। এখনও ওর মনে আছে। কোনো কোনো রাতে চোখে যখন ঘুম আসে না তখন অন্ধকারে যেন দেখতে পায় পকৌড়ার ছক্কা ঘুরতে ঘুরতে পড়ছে। আবার কখনও দেখতে পায়, বুক পর্যন্ত জলে ভর্তি খেতের মধ্যে দিয়ে শক্ত সামর্থ এক পুরুষ একটা স্ত্রীলোকের দেহ কাঁধে ফেলে মাঠ পার হচ্ছে...আস্তে আস্তে চোখে ঘুম জড়িয়ে আসে।

পরীক্ষার পর স্কুল বন্ধ হয়ে যেতেই আপ্পুন্নীর বড় মুশ্‌কিল হ'লো। দেড় মাস স্কুল বন্ধ। সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি যে কি করে কাটাবে আপ্পুন্নী তা ভেবে পেল না। মা কাজে গেলে বাড়ীতে ও একেবারে একা। পঁয়তাল্লিশটা দিন কাটাতে হবে। একটা ভাঙা টিনের বাটিতে আপ্পুন্নী পঁয়তাল্লিশটা ছোট নুড়ি রাখলো। রোজ সকালে উঠে ওর প্রথম কাজ একটা করে নুড়ি ফেলে দেওয়া।

সেদিন সকালে ফেন-ভাত খাওয়ার পর কুণ্ডঙ্গলদের গেটের সামনে চাঁপাফুল গাছটার নীচে এসে দাঁড়ালো। কেশু এলে নারকেল পাতার তৈরী বল দিয়ে খেলতো, কিন্তু কেশুকে বাড়ীর বাইরে দেখাই যায় না। ওর রোদ লাগলেই হাঁপানি বাড়ে। ওর মার কড়া শাসন—বাইরের ছেলেদের সঙ্গে মিশবে না, খেলাধূলো করবে না। আপ্পুন্নী গাছের তলায় বসে ঝরাফুলগুলো ছিঁড়তে ছিঁড়তে ভাবছিল পঁয়তাল্লিশ দিন পরে স্কুল খুলবে। পাশ ও নিশ্চয়ই করবে। সার্টিফিকেট নিয়ে ও তৃতালার স্কুলে পড়তে যাবে। তৃতালার স্কুল খুব বড় স্কুল। তৃতালার স্কুল অনেক দূর। একটা টিফিন ক্যারিয়ার থাকলে ভাত নিয়ে যেতে পারতো। বাসনঅলাকে ডেকে মা দাম জিজ্ঞেস করেছিল —সাড়ে পাঁচটাকা দাম। মা বাসনঅলাকে ফিরিয়ে দিয়েছিল।

হঠাৎ বাঁ দিকের গলিটা থেকে বাঁশের লাঠির ঠুকঠুক আওয়াজ হলো। যা ভেবেছে তাই—বুড়ীদিদি। লাঠি ঠুকঠুক করে কুঁজো হয়ে হাঁটছে। আজ প্রায় তিন চার দিন বুড়ীদিদি বাড়ীতে ছিল না।

—*দিদিমা।*

বুড়ির লাঠি নিয়ে হাঁটাটা দেখে মনে হচ্ছিল যেন ছোট্ট একটা নৌকোর দাঁড় বাইছে। আপ্পুনীর কাছাকাছি *এসে হঠাৎ ওর মাথার* ওপর লাঠিটা তুলে ঠক্ করে মাটিতে একটা শব্দ করলো। তারপর ক্ষয়ে যাওয়া দাঁতগুলোয় হাসি ভরিয়ে বললে—ওঃ, তুই? আমি ভাবলাম বুঝি একটা বাছুর!

বুড়ীর এটা একটা খুব বড় তামাশা।

—তিন চার দিন খুব মজায় কাটিয়েছ দেখছি—বুড়ীর কোঁচড় হাতড়িয়ে আপ্পুন্নী বলল।

—হ্যাঁ, তা অনেক মজা হলো বৈকি। তা তুই এই রোদে বসে কি করছিস?

আপ্পুন্নী বুড়ীর সঙ্গে ওর কুঁড়েতে চলল। দরজা খুলে হাতের ভাঁড়টা নামিয়ে লাঠিটা এক কোণে রেখে বুড়ী বলল—আর পারি না রে আপ্পু। আগের মতো আর অত ঘোরাঘুরি করতে পারি না।

—তোমার কত বয়স হলো দিদিমা?

—তা অনেক বয়স হলো বৈকি। আমি কি আজকের লোক। কলম্বো, সিঙ্গাপুর ঘুরে আসা লোক তোর দিদিমা।

বুড়ী কলম্বো আর সিঙ্গাপুর একসঙ্গে বলে। কলম্বোতে বুড়ী গিয়েছিল। সে কাহিনী গ্রামের প্রায় প্রতিটি লোকেরই জানা। জাহাজে চড়েছে এমন স্ত্রীলোক কুডালুরে মাত্র দুজন আছে। একজন ছোট টিলাটার ওপরের বিরাট বাড়ীটার আম্মালুআম্মা আর একজন বুড়ীদিদি। আম্মালুআম্মার বর তখন কলম্বোতে কাজ করতো। আম্মালুআম্মাকে সাহায্য করতে বুড়ী তার সঙ্গে গিয়েছিল। বুড়ীর তখন অত বয়সও হয়নি।

—দুবছর কলম্বো ছিলাম। খাওয়া দাওয়ার কি সুখ! গরম

গরম দোসা। পাশের বাড়ীতে একটা তামিল মেয়ে ছিল—কান্নাম্মা, তাকেও দিতাম।

—দিদিমা, কোত্থেকে ঘুরে এলে? বুড়ীর তক্তাপোশে বসে আপ্পুন্নী জিজ্ঞেস করলো।

—কোথায় না গিয়েছিলাম! ভডাকেপাটে গিয়েছিলাম, ওখানে পরশুদিন ভুবনেশ্বরী পূজো ছিল আর কাল ছিল মন্দিরে গান বাজনা।[1]

একদিন পূজো তারপরের দিন গানবাজনা। ভডাকেপাটের ছেলে-মেয়েদের বেশ মজা। ভাস্করণ, কৃষ্ণন্‌কুট্টী, তাঙ্কম্—ও শুধু নামগুলো জানে। তাও বুড়ীর কাছ থেকে শুনে শুনে মনে রেখেছে। কাউকেই ও দেখেনি। মার বড় মামা, মার ভাই কুট্টন মামা, দুই বড় মাসী, দিদিমা—কাউকেই ও দেখেনি। ছেলেমেয়েদের মধ্যে কে ওর চেয়ে ছোট আর কে ওর চেয়ে বড়—তা ও জানে না।

—ভুবনেশ্বরী পূজোতে কি কি প্রসাদ পেলে দিদিমা?

—চিঁড়ে, খই, গুড়, নারকেলের পিঠে আর ভাজা পিঠে। আরও কত কি।

আপ্পুন্নীর ওইটুকু শুনেই জিভে জল এসে গেছে।

—হ্যাঁ আরও আছে—মুরগীর মাংস[2]। দিদিমা তোর জন্যে একটা জিনিষ নিয়ে এসেছে, আপ্পু—বুড়ী ওর ভাঁড় থেকে দুটো ভাজা পিঠে দিল। আঃ, ঘিয়ে ভাজা এই ভাজা পিঠে খেতে কি মজা। একটু পোড়া পোড়া দিকটা খেতেই বেশী ভাল লাগে। ভডাকেপাটের ছেলেমেয়েরা নিশ্চয় অনেকগুলো করে ভাজা পিঠে পেয়েছে।

—এখান থেকে অনেক দূরে দিদিমা?

—কোথায়? কলম্বো?

[1] কেরালায় প্রত্যেকটি বড় মন্দিরে বছরে একবার করে উৎসব হয়। সেই উৎসবের সময় দু'তিন দিন ধরে মন্দিরের মধ্যে নানারকম লোকনৃত্য ও গানবাজনা চলে।

[2] কেরালায় কালী মন্দিরগুলিতে মুরগী বলি দেওয়া হয়।

—না, ঐ...ঐ...ভডাকেপাটের বাড়ী।

—তা এখান থেকে একটু দূর বৈকি।

—খুব বড় বাড়ী, দিদিমা ?

—হ্যাঁ। বড় বাড়ী বৈকি। নালুকেট্টু কতকাল আগেকার। আমার ছোটবেলায় নালুকেট্টুতে তিনটে বার-বাড়ী ছিল।

আচ্ছা, ওতো ঐ বংশের ছেলে। ওর কেন ও বাড়ীতে যাবার অধিকার নেই ?

—তুমি আবার কবে যাবে, দিদিমা ?

—এই আগামী হপ্তায়। আগামী হপ্তায় ওখানে তুল্লল্[1] হবে।

তুল্লল্ কি ও ঠিক জানে না। ওটন্‌তুল্লল্[2] অবশ্য ও স্কুলে দেখেছে।

—নারে ওটনতুল্লল্ নয়—সর্পতুল্লল্[3]। ও বাড়ীতে আজ সতের বছর আগে একবার সর্পতুল্লল্ হয়েছিল। আবার আগামী হপ্তায় হবে—তিনদিন ধরে তিনটে সাপের জন্যে।

সর্পতুল্লল্! যে সব বাড়ীতে সর্পকাভু[4] আছে সেসব বাড়ীতেই

---

[1] তুল্লল্—অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কেরালার মন্দিরে এক ধরণের একক নাট্যাভিনয়ের প্রচলন হয়। নাটকের বিষয়বস্তু পৌরাণিক। একজন লোক গান করে করে অভিনয় করে আর একজন ঢাক বাজায়। পৌরাণিক কাহিনী ছাড়াও অনেক সময় সমাজের নানা কুসংস্কার, দোষ-ত্রুটিকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করেও গান করা হয়।

[2] ওটন্‌তুল্লল— তুল্ললের মত—এতে গানের মাত্রা আর ছন্দের তফাৎ থাকে।

[3] সর্প তুল্লল্—সাপকে সন্তুষ্ট করার জন্য পূজো।

[4] সর্পকাভু—কেরালায় বহু প্রাচীনকাল থেকে সর্প পূজার প্রচলন ছিল। বহু অভিজাত নায়ার পরিবারে সাপেদের জন্য একটা নির্দিষ্ট মন্দির থাকতো। বড় বড় গাছ সে জায়গাটাকে ঘিরে থাকে। সর্পশিলাও থাকে। রোজ সন্ধ্যাবেলায় সেখানে প্রদীপ জ্বালানো হয়। সাপকে চালের গুঁড়ো, দুধ, কলা ইত্যাদি খেতে দেওয়া হয়। এ সাপ অনেকটা বাস্তুসাপের মতো। বাড়ীর লোকজনের কোনো ক্ষতি করে না। সাপ-পূজার প্রচলন এখনও আছে, তবে বেশীর ভাগ গ্রামের দিকে।

শুধু সর্পতুল্লল্ করা যায়। বুড়ী বলল—খুব জাঁকজমক হবে। অনেক লোককে নেমন্তন্ন করা হবে। অনেক লোক আসবে—অনেক আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব। যাদের সঙ্গে হাঁড়ি ভাগ হয়েছে তারাও আসবে, শুধু ওর মা যাবে না। ওর মাকে কেউ নিমন্ত্রণ করবে না, ওকেও না। নিমন্ত্রণ করবেই বা কেন? যদি অপরের বাড়ী হয় তাহলে নিমন্ত্রণ করে। নিজের বাড়ীর লোকদের কেউ কি নিমন্ত্রণ করে? তবে মার নিষেধ—ও বাড়ীতে যাওয়া চলবে না বলেছে। কিন্তু ও বাড়ীতে সর্পতুল্লল্ হবে—আর কখনও এ তুল্লল্ দেখার সুযোগ মিলবে না। সর্পতুল্লল্ নাকি অপূর্ব। ও যদি যায় তাহলে কি হয়?

—দিদিমা, আমি তোমার সঙ্গে গেলে কি হয়?

—ওমা, তুই বলছিস কিরে আপ্পু?

বুড়ী হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালো, তারপর ঘোলাটে চোখ দুটো দিয়ে ওর দিকে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে এক মিনিট কি ভাবলো। তারপর বলল—তোর মা তোকে যেতে দেবে না।

—আমি মাকে বলবো।

—কেন বাবা এ সব গণ্ডগোলের মধ্যে যাওয়া? বুড়ী স্নেহসিক্ত স্বরে বলল।

—আমি মাকে জিজ্ঞেস করবো—বলে ও বেরিয়ে এল। বুড়ী ডাকতেও ও আর পেছনে তাকালো না।

আমারও তো বাড়ী—কেন আমি গেলে কি হয়? এরপর সর্পতুল্লল্ দেখার চিন্তা ছাড়া আর কোন চিন্তাই ওর মনে রইল না। কিন্তু মাকে বলবে কি করে? রাতে শুয়ে চোখে ঘুম এল না। অনেকক্ষণ ধরে উসখুস করে কোনরকমে শক্তিসঞ্চয় করে বলল—মা, ওখানে নাকি তুল্লল্ হচ্ছে?

—কোথায়?

—ওখানে…ঐ আমাদের ও বাড়ীতে।

—তাতে তোর কি?

এরপর ও আর একটা কথাও বলল না। কোন রকমে ওর ফোঁপানি বন্ধ করে পাশ ফিরে শুল। পরের দিন সকালেই ও বুড়ীর কাছে গেল। বুড়ীদিদি গিয়ে ওর মাকে বলুক। বুড়ী প্রথমে ওকে এসব আজেবাজে ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাতে বারণ করলো, কিন্তু ও কাঁদছে দেখে বুড়ী ওর মার কাছে গিয়ে বলতে রাজী হলো।

বুড়ী যখন মার কাছে বলতে এল, ও তখন সেখান থেকে ছুটে পালিয়ে গেছে। খানিকক্ষণ এদিক-ওদিক ঘুরে বাড়ী এসে দেখে বুড়ী চলে গেছে। বাড়ীর ভেতর ঢুকে দেখে মা রান্নাঘরের দরজার কাছে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। চুপি চুপি মার কাছে গিয়ে দেখে মার দু চোখে জল। আপ্পুন্নীকে দেখে চোখ মুছে গলা পরিষ্কার করে মা ডাকলো—আপ্পুন্নী।

আপ্পুন্নী আস্তে আস্তে মার কাছে এল।

—খোকা, তুই যা'-তা' বলে জেদ করিসনি। এসব তোর ভাগ্যে নেই। সব তোর মার কপালের লিখন। আপ্পুন্নীর রাগ হলো না, বরঞ্চ মার জন্য একটু কষ্টই হল। ও চোখ মুছলো।

—ওখানে যেতে চাস কেন বাবা ?

ব্যস, আর ও নিজেকে সংযত করতে পারল না। হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলো।

—আপ্পুন্নী, কাঁদিস না, বলে মা ওকে জড়িয়ে ধরে কিছুক্ষণ ওই ভাবে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ও শুনতে পেল মা বলছে—তোর যদি এতই ইচ্ছে তো যা।

তখন ওর মনে হলো যে বলে—না মা, আমি যেতে চাই না। মা নিজের মনেই বলল—ও তো ছেলেমানুষ। ওরও কি ইচ্ছে হয় না ? আপ্পুন্নী খুব অবাক্ হয়ে মার স্বগতোক্তি শুনছিল।

—ও বাড়ীতে তোরও অধিকার আছে। যা, তুই যা।

মার এই কথাগুলো যেন বড় গম্ভীর শোনালো। চোখ মুছে একছুটে ও বুড়ীর কুঁড়ে ঘরে গিয়ে উঠলো।

কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর বাড়ী ফেরার অনুমতি নেবার জন্য পারুকুট্টি দাঁড়িয়েছিল। ঠিক তখনই বাড়ীর বৌ-এর ওকে আর একটা হুকুম করার কথা মনে হয়েছে।

—পারু, এই কাঠগুলো চের। রান্নাঘর থেকে কতকগুলো কাঠ ছুঁড়ে বৌটি উঠোনে ফেললো। পারুকুট্টি ঢেঁকির কাছ থেকে কুড়ুলটা দিয়ে নিঃশব্দে কাঠ চিরতে লাগলো। কাঠের সঙ্গে ও যখন এভাবে ওর সমস্ত শক্তি দিয়ে মল্ল যুদ্ধ করছে তখন বামুনদের বৌ-এর ওর সঙ্গে গল্প করার অবসর মিলল।

—পারু, রাতে তোর কাছে থাকে কেরে ?

'ভগবান থাকেন' বলতে ইচ্ছে হলো, কিন্তু বলল—দাসীর একটা ছেলে আছে।

কোন্তুন্নীর কেউ নেই ?

—না, তারা অনেকদিন সব বিক্রীটিক্রী করে চলে গেছে।

—কোন্তুন্নীর বড় মাসীর একটা ছেলে ছিল না ?

—হ্যাঁ। সে অনেকদিন হলো বাইরে।

—তোর বাড়ীর কেউ নেই ?

উত্তর না দিয়ে ও খুব জোরে জোরে কাঠ চিরতে লাগলো। হঠাৎ কুড়ুলটার একটা কোপ গিয়ে পড়লো মাটিতে। বড় বৌ তা দেখল —দেখেছ কাণ্ড ! আমার কুড়ুলটার ধার গেল দেখছি।

পারুকুট্টি কোন কথা না বলে বাঁ পা দিয়ে কাঠগুলোকে চেপে ফালা ফালা করতে লাগলো। এখনও অনেক বাকী। সব কাঠ চিরে তারপর যেতে পারবে। হঠাৎ কুড়ুলের হাতলটা ছিটকে দূরে গিয়ে পড়ল। বুড়ো আঙুলের ডগায় একটা ব্যথা চিনচিন করে উঠলো। পারুকুট্টি 'উঃ' বলে মাটিতে বসে পড়ল। তাকিয়ে দেখে বুড়ো আঙুলটার ডগায় জবাফুলের মতো লাল রক্ত। রান্নাঘর থেকে বৌ-এর গলার আওয়াজ শোনা গেল—কিরে পারু, এই সন্ধ্যেবেলায় পা কেটে বসলি ?

—না, না, কিছু হয়নি

ও আস্তে আস্তে ঢেঁকির পাড়ে গিয়ে বসল। ওঃ, সমস্ত শরীর যেন অবশ হয়ে আসছে। চোখ ছুটোয় সর্ষে ফুল দেখছে।

—কি হয়েছে ?

একটা ভারী গলার আওয়াজ শুনতে পেল।

পারুকুট্টি চোখ তুলে দেখলো না। কে যেন ওর পায়ে ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দিল। চোখ খুলে দেখে ওর পা ছুটো একজনের ছুটো শক্ত হাতের ভেতর। বেশ শক্ত করে পায়ে ন্যাকড়া বেঁধে লোকটি বলল—নাঃ, বেশী কিছু লাগেনি।

—কাজের কোনো ছিরি নেই। কি যে ছেলেমানুষের মত কাজ করিস বাপু—বামুনদের বৌ রান্নাঘরের ওদিক থেকে আবার বলল। মহিলাটির কথা শুনলে মনে হয় যেন পারুকুট্টি ইচ্ছে করে তার পায়ে কুড়ুল মেরেছে।

শঙ্করণ নায়ার যেন কাউকেই বলছে না এমন ভাবে বলল—যারা এসব কাজ করে অভ্যস্ত নয় তাদের এরকম হাত-পা তো কাটবেই। কুড়ুলটা তুলে নিয়ে ও বারান্দার এক পাশে রাখলো। যেন কিছুই হয়নি এমনিভাবে সদর দরজার দিকে হাঁটা দিল।

পারুকুট্টি উঠে বসলো। আঙুলটায় বড্ড ব্যথা করছে। তা করুকগে, বিশেষ কিছু হয়নি। প্রথমটায় অবশ্য ও বড্ড বেশী ভয় পেয়ে গিয়েছিল। উঠোনে ছড়িয়ে পড়া কাঠের টুকরোগুলো সব একসঙ্গে করে রান্নাঘরের বারান্দায় জড়ো করে রাখল। খানিকক্ষণ বারান্দায় বসলো। ওর বিহ্বল ভাব এখনও যায়নি। কুড়ুল যদি আর একটু ওপরে পড়তো তাহ'লে পা-টাই কাটা যেত। ওঃ, ভাবাই যায় না—কাজকর্ম নেই আর ও বিছানায় পড়ে আছে। ওর একমাত্র প্রার্থনা যতদিন না আপ্পুন্নী বড় হয়ে নিজেরটা নিজে দেখে ততদিন যেন ভগবান ওকে সুস্থ রাখেন।

—বৌদিদিমণি।

বৌ যেন শুনতে পায়নি এমন ভাব দেখালো। বাইরে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। সুপুরি গাছের আড়ালে এক খণ্ড আকাশে নানা

রঙের সমারোহ। আরও দূরে ঝাঁকড়া গাছগুলোর মাথায় অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে।

—বৌদিদিমণি।

—দাঁড়া দাঁড়া, আসছি।

বামুনদের বাড়ীতে এমনি করে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকা যেন ওর কপালের লিখন। বাপের বাড়ীতে সন্ধ্যেবেলায় প্রদীপ জ্বালানোর ভার ছিল ওর ওপরে। সর্প-মন্দিরে, সদর দরজায়, তুলসী গাছের তলায় আলো দেখানোর পর ছোট্ট অন্য একটা প্রদীপ ঘি দিয়ে জ্বেলে কুলদেবতা ভগবতীর ঘরে রাখলেই ওর কাজ শেষ হতো। সন্ধ্যে-বেলায় যখন বাড়ীর ছেলেমেয়েরা বসে নামজপ করতো ও তখন বারান্দার থামে হেলান দিয়ে পশ্চিম আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতো। সে যেন কত যুগ আগেকার কথা। হারিয়ে যাওয়া দিনগুলোর কথা ও ভাবতে চায় না—তবু মাঝে মাঝে তারা মনের মধ্যে ভিড় করে আসে।

—পারু।

বৌ ডাকছে। চৌকাঠের কাছে কুলোতে এক সের চাল। চালগুলো থলিতে ঢেলে ও রান্নাঘরের কাছে গিয়ে বসল।

—আমি যাচ্ছি।

—আয়।

রাস্তায় চলতে চলতে ও বুঝতে পারল যে শঙ্করণ নায়ারও ওর পেছন পেছন আসছে। শঙ্করণ নায়ারের বাড়ীর ঐ একই রাস্তা। ভালোই হলো। এই ভর সন্ধ্যেয় ওকে আর একা একা হাঁটতে হবে না। ওরা দুজনে নিঃশব্দে হেঁটে চললো। ও আগে, পেছনে শঙ্করণ নায়ার। শঙ্করণ নায়ায়ের সামনে মাথা উঁচু করে পারুকুট্টি দাঁড়াতে পারে না। বাপের বাড়ী থেকেই ও শঙ্করণ নায়ারকে চেনে। বাড়ীতে কুয়ো থেকে জল তুলে গাছপালায় ঢালা শঙ্করণ নায়ারের কাজ ছিল। ঐ কুয়োর জল ছোটজাতের লোকের ছোঁয়ার উপায় ছিল না। শঙ্করণ নায়ার কালো—একটু রুক্ষ ধরণের চেহারা।

গলার স্বরও কর্কশ। দেখতে ঠিক সেই একই রকম আছে। সময় ওর শরীরে তার চিহ্ন রাখতে পারেনি।

অনেকদিন ও ওঁর বাপের বাড়ীর কাজকর্ম দেখাশোনা করত। বামুনদের বাড়ীতে এসেছে। শঙ্করণ নায়ার একেবারে একলা। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয় স্বজন কেউ কোথাও নেই। যেতে যেতে শঙ্করণ নায়ার জিজ্ঞেস করলো—আপ্পুন্নী পড়ছে তো ?

—হ্যাঁ।

—কোন্ ক্লাশে ?

—ক্লাশ এইটে। আপ্পুন্নী···পারুকুট্টি কি যেন বলতে গিয়ে থেমে গেল।

—কি ?

—আপ্পুন্নী আমাদের ও বাড়ীতে গিয়ে তুল্লল্ দেখতে চায়। বললে শুনবে না। কি যে করি !

—হুঁ।

—কি যে করবো ! ছেলেটা কাঁদতে লাগলো। আমার দুটো ভালো-মন্দ জিজ্ঞেস করারও কেউ নেই।

এতটা বলতে অবশ্য পারুকুট্টি চায়নি, কিন্তু আপ্পুন্নীর কথা এসে পড়লো বলে এতখানি বলে ফেললো।

—আপ্পুন্নী যেতে চাইলে দোষের কিছু নেই। ওরও ও বাড়ীতে অধিকার আছে। আর হ্যাঁ, পা-টা দুদিন জলে ভিজোবেন না—বলে শঙ্করণ নায়ার তাড়াতাড়ি অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

উঠোনে পা দেবার আগেই পারুকুট্টির সঙ্গে চিরুর দেখা। চিরু কুণ্ডঙ্গলদের বাড়ীতে বাইরের কাজ করে।

—পারুদিদি নাকি ?

—হ্যাঁ, চিরু নাকি ?

—তুমি কার সঙ্গে কথা বলছিলে ?

কি মুশ্‌কিল ! ওর এত কথা জানার কি দরকার ?

—এই শঙ্করণ নায়ারের সঙ্গে। বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পারুকুট্টি মনে

মনে ভাবলো চিরুর বেশ রসিয়ে গল্প করার সুযোগ মিললো। ভারী পাজী মেয়েলোক। লোকের নামে অপবাদ দেওয়া, এর কথা ওকে লাগিয়ে গণ্ডগোল পাকাতে ওস্তাদ এই চিরু।

আপ্পুন্নী লণ্ঠনের আলোতে বসে কি যেন একটা পড়ছিল। আজ চার-পাঁচ দিন ওর খুব উৎসাহ। তুল্লল্ দেখতে যাবে।

রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর হঠাৎ এক ঝাপ্টা ঝড় দিয়ে ঝিরঝির বৃষ্টি শুরু হলো। বৃষ্টি হলে ক্ষতি নেই, কিন্তু ঝড় হলেই মুশকিল। উঠোনের কলাগাছগুলোয় ঝড়ের ঝাপটার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। সেদিন রাতে বিছানায় শোওয়ার পর অনেকক্ষণ ঘুম এল না। ঘরের চালের ওপর বৃষ্টির টুপটাপ শব্দ শুনছিল পারুকুট্টি। আপ্পুন্নী গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। একবার ওর দিকে গভীর স্নেহে তাকিয়ে হাত বাড়িয়ে আলোটা নিভিয়ে দিল।

আপ্পুন্নীর যখন তিন বছর বয়স তখন ওর বাবা মারা যায়। সেদিন বিকেলে বাগানের গাছগাছালীতে জল ঢেলে, গা ধুয়ে, কাপড় বদলে ওর সঙ্গে কি একটা মজার কথা বলে হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল মানুষটা, আর ফিরে এল...

ওরা যখন প্রথম এই বাড়ীতে আসে তখন আপ্পুন্নী গর্ভে—সাত মাস। বাড়ীর ওপরটা তখন নাম মাত্র খড় দিয়ে ছাওয়া। সেটা ছিল বৈশাখ মাস, জ্যৈষ্ঠ মাসে ভালো করে ছাইবে বলেছিল। রাত্রে হঠাৎ সেদিন বৃষ্টি আর বজ্রপাত। বৈশাখ মাসে ঐ রকম বৃষ্টি আর কখনও হয়নি। ঘরের মধ্যে চারিদিকে বৃষ্টির জল পড়ে বিছানা-টিছানা সব ভিজে গেল। ঘরের এক কোণে একটু শুকনো জায়গা দেখে একটা লণ্ঠন জ্বালিয়ে দুজনে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসলো। কোন্তুন্নী পারুকুট্টির চোখের দিকে তাকিয়ে গভীর স্নেহে ডাকলে—মণি!

অমনিভাবে ঐ একটি লোকই তাকে ডেকেছে।

—মণি, কি ভাবছ?

—কিছু না।

—তোমার নিশ্চয় মনে মনে খুব অনুতাপ হচ্ছে।

'কেন', এই প্রশ্ন তুলে পারুকুট্টি স্বামীর দিকে তাকালো।

—তুমি তো এমনভাবে কোনদিনও থাকোনি।

—আমি একথা একবারেই ভাবছি না।

কিন্তু জীবনের দুঃখকষ্ট জানতে আর বেশীদিন লাগলো না। কোন্তুন্নীর মৃত্যুর পর একা ওকে দেখে গ্রামের লোকজন নানা কথা বলতে লাগলো। বাপের বাড়ী ফিরে যাবার উপায় ছিল না। মড়া পুড়িয়ে লোকে যেমন চান করে তেমনি ভাবে ওর বাপের বাড়ীর লোকেরা চান করে এল বাড়ীর এক মেয়ে আর জামাই মরেছে ভেবে। ওর দিদিরাও কি চান করেছিল? তাদের তো ছোট বোন মরেছে।

ওই লোকটার হাতদুটো যখন ও জড়িয়ে ধরেছিল তখন ওর সতের বছর বয়স। সে সব কথা এখন ভাবলে ভারী আশ্চর্য লাগে।

এককালে চৌষট্টিজন লোক থাকতো ওদের বাড়ীতে। সেই বাড়ীর উত্তরের এক কোণের ঘরে ওর জন্ম। ওই বাড়ীতেই সে বড় হয়ে উঠলো। বাড়ীর অন্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে পণ্ডিতমশাইয়ের কাছে তারও হাতে খড়ি হ'লো। বাড়ীর উঠোনের তেঁতুল গাছটার তলায় দাঁড়িয়ে যতটুকু দেখতে পেত তাই ছিল ওর সমস্ত পৃথিবী। তার ওধারে বিশেষ কিছু ও দেখেনি।

গরমকালে বাড়ীর পুকুরের জল যখন শুকিয়ে যেত তখন গ্রামের নদীতে গিয়ে চান করার অনুমতি পেত। কিন্তু একা যাওয়ার অধিকার ছিল না। সঙ্গে বড়দি নয় ছোড়দি নয় কুঞ্জুকুট্টি—কেউ না কেউ থাকতো। খুব আস্তে আস্তে উঠোন পেরিয়ে সদর দরজা খুলে বেরিয়ে আসতো। তিনটে মাঠ পেরোলেই রাস্তা। নদীর একদিকে পাথর দিয়ে সিড়ি বাঁধিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভড়াকেপাটের মেয়েরা সে ঘাটে চান করতো। ভড়াকেপাটের মেয়েরা চান করতে এলে সকলে সে ঘাট ছেড়ে চলে যেত। দাদামশায় মারা গেলেও তাঁর প্রতাপ তখনও অক্ষুণ্ণ ছিল। চান করে সদর দরজা দিয়ে বাড়ী ঢুকতো। কোন-কোনদিন উঠোনে মামা পায়চারি করতো। মুখ

না তুলে আস্তে আস্তে ওরা বাড়ীর ভেতর ঢুকতো। মা বলতো মেয়েছেলের হাঁটার শব্দ যেন শোনা না যায়।

প্রথমে ওকে দেখে একদিন বিকেলের দিকে চান করতে যাওয়ার সময়। আত্তানীর[1] ওপরে মাথায় তোয়ালে বেঁধে একটা লোক বসে আছে আর সামনে দুটো লোক দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে কথা বলছে। ও একবার একটু মুখ উঁচু করে দেখল। পান খাওয়া লাল দুটো ঠোঁট। কানে লাল দুটো পাথর। প্রথমে ওর মনে হলো বড়দির ঘরে দেওয়ালে টাঙানো রাজার ছবির কথা। কি একটা কথায় লোকটি হো হো করে হেসে উঠল। সে হাসি নদীর তীরে তীরে ছড়িয়ে পড়ল। ও যখন কুঞ্জুকুট্টির সঙ্গে আত্তানীর সামনে পোঁছোলো তখন তাদের কথাবার্তা বন্ধ হয়ে গেল। ওই লোকটির চোখ দুটো কি তার দেহের ওপর পড়েছে? তাড়াতাড়ি হাঁটবে ভাবলো, কিন্তু পা যেন আর চলে না। ঘাটে নামার সময় কুঞ্জুকুট্টির আড়ালে একবার চেয়ে দেখল। লোকটা তখন আত্তানীর ওপর থেকে নীচে দাঁড়িয়েছে। সুদীর্ঘ লম্বা শরীর, টানা টানা চোখ দুটি।

চান করার সময় কোন কৌতূহল দেখানোর ভান না করে কুঞ্জুকুট্টিকে জিজ্ঞেস করল।

—কে রে ও কুঞ্জুকুট্টি?

—কে?

—ঐ আত্তানীর ওপর বসেছিল।

—কোন্তুন্নী নায়ার—পকীড়া খেলুড়ে কোন্তুন্নী নায়ার।

চান করে ফিরে আসার সময় পরপর কদিন ও কোন্তুন্নী নায়ারকে দেখেছে। একদিন ও একা ছিল। মা ওকে একা যেতে দিতে চায়নি। 'কাপড়চোপড় বড় নোংরা হয়ে আছে, মা'—বলে বেরিয়ে

[1]পাথর দিয়ে বাঁধানো বুক-সমান উঁচু একটা জায়গা। গ্রামের লোকেরা হাটবাজার থেকে জিনিষপত্র কিনে ফেরার সময় এর ওপর জিনিষপত্র রেখে বিশ্রাম করে। কখনও কখনও নিজেরাও বসে।

পড়েছিল। মাঠ পার হয়ে আত্তানীর কাছে পৌঁছনোর পর মাথা ওর আপনিই নীচু হয়ে গেল। পা দুটো ওর যেন কাঁপছে। একবার সাহস করে তাকিয়ে দেখলো—না, আজ আর তার ওপর কেউ বসে নেই। কিন্তু একটু হাঁটতেই দেখা হয়ে গেল। ওর হাঁটার গতি বেড়ে গেল।

—একা নাকি?

ওকে কি জিজ্ঞেস করছে নাকি? ও কোনরকমে 'হুঁ' বলে একটা আওয়াজ করলো। পরের দিনও দেখা হলো। সেদিন লোকটি ওকে ডাকলো—পারুকুট্টি।

ও বুকের ধকধকানি নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

—আমি এই গ্রামের লোক, নাম কোন্তুন্নী।

ওর এমনভাবে নিজের পরিচয় দেওয়াতে পারুকুট্টির হাসি পেল। নাঃ, সাহসও আছে লোকটার! ও এক মিনিট থামলো।

—আমি জানি।

—জানো? তবে না চেনার ভান করে চলে যাচ্ছ যে?

—এভাবে খোলা রাস্তায় দাঁড়িয়ে কি কথা বলা যায় নাকি?

এমনি ভাবে পরিচয় শুরু। ওর দিদিমা যখন মারা যায় তখন দাহ কর্মের সময়, শ্রাদ্ধের সময় গ্রামের অন্যান্য লোকের সঙ্গে কোন্তুন্নীও ছিল। বারবাড়ীর উঠোনে কোন্তুন্নী কাজ করছে, কাজ করাচ্ছে—ও বাড়ীর ভেতর থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখেছিল।

দুজনের মধ্যে দেখাশোনার, কথাবার্তার অনেক সুযোগ মিললো। সুযোগ অবশ্য আপনা থেকে হয়নি, সুযোগ করে নিতে হয়েছে। কোন্তুন্নীর সঙ্গে ভাই-এর আলাপ হলো। কোন্তুন্নী ভাই-এর খুব বন্ধু হয়ে দাঁড়ালো। এর মধ্যে একদিন বাড়ীর মধ্যে এল। বড়-মামার তা পছন্দ হল না। এমনি ভাবে গোলমাল শুরু হলো।

একদিন ওর ভাবী বর আরও তিনজন লোকের সঙ্গে ওদের বাড়ীতে এল। বড়মামার সঙ্গে কথাবার্তা হল। বাড়ীর দক্ষিণ দিকের বারান্দায় ওদের খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। গ্রামের কয়েকজন

মাতব্বর লোকও ছিল। খাওয়ার সময় ওর ভাবী বরকে ওর ছোড়দি আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। বেশ বয়স হয়েছে লোকটার। হাতে ঠোঁটে শ্বেতীর মত সাদাসাদা দাগ, ঠিক কাটা ওলের ভেতরটার মত।

সেদিন সারারাত ও কেঁদেছে। কাউকে কিছু বলেনি। বলারই বা কি ছিল? মা জানতো—মারও যে খুব ইচ্ছে ছিল তা নয়। তবে কুঞ্জকৃষ্ণন[1] সম্বন্ধ ঠিক করেছে। আমি কি করতে পারি বল্—মা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছিল।

লোকটা বড়লোক, অনেক খেত-খামার, ছোট ছোট টিলা আর বন-জঙ্গলের মালিক। প্রথম পক্ষের বউ মারা গেছে। দ্বিতীয় পক্ষের বউ-এর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি। তবে লোক খারাপ নয়। দ্বিতীয় পক্ষের পরিবার আর ছেলেমেয়েদের খরচ দেয়। সকলে এই কথাই বলাবলি করছিল।

কোন্তন্নীর সঙ্গে একবার দেখা করার জন্য প্রাণমন ওর আকুল হয়ে উঠলো। দেখা হলো বিয়ের আগের দিন। দিদিমার বড় বোনকে পান-সুপুরি দিয়ে[2] তার আশীর্ব্বাদ নিয়ে ফেরার পথে দেখা হলো। ওর সঙ্গে বল্লীর মেয়ে কুট্টিপেন্ন ছিল। রাস্তার পাশে একটা গাছের ডালপালা সরিয়ে কোন্তন্নী দাঁড়িয়েছিল। পান-খাওয়া ঠোঁটদুটিতে তখনও এক বেপরোয়া হাসি। দেখা মাত্র পারুকুট্টির সমস্ত সংযম ভেসে গেল। ও হু হু করে কেঁদে উঠল।

—পারুকুট্টি।

—পারুকুট্টি, কি হয়েছে?

গলায় কথা আটকে গেছে। ও যেন নিজের মধ্যে ছিল না। কোন্তন্নী কি যে বলল, কি যে শুনলো কিছুই ওর মনে নেই।

—পারুকুট্টি, তোমার আমার ওপর বিশ্বাস আছে?

[1]পারুকুট্টির মামা—মাতৃমুখ্য সমাজে মামাই হচ্ছে পরিবারের কর্তা, পিতা নয়।

[2]হিন্দুদের প্রথা।

একটা কথাও বলতে পারল না, বুকের মধ্যে তখন ওর ফুলে ফুলে উঠছিল।

—আমার নালুকেট্টুও নেই, গোলাবাড়ীও নেই! কিন্তু আমি পুরুষমানুষ। সাহস যদি থাকে তো চলে এসো। যতদিন আমার এই হাত দুটোয় শক্তি থাকবে ততদিন তোমার কোনো ভয় নেই। শক্তসমর্থ ঐ জোয়ান লোকটার কথাগুলোর মধ্যে কি যেন একটা ছিল। ও চোখ বুঁজে কোনোরকমে বলল—আমি আসব।

হ্যাঁ, যতদিন বেঁচেছিল ততদিন ওকে কোন কিছুর অভাব জানতে দেয়নি। যতখানি ভাল করে রাখা সম্ভব ততখানি ভাল করেই রেখেছিল। গ্রামের লোক বলাবলি করত—কোন্তুন্নী বিয়ের পর একেবারে বদলে গেছে। বিয়ের পর একদিনও পকীড়া খেলেনি। মদ খেয়ে উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়ায়নি। সকাল সন্ধ্যে বিশ্রাম না করে জমিতে খেটেছে, ফসল ফলিয়েছে।

বাইরে বৃষ্টি থেমে গেছে মনে হচ্ছে। শুধু বাতাসের একটা ছোট্ট সোঁ সোঁ আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। জানলায় ঝুলোনো চাটাইটার ফুটোর মধ্যে দিয়ে মাঝে মাঝে বিদ্যুতের ঝলকানি দেখা যাচ্ছে। বাতাসে একটু ঠাণ্ডার আমেজ। আপ্পুন্নীর গায়ে একটা চাদর ঢাকা দিয়ে পারুকুট্টি ওর গা ঘেঁষে শুল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

দুপুর বেলার মধ্যেই সারা বাড়ী লোকে ভরে গেল। বাড়ীর দক্ষিণ আর উত্তর ভাগে মেয়েদের ভিড়। তাদের পেছনে ক্রন্দনরত শিশুর দল। সকলেই আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব। বারান্দায় সব বড় বড় ছেলেরা। উঠোনে প্যাণ্ডেলের তলায় পুরুষমানুষেরা। প্যাণ্ডেলের কাছেই হোগলা দিয়ে অনেকটা জায়গা ছাওয়া হয়েছে। ওখানে পুল্লবনেরা[1] বসবে। তাদের দরকার মতো পানজল সরবরাহ করার ভার মালুর ওপর পড়েছে। মালু হচ্ছে এ পরিবারের কর্তার ভাগ্নের মেয়ে।

মালুর এ কাজ বেশ ভালোই লাগছিল। সারাক্ষণ খুশী মনে ও কাজ করছিল। পুল্লবনদের মধ্যে বয়সে সবচেয়ে বড় রামন্, রামনের বউ খুব ভাল গান করে। ওর গান শোনার জন্য মালু অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল।

মালু যখন ওর বাবার সঙ্গে এ পরিবারে আসে তখন ওকে বলে দেওয়া হয়েছিল ও যেন এ বাড়ীর সকলের কথা মেনে চলে। তাই ওকে যে যা হুকুম করছিল কোনোটাতেই মালু 'না' বলেনি। তুল্লল্ দেখার জন্য মালুও হা করে ছিল। তুল্ললের কথা ও শুনেছে কিন্তু কেমন জিনিষ দেখেনি। বাড়ীতে দুটো সর্পমন্দির আছে। দুটো মন্দিরে তিনটে সাপ আছে, তাদের নামও মালু জানে—কৃষ্ণনাগ, মণিনাগ আর অঞ্জননাগ। এই সাপেদের মধ্যে কে আবার ছোট জাতের আর কে বড় জাতের তাও মালু জানে। মালু এই সাপ-গুলোকে দেখেনি। সর্পমন্দিরে কোন্ গাছের নীচে ওদের বাড়ী ও তা জানে না। সে বাড়ী বিরাট 'অট্টালিকা। ছেলেমেয়ে, নাতি-

[1] কেরালার এক অস্পৃশ্য জাতি। সর্পতুল্ললের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এদের অনেকখানি অংশ থাকে।

নাতনী চাকরবাকর নিয়ে অনেক সাপ ওখানে বাস করে। তার মধ্যে একটা সাপকে ওদের উঠোনের সিঁড়ির কাছে কিছুদিন আগে দেখা গিয়েছিল। সন্ধেবেলায় বাইরের উঠোনে প্রদীপ দেখাতে গিয়ে তাঙ্কম্মা দিদি চীৎকার করে উঠেছিল—মা সাপ, মাসী সাপ।

প্রদীপ না দেখিয়েই দিদি ছুট দিয়েছিল।

—সন্ধেবেলায় এত চেঁচামেচি করছিস কেন? বলে ওর মা ওকে ধমক দিয়েছিল। তাঙ্কম্মার মা মালুর পিসী। তাঙ্কম্মা বাইরের উঠোনের দিকে দেখিয়ে বলেছিল—সাপ, মা।

পিসী চেঁচিয়ে সকলকে জড়ো করলো। পিসীর পরের ভাই মালুর বাবা। ওর বাবা আর ওর পিসতুতো দাদারা ভাস্করণ, কৃষ্ণন্‌কুট্টি। সকলে হৈ হৈ করে ছুটে এল। ঠাকুরমাও বাড়ীর ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। কিন্তু সাপকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। উঠোনের সিঁড়ির কাছে সদর দরজায়, নারকেল রাখার জায়গায় খোঁজাখুঁজি করা হলো। কিন্তু কোথাও সাপের দেখা পাওয়া গেল না। তখন ঠাকুরমা বলল— এ সাপ বোধহয় মন্দিরের সাপ। কেমন করে এদিকে এসে পড়েছে। এ সাপকে মেরো না।

ঠাকুর্দা (ঠাকুরমার ভাই) একটু পরে এল। সে হচ্ছে বাড়ীর কর্তা। ঠাকুর্দাকে দেখে সকলে বাড়ীর ভেতর ঢুকে গেল। মালুর বাবা সরে গিয়ে পুব বারান্দায় দাঁড়ালো। ঠাকুরমা ভাইকে সব বলবার জন্য দাঁড়িয়ে ছিল। সব শুনে ঠাকুর্দা বলল,— দুধ, কলা, চালের গুঁড়ো সব ঠিকমতো দেওয়া হচ্ছে? এমনভাবে ওদের বাইরে আসার মানেটা কি?

তারপর উঠোনে কিছুক্ষণ এদিক থেকে ওদিকে পায়চারী করে বললন— সাপ তো ঘোরাঘুরি করবেই। আচার-বিচার কি কিছু আছে এ বাড়ীতে?

তারপর মালুর বাবাকে ডেকে বলল— কাল মাঠে যাওয়ার সময় বামুনকে একবার আসতে বলিস। পুজো দিতে হবে।

বাড়ীর আরও কয়েক জায়গায় সাপটাকে আবার দেখা গেল।

গোয়ালে, বাড়ীর পেছনের দিকে, উঠোনের এক পাশের কাঁঠাল গাছটার নীচে।

আপ্পুকুট্টন পানিক্কর এসে কড়ি ফেলে দেখে শেষে বলল—সাপেরা সব তৃষ্ণার্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দুধ কলাতে ওদের মন ভরছে না। সর্পতুল্ললের ব্যবস্থা করতে হবে।

তখন পুল্লবন রামন এসে তুল্ললের সব বিধিব্যবস্থা ঠিক করল। তুল্ললে ভাগ নেবে আম্মিনী পিসী আর তাঙ্কম্মা দিদি। আম্মিনী ঠাকুর্দার সবচেয়ে ছোট মেয়ে। ঠাকুরমা আর ছেলেমেয়েরা কাল এ বাড়ীতে এসেছে।

ঠাকুর্দা খালি গায়ে বুক অবধি মুণ্ডটাকে[1] শক্ত করে বেঁধে খড়ম পরে খট্‌খট্ করে এদিক-ওদিক চলাফেরা করছে। বুকের সাদা লোমগুলোর মধ্যে তার আঙুলগুলো নাড়াচাড়া করছে। আর যখনই সুযোগ পাচ্ছে প্যাণ্ডেলে জড়ো হওয়া লোকদের কাছে সেকালের গল্প করছে।

—হ্যাঁ, সে ছিল এককাল। মামা যখন গোলাবাড়িতে গিয়ে বসতো তখন ভয়ে কেউ মুখে রা করতো না।

কয়েকজন বুড়ো বেশ সম্ভ্রমের সঙ্গে ঠাকুর্দার কথা শুনছিল। সর্পতুল্ললের পূজারী নারায়ণম্ বলল—হ্যাঁ, ওনাকে আমার এখনও মনে আছে। ঠিক যেন সোঁদর বনের কেঁদো বাঘ। কোরা মুণ্ড পরে, কপালে চন্দনের তিলক এঁকে, কানে তুলসী ফুল গুঁজে, সকলের ছোঁয়া বাঁচিয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল নারায়ণম্ নায়ার।

গ্রামের বয়স্ক লোকেরা বাড়ীতে এলেই ঠাকুর্দা আগেকার দিনের গল্প করবে—এখন গ্রামের লোকের পয়সা হয়েছে। আমাদের চেয়েও অনেক বড়লোক নায়ার পরিবার এ গ্রামে আছে। কিন্তু আমাদের বংশের কাছাকাছি দাঁড়ানোর যোগ্যতা আর— কোনো নায়ার বংশের আছে কি?

---

[1]মুণ্ড—মালয়ালী পুরুষদের বেশি, চার হাত কাপড়। লুঙ্গীর মত করে পরে।

একটা বুড়ো মাথা নেড়ে বলল— ঠিকই তো, ঠিকই তো। এরা তো সব ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়েছে।

—একদিন আমার কাছ থেকে যারা ধান ভিক্ষে করে নিয়ে গেছে আজ তারাই সব বড়লোক হয়েছে। আরে ছোঃ!

বুড়ো আবার মাথা নাড়লো।

—আমাদের বংশ যে সে বংশ নয়। এ বংশের কুলদেবতা সর্ব-বিপদনাশিনী দেবী ভগবতী।

—তাই তো আপনাদের ঐশ্বর্য উথলে উঠেছে। ভগবতী সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা।

মালু আস্তে আস্তে ওখান থেকে সরে উত্তর দিকে মেয়েমহলে গেল।

তাঙ্কম্মা দিদি আর আম্মিনী পিসী চান করে শুদ্ধ হয়েছে। তাঙ্কম্মা দিদির সব সময় কেমন যেন একটা অহঙ্কারী ভাব। ও যেন কেউকেটা নয়, এটা সবসময় দেখাতে চায়। আজকের কথাই ধরা যাক। আম্মিনী পিসী চান করে কপালে চন্দন লেপে টিপ পরে চুপ করে বসেছিল। ওকে দেখতে খুব সুন্দর লাগছিল। তাঙ্কম্মা দিদি ঈর্ষার সঙ্গে পিসীর দিকে তাকিয়ে ছিল। পিসীর গায়ের রঙ ধবধবে ফর্সা। গলার নীল শিরাগুলো যেন জ্বলছে। বাঁ দিকের কাঁধ দিয়ে চুলগুলো ছেড়ে দিয়েছে। কালো সাপের মত চুলগুলো এদিক ওদিক হেলছে, দুলছে।

বড় ঠাকুর্দার ছেলেমেয়েদের মধ্যে শুধু কল্যাণী পিসী আসতে পারেনি। পিসী এখন আঁতুড় ঘরে। ওর বড়ছেলে ঠাকুরমার সঙ্গে এসেছে। ঠাকুরমার বাড়ী এখান থেকে চার-পাঁচ মাইল দূরে। ঠাকুরমা[1] বাপের বাড়ী থাকে না। নিজের বাড়ী করেছে। গতবছর আম্মিনী পিসীর প্রথম ঋতুমতী হওয়ার উৎসবে মালু ঠাকুর্দার সঙ্গে গিয়ে সে বাড়ী দেখে এসেছিল। পিসীর গলার হারটা কি সুন্দর ঝক্ঝক্ করছে। মালুর গলায় হার নেই। কালো শক্ত সূতোয়

[1] মাতৃমুখ্য সমাজে মেয়েরা শ্বশুর বাড়ী যায় না, বাপের বাড়ী থাকে।

একটা চ্যাপ্টা লকেট মাত্র আছে। লকেটটা ওর মায়ের। মা মারা যাবার পর কে যেন লকেটটা খুলে নিয়ে ওকে দিয়েছিল। আম্মিনী পিসী এতক্ষণ ওকে দেখতে পায়নি। এখন হঠাৎ দেখতে পেয়ে হেসে বলল— মালু যে, কবে এলি ?

উত্তর দিল তাঙ্কম্মা দিদি—এ মেয়েটা তো গত বছর থেকেই এখানে আছে। হ্যাঁ, বছরখানেক হলো ও এবাড়ীতে এসেছে। মা মারা যাবার পর বাড়ীতে ওর একটুও স্বস্তি ছিল না। মাসী আর মাসীর ছেলেমেয়েরা ছিল। বাড়ী মাসীর নামে। ওর ঠাকুরমা তখন ওকে এ বাড়ীতে এসে থাকতে বলেছিল।

উঠোনে পাতা পড়ছে। প্রথমে বাচ্চাদের আর মেয়েদের। বাচ্চাদের সঙ্গে বসতে মালুর একদম ভালো লাগে না। মেয়েদের সঙ্গে বসার ওর ইচ্ছে। তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে তুল্লল্ দেখার ভালো জায়গা দেখে রাখতে হবে। বারান্দার এক কোণে একটা খালি পাতা দেখে ও তাতে বসে পড়ল।

প্যাণ্ডেলের সামনে বাঁশের খুঁটির কাছে বসলে একেবারে সামনেই পুজোর জায়গা। বেশ ভালো ভাবে দেখা যাবে। মালু খুব তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে উঠলো। হাত পরিষ্কার করে পূব দিকের বারান্দায় পাতা কেটে জড়ো করে রাখার জায়গাটায় একটা ছেলে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছে দেখতে পেল। একটা লাল রঙের হাফপ্যাণ্ট আর নোংরা সবুজ রঙের একটা সার্ট পরণে। মালু একটুখানি কি ভাবলো তারপর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো —তোমার খাওয়া হয়েছে ?

ছেলেটা ওর মুখের দিকে খুব অদ্ভুতভাবে দেখলো।

—তোমার খাওয়া হয়েছে ?

—উঁ…উঁ…

—ছেলেদের তো সব খাওয়া হয়ে গেছে।

—যাকগে। খুব গম্ভীর স্বরে ছেলেটি উত্তর দিল। মালুর একটু লজ্জা লজ্জা করছিল। তাও ও জিজ্ঞেস করলো—ভাত খাবে না ?

-ভাত খেতে তো আসিনি '

ওর অহংকারের কথাবার্তা শুনে মালুর ইচ্ছে হলো ওখান থেকে চলে যায়। কিন্তু ছেলেটা মাথা নীচু করে মাটির দিকে চেয়ে রয়েছে দেখে আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলো—তুমি কোন্ বাড়ীর ছেলে ?

ছেলেটা যেন ওর প্রশ্ন শুনতে পায়নি এমনি ভাবে উঠোনের শ্যাওলা ধরা দেওয়ালগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল।

—তোমার নাম কি ?

—আপ্পুন্নী।

—তুমি কোন্ বাড়ীর ছেলে ?

ছেলেটার মুখটা লাল হয়ে উঠলো। খুব রাগরাগ ভাবে ও মালুর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল—আমি এ বাড়ীর ছেলে। তোমার এত খোঁজে দরকার কি ?

ওর রাগ দেখে আর জবাব শুনে মালুর খুব মজা লাগছিল। এই বাড়ীর ছেলে ? মালুর সঙ্গে ঠাট্টা করছে ? —এ বাড়ীর ছেলে সব আমার চেনা। পরে কি বলতে গিয়ে মালু দেখলো যে ছেলেটার চোখ দুটো জলে ভরে উঠেছে।

—আমি কোন্তুন্নী নায়ারের ছেলে। আমার মা আর আমি এবাড়ীর লোক।

মালু হঠাৎ চুপ করে গেল। তাঙ্কম্মা দিদি ওকে ওর এক পিসীর কথা বলেছিল যাকে চুরি করে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। ওঃ, এই তাহলে ওর পিসতুতো দাদা আপ্পুন্নী। মালু বারান্দায় ওর পাশে বসে পড়লো। তারপর আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলো—তুমি কাঁদছ কেন ?

আপ্পুন্নী চুপ করে রইল।

—একা একা এসেছ ?

—পাড়ার বুড়া দিদিমা আছে।

—বুড়াদিদিকে তো দেখলাম। পানও দিলাম। কৈ, তোমার কথা তো কিছু বলল না। তারপর নিজের মনেই বলল—বুড়ীর কেবল পানের দিকে নজর।

ওর কথা শুনে আপ্পুন্নীর হাসি পেল।

মালু বলল—চল আমরা একটা ভালো জায়গা দেখে বসি। পশ্চিম দিকের বাঁশের খুঁটিটার কাছে বসলে সব ভালো করে দেখা যাবে।

মালুর পেছন পেছন আপ্পুন্নী চললো।

বাইরে ঢাকের আওয়াজ শোনা গেল। মালু খুব উৎসাহের সঙ্গে ওর দিকে তাকিয়ে বলল—এক্ষুণি আরম্ভ হবে।

প্যাণ্ডেলের চারিদিক নারিকেলের শীষ আর আমপাতা দিয়ে সাজানো হয়েছে। পূজোর জায়গায় আলপনা দেওয়া হয়েছে। চাল গুঁড়ো আর হলুদের গুঁড়ো মিশিয়ে লাল রঙের এক রকম গুঁড়ো দিয়ে আলপনা দেওয়া হয়েছে। জড়াজড়ি করে ফণা ছড়িয়ে দুটো সাপ শুয়ে আছে। প্যাণ্ডেলের মাঝখানে কলাগাছ কেটে চারদিকে পোঁতা হয়েছে। তার ওপর একটা লাল চেলীর কাপড় বিছিয়ে দিয়ে আর একটা ছোট প্যাণ্ডেলের মতো করা হয়েছে। সেখানেও আলপনা দেওয়া হয়েছে। সেই আলপনা দিয়েছে পুল্লবন্ রামন। কেমন করে নারকেল মালায় তুষের কালো গুঁড়ো ভর্ত্তি করে ফুটো দিয়ে মাটিতে আলপনা এঁকেছে মালু আপ্পুন্নাকে তার বর্ণনা দিচ্ছিল।

ছোট প্যাণ্ডেলের ওদিক থেকে রামন পূজারীকে একটার পর একটা নির্দেশ দিতে লাগলো। প্রথমে বলল—প্রদীপ জ্বালান।

বাইরে তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। কলাগাছের খুঁটিগুলোর চারপাশে প্রদীপ জ্বালিয়ে দেওয়া হলো। প্যাণ্ডেলের অপর দিকে সাতটা সলতে লাগানো বড় বড় তিনটে প্রদীপ জ্বলছে।

—পূজোর জিনিষপত্র আনুন, রামন আদেশ দিল। কলাপাতায় চিঁড়ে, খই, আতপচাল আর তুলসীপাতা রাখা হয়েছে। তারপর রামন পূজারীকে একটার পর একটা নির্দেশ দিতে লাগলো—মুখ হাত-পা ভালো করে ধোন। মনে মনে নাগ দেবতার কথা স্মরণ

করে ডান পা বাড়িয়ে কলাগাছের চারপাশ প্রদক্ষিণ করুন তারপর পূর্বদিকে মুখ করে বসুন।

ঠিক যেন কবিতা মুখস্থ বলছে এমন ভাবে রামন বলে যেতে লাগলো আর পূজারী তা অনুসরণ করতে লাগলো।

—পূজামণ্ডপে আতপচাল আর নারকোল রাখুন।

রামনের নির্দেশানুসারে পূজারী পূজা আরম্ভ করলো। পূজারী পূজা আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গে ঢাকগুলো সব একসঙ্গে গুড়গুড় করে বেজে উঠলো। কালবৈশাখীর সময় বাজের গুরু গুরু শব্দের মতো ঢাকগুলো সব একসঙ্গে বেজে উঠতে সমস্ত জায়গাটা যেন তার আওয়াজে কেঁপে উঠতে লাগলো। প্যাণ্ডেলের আর একদিকে পুল্লবন্ আর পুল্লবতীরা বসেছিল। তিনটে ঢাক, তিনটে ঢোল আর দুটো বীণা। ঢাকের আওয়াজে ঢোল আর বীণার শব্দ ঠিকমতো শোনা যাচ্ছিল না। রামনের বউ গান আরম্ভ করল—

শ্রী-ম-হা-দে-বা-য়—

গান শুনতে আপ্পুন্নীর বিশেষ ভালো লাগছিল না। ও প্যাণ্ডেলের লোকগুলোর দিকে ভালো করে দেখতে লাগলো। উঠোনে ফর্সা লম্বা এক বৃদ্ধ খড়ম পায়ে খট্‌খট্ করে বেড়াচ্ছে। কোথাও যদি কোন গণ্ডগোল বা শব্দ হচ্ছে অমনি সেদিকে তাকিয়ে দেখছে। লোকটার ফর্সা লালচে মুখখানিতে কেমন যেন একটা ভয় জাগানো ভাব। আপ্পুন্নী মালুকে আস্তে জিজ্ঞেস করলো—ঐ লোকটা কে?

মালু খুব আস্তে আস্তে বলল—ঠাকুর্দা।

দাদামশায়*! আপ্পুন্নীর বুকটা হঠাৎ ধক্ করে উঠলো। ঐ লালচে মুখের দিকে আর-একবার তাকানোর তার সাহস হলো না। এই-ই হচ্ছে তার দাদামশায়। এই লোকটাই...পুজামণ্ডপের কাছে একটা রোগা কালো মতো লোক কুঁজো হয়ে প্রদীপের শিখাগুলো বাড়িয়ে দিচ্ছিল—তাকে দেখিয়ে মালু বলল,—আমার বাবা।

* মার মামা

তারপর বলল—তোমার মামা।

দাদু, মামা—আরও অনেকে আছে। ঐ ছেলেগুলোর মধ্যে আছে ভাস্করণ, কৃষ্ণনকুট্টি—তার মাসতুতো ভায়েরা ; আর মেয়েদের মধ্যে বসে আছে বড় মাসী, তারপর...মালু সব জানে। ওকে জিজ্ঞেস করলে ওকে ওর মামা, মাসী, মাসতুতো-মামাতো ভাইবোনের দেখিয়ে দেবে। ওদের সব কি বলে ডাকবে ও? বাড়ী থেকে আসবার সময় এসব কিছুই ভাবেনি। ভেবেছিল এসে বাচ্ছাদের সঙ্গে ঘুরবে, বাড়ীর চারিদিক দেখবে। আসার সময় মন ওর আনন্দে নাচছিলো। বুড়ীদিদির সঙ্গে যখন এ বাড়ীতে তখন অবাক হ'য়ে ও চারিদিকে তাকিয়ে দেখছিল। এইই নালুকেট্টু—এত বড় বাড়ী। বুড়ী দিদি ওকে বাচ্চাদের সঙ্গে গিয়ে বসতে বলল। ভেতরে ঢুকে ও আরও অবাক। বড় বড় উঠোন, ধানের মরাই, গোয়ালে সাত আটটা বড় বড় গোরু। পেছন ফিরে দেখলো বুড়ী দিদি বাড়ীর উত্তর দিকে মেয়েমহলে চলে গেছে। ও একেবারে একা। কেউ কেউ সদর দরজার কাছে, উঠোনে, বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল। ওকে বিশেষ কেউ লক্ষ্য করলো না। পুব দিকের বারান্দার একদিকে গিয়ে ও বসলো। ভেতর থেকে মেয়েদের গোলমাল আর বাচ্চাদের কান্নার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। কাউকে ও চেনে কিনা দেখতে লাগলো। না, কাউকেই না। ও চুপচাপ বসে রইল। যদি কেউ এসে কিছু বলে?

কে যে আসবে, কি যে বলবে— তা অবশ্য ও জানে না, তবু কেমন যেন একটা ভয়। কেউ কিছু বলল না। কেউ যে ওকে দেখছে এমনও মনে হলো না। আর ঠিক তখনই ওর মনে হলো —না এলেই ভালো হতো। ওর ইচ্ছে হল চীৎকার করে বলে —আমি এ বাড়ীর ছেলে।

কেউ ওকে দেখছে না, কেউ ওর সাথে কথা বলছে না—এ যেন ওর অসহ্য লাগছিল।

হঠাৎ শুনতে পেল কে যেন চেঁচিয়ে বলছে—বাচ্চারা সব বসে

পড়ুক। বাচ্চাদের পাতা পড়েছে। আপ্পুন্নী শুনতে পেল কত ছেলেমেয়েদের নাম ধরে ডাকা হচ্ছে. কিন্তু ওকে কেউ ডাকলো না, ওর খোঁজ কেউ করল না। দরকার নেই ওর এই নেমন্তন্ন খাওয়া—ও অত হ্যাংলা নয়। কেমন যেন একটা অহেতুক রাগ হতে লাগলো—নিজের ওপর আর সকলের ওপর। এখানকার এই নেমন্তন্নকে ও এক কানাকড়িও মূল্য দেয় না। ও কোন্তন্নী নায়ারের ছেলে—আপ্পুন্নী নায়ার। ঠিকমতো ছক্কা ফেল্‌তো কোন্তন্নী নায়ার। বাবার কথা মনে উঠতেই সেয়দ্ আলি কুট্টির ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠল। ঘাড়ে-গর্দানে, লাল গোল গোল চোখ। ঐ লোকটাই তো··

—হে ভগবান এর উপযুক্ত শাস্তি তুমি দিয়ো।

আর তখনই মালু এল। মালু পুল্লবতীদের গান খুব মনযোগ দিয়ে শুনছিল। ঢাক এখন আস্তে আস্তে বাজছে। বীণার শব্দ তাই শোনা যাচ্ছে।

তারপর রামনের বউ গান আরম্ভ করলো। রামনের বউ গান আরম্ভ করতেই রামন পুরুতকে কি যেন বলল। তুল্ললে যারা যোগ দেবে পুরুত তাদের আসতে বলল। সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত সব লোকের চোখ প্যাণ্ডেলের বাইরে গিয়ে পড়ল। হাতে ঝক্‌ঝকে দুটি থালা নিয়ে দুটি যুবতী মেয়ে পূজামণ্ডপের দিকে এগিয়ে আসছে। থালা-ভর্তি আতপ চাল, সুপুরির নতুন শীষ।

—পুবদিকে মুখ করে নমস্কার করো।

রামনের নির্দেশ মতো ওরা নমস্কার করলো।

—পূজারীর কাছ থেকে জল নিয়ে হাত-পা ধোও। পূজামণ্ডপ তিনবার প্রদক্ষিণ করে সাপের মাথা দেখে পশ্চিমে হাঁটু গেড়ে বসো।

প্রদক্ষিণ সেরে মেয়ে দুটি সাপের লেজের দিকটায় গিয়ে বসল।

—চাল আর ফুল সাপের মাথায় ফেলে নাগ-দেবতার ধ্যান করে নমস্কার করো। সুপুরির শীষগুলো হাতে ধরে রাখো।

থালা থেকে সুপুরির শীষগুলো হাতে ধরে মেয়েদুটি জড়াজড়ি করা সাপ দুটোর ফণার দিকে চেয়ে বসলো।

আপ্পুন্নী চোখ বড় বড় করে মেয়েদুটিকে দেখছিল। বাঁ দিকে লম্বাটে মতো মুখ, কালো রোগা একটা মেয়ে আর অন্য মেয়েটা ফর্সা ছিপছিপে সুন্দরী। কোমরের ওপর থেকে ধবধবে রঙের মেয়েটির গায়ে কিছু নেই। প্রথমে ওর মনে হলো— এ মা! এই মেয়েগুলোর কি একটুও লজ্জা নেই! এরকম খালি গায়ে এই আসরে এসে বসেছে। ওদের নগ্ন বুকের ওপর প্রদীপের শিখাগুলো নাচানাচি করছে। সুন্দরী মেয়েটির টানাটানা চোখদুটি যেন আধখোলা—ভালো করে দেখলে তবে বোঝা যায় যে ঘুমোচ্ছে না। আপ্পুন্নীর ঐ সুন্দরী মেয়েটাকে দেখতে বড় ভালো লাগছিল। ও মালুকে জিজ্ঞেস করলো।
—ঐ সুন্দরী মেয়েটা কে?

—ও আম্মিনী পিসী, ঠাকুরদার সবচেয়ে আদরের ছোট মেয়ে। আর অন্য মেয়েটা তাঙ্কম্মা দিদি।

—অন্য মেয়েটা যে কেউ হোক্‌গে।

গানের গতি আর ঢাকের শব্দ আস্তে আস্তে বাড়তে লাগলো। সাপের মন্দিরে সাপগুলোর এখন বোধহয় ঘুম ভেঙে গেছে। তারা সব ফণা তুলে হেলছে দুলছে। পূজামণ্ডপে সাপের ছবিদুটির ওপর দুটি চোখ রেখে স্থির হয়ে রয়েছে যে মেয়েটি তার সৌন্দর্য ঐ প্রদীপের শিখার মতো। সেই মেয়েটির দিকে আপ্পুন্নী বারবার তাকিয়ে দেখছিল। মেয়েটার গলার হারের দামী পাথরগুলো ঝিকমিক করছে··নগ্ন বুকের ওপর প্রদীপের শিখাগুলো নাচানাচি করছে, আস্তে আস্তে আপ্পুন্নীর চোখের সামনে থেকে উঠোন, প্যাণ্ডেল লোকজন সমস্ত মুছে যেতে লাগলো। এখন এক ঘন জঙ্গলের মধ্যে আকাশছোঁয়া এক বিরাট গাছের উঁচু শাখায় বসে আছে এক রাজপুত্র। মাথায় তার জরির মুকুট, ঝলমল করেছে তার রেশমী পোষাক। গাছের নীচে ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে। রাজকুমার নিজের রাজ্য দেখবার জন্য মন্ত্রীকুমারের সঙ্গে বেরিয়েছিল। পথে গভীর জঙ্গলে দুজনে পথ হারিয়ে ফেলেছে, মন্ত্রীকুমারও তার সঙ্গে নেই। এই বিপদসঙ্কুল রাত্রির যেন এখানেই শেষ হয়···আর তখনই ও

দেখলো সমস্ত জঙ্গলকে কাঁপিয়ে হেলতে তুলতে একটা সাপ আসছে, আর সেই সাপের মাথায় সওয়ারী একটা মেয়ে। তার গলার বৈদূর্যমণির লকেটটা ঝক্‌ঝক্ করছে। খুব মিহি জরীর কাপড় তার কোমর থেকে জড়ানো। পিছনে তার কালো চুলগুলো ছোট ছোট পার্বত্য ঝর্ণার মতো ছড়িয়ে পড়েছে।

হঠাৎ ঢাকের শব্দ থেমে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে আপ্পুন্নীর চমক্ ভাঙলো। পূজামণ্ডপে বসে থাকা মেয়েতুটির শরীর আস্তে আস্তে তুলছে, তাদের হাতে সুপুরির শীষগুলো কাঁপছে। হঠাৎ ঢাকঢোল আবার একসঙ্গে বেজে উঠল। গানের সুরও বদলে গেল।

—নাচ, নাচ। কৃষ্ণনাগ নাচ!

খুব দ্রুততালে ঢাকঢোল বাজনার সঙ্গে সঙ্গে মেয়ে তুটির নাচের বেগও দ্রুত থেকে দ্রুততর হতে লাগলো। পূজামণ্ডপে আঁকা কালো সাপ তুটোর মতো ফর্সা মেয়েটার চুলগুলো এঁকেবেঁকে কাঁধ ছাপিয়ে মাটিতে লুটোচ্ছে। কলাগাছের মতো হেলছে তুলছে ঐ পাতলা ফর্সা শরীরটা। গান চলতে লাগল—

নাচো, নাচো কৃষ্ণনাগ। নাচ। নাচ। এস এস মন্দির থেকে বেরিয়ে এস। নাচো, নাচো।

আর সঙ্গে সঙ্গে ঢাকের কান ফেটে যাওয়া আওয়াজ। আপ্পুন্নীর সারা শরীরে রোমাঞ্চ জাগতে লাগলো। ওর মনে হতে লাগলো ও বোধ হয় এবার নাচতে আরম্ভ করবে। হাতে সুপারির শীষগুলো ধরে সাপের মতোই হেলতে তুলতে মেয়ে তুটো বসে বসে এগোতে লাগলো। ওদের এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে আঁকা সাপগুলোর ছবিও মুছে যেতে লাগলো—আপ্পুন্নীর মনে হলো এই মেয়েগুলোকে আসতে দেখে সাপগুলো যেন ওদের জায়গা ছেড়ে চলে গেল। আর ঐ সাপ তুটোর জায়গায় একটা সর্পকন্যা যেন পূজামণ্ডপে হেলছে, তুলছে—এই সর্পকন্যার দেহটা সাপের আর মুখটা একটা সুন্দরী মেয়ের। মেয়েমানুষের মুখওলা একটা সাপ যেন তার ফণা ছড়িয়ে নাচছে।

মালু যেন কি বলল। আপ্পুন্নী শুনতে পেল না। আবার ওর চোখের সামনে থেকে পূজামণ্ডপ, প্যাণ্ডেল, লোকজন সব মুছে যেতে লাগলো। চোখের সামনে ভেসে উঠল সাপের ফণার ওপর সওয়ারী হয়ে বসে থাকা একটা মেয়ের ছবি। চোখ না খুলেই ও সব দেখতে পাচ্ছে। ও আর এখন আপ্পুন্নী নয়, ও রাজকুমার। ওর রাজ্য দেখতে গিয়ে পথ হারিয়ে যাওয়া রাজকুমার।...দেহে ঠাণ্ডা বাতাসের ছোঁয়া লাগতে ও চোখ খুলল। জঙ্গল, সাপ, রাজকুমারী সব অদৃশ্য হয়ে গেছে। গাছের ওপর নয়, বারান্দার একধারে ও শুয়ে আছে। দূরে আর্দ্র ধূসর আকাশ। একটু দূরে কলাগাছের ঝাড়গুলোর ওপর অস্পষ্ট কুয়াশা ঝাঁক বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। নীচে প্যাণ্ডেলে কারা সব যেন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে শুয়ে আছে।

ও যে কোথায় তা ভাবতে কিছুক্ষণ লাগলো। কি মিষ্টি একটা হাওয়া দিচ্ছে। চোখ যেন ঘুমে জড়িয়ে আসছে। ভেতরে কে যেন আস্তে আস্তে ভাগবত থেকে কৃষ্ণজন্মকথা পড়ছে। আবার ওর চোখদুটো বন্ধ হয়ে এল। দেহেতে কার ঠাণ্ডা হাতের স্পর্শ লাগতে ও চোখ খুললো। চমকে উঠে দেখতে পেল যে ওর পাশে দাঁড়িয়ে আছে এক বৃদ্ধা—তার সমস্ত চুলগুলো সাদা। সারা গায়ে বার্ধক্যের ছাপ। বৃদ্ধার গায়ে একটা লাল পাড়ের চাদর। বৃদ্ধার সেই জরাগ্রস্ত চোখদুটোর দিকে তাকিয়ে মনে হ'লো চোখদুটো যেন হাসছে। ওর সব ভয় দূর হয়ে গেল। ও কিছু বলার আগেই বৃদ্ধা বলল—ভয় নেই খোকা, আমি তোর দিদিমা।

দিদিমা! মার মা।

—আয়, বাড়ীর মধ্যে উঠে আয়।

আপ্পুন্নী উঠে বৃদ্ধার পেছন পেছন চলল। নানারকম আলপনা আঁকা সামনের ওঠানের দরজা পেরিয়ে দক্ষিণ দিকে মেয়েমহলের দিকে চলল। দক্ষিণ দিকের ঘরগুলোতে ভর্তি মেয়েরা সব ঘুমোচ্ছে। ঘুমন্ত মেয়েদের দিকে ও একবার চেয়ে দেখল। রাতের সেই সর্পকন্যা কি আছে এদের মধ্যে? দক্ষিণ দিকের একদিকে ছোট্ট

উঠোন। উঠোনের পশ্চিম ভাগে তখনও একটা প্রদীপ জ্বলছিল। উঠোনের চারপাশের বারান্দার বড় বড় থামগুলো দেখতে বেশ লাগছিল। ওপাশে বাড়ীর উত্তর দিকটা। সেদিককার জানলা-গুলো এখনও খোলেনি। ওখানে এখনও অন্ধকার। মেঝেতে কারা যেন সব শুয়ে আছে। বারান্দা পার হবার পর একটা খোলামেলা ঘরে এসে ওরা পৌঁছলো। সেখানে আগের দিনের মালু কি যেন একটা করছে দেখতে পেল। পিঁড়ি দিয়ে ওকে কাছে বসিয়ে দিদিমা বলল—আমি জানতাম না যে তুই এখানে এসেছিস। তোদের পাড়ার বুড়ী আমাকে কিছু বলেনি। এখন মালু বললে পর জানতে পারলাম। তারপর ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বলল—সবই আমার ভাগ্য।

আপ্পুন্নী চুপ করে রইল।

—খোকা, পড়াশুনো করছিস তো ?

—হ্যাঁ।

—পড়াশুনো করে জীবনে বড় হতে হবে। ওর তুই ছাড়া আর কেউ নেই রে।

দরজার কাছে একজন স্ত্রীলোক এসে দেখে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েকজন স্ত্রীলোকের মুখ দরজায় ভিড় করে দাঁড়ালো। সকলের দৃষ্টি ওর ওপর, তারা নিজেদের মধ্যে কি যেন বলাবলি করছিল। আঁটোসাটো একটা ব্লাউজ পরা, অল্প অল্প চুল পাকা এক মহিলা দিদিমার কাছে এসে গলাখাঁকারি দিল। তারপর আস্তে কিন্তু বেশ রূঢ়স্বরে বলল—তুমি কিন্তু একটা বিপদ ডেকে আনছ, মা।

—কি বিপদ ?

—মামা জানতে পারলে দেখ কি হয়।

দিদিমার রাগ চড়ে গেল—কেন ? তোর মামা কি আমাকে মেরে ফেলবে নাকি ?

—তোমার ধরণ-ধারণ আম্মার মোটেই ভালো ঠেকছে না। তুমি কি

আমাকে আর আমার ছেলেমেয়েদের একটু শান্তিতে থাকতে দেবে না?

—আমি ওর মাকেও পেটে ধরেছিলাম।

—ওসব কথা তুমি মামার কাছে বোলো, আমার শোনার দরকার নেই—বলে দুপদাপ করে পা ফেলে মহিলাটি চলে গেল।

দিদিমা কিছু না বলে গায়ের চাদরটা দিয়ে চোখ মুছল। এবার দরজায় শুধু স্ত্রীলোকেরা নয় বেশ কিছু ছোট ছেলেমেয়েও এসে জড়ো হল। ওরা সব অদ্ভুত দৃষ্টিতে আপ্পুন্নীর দিকে তাকিয়ে দেখছে।

বুড়ীদিদির সঙ্গে আপ্পুন্নীর ঐখানেই দেখা হলো। রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে বুড়ী বলল—আপ্পু, বাড়ী যাবি না? তোকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আমার ছুটি।

দিদিমা এর উত্তরে বলল—আপ্পু এখন যাবে না।

মেয়েরা সব পরস্পরের দিকে তাকিয়ে দেখল। তারপর নিজেদের মধ্যে কিসব গুজগুজ ফুসফুস করতে লাগল।

দিদিমা মালুকে ডেকে বলল—মালু, তোর আপ্পুন্নীদাদাকে একটু দাঁতের মাজন আর জল দে।

বুড়ীদিদি তখনও দ্বিধা ভরে দাঁড়িয়েছিল দেখে দিদিমা বলল—বুড়ী তুমি যাও। আমি ওকে চাকর দিয়ে পাঠিয়ে দেব।

বুড়ী চলে গেল। আপ্পুন্নী মালুর সঙ্গে উঠোনে এসে মুখ ধুল। মুখ ধুয়ে ও দিদিমার কাছে ফিরে এসে দেখে দিদিমা পা ছড়িয়ে বসে কি যেন ভাবছে। আপ্পুন্নী চুপচাপ গিয়ে দিদিমার পাশে বসল।

—দিদিমা ফেনা ভাত দেওয়া হয়েছে, কে যেন বলল। তাকে দিদিমা আপ্পুন্নীর জন্যও ফেনা ভাত বাড়তে বলল। রান্নাঘর থেকেও নানারকম গুঞ্জনধ্বনি শোনা যাচ্ছিল।

ফেনা ভাত আর পাঁপড় ভাজা, কলাপাতায় নারকোলের চাটনি। ফেনা ভাতের গন্ধে আপ্পুন্নীর ইচ্ছে হল যেন সবটা এক চুমুকে এক্ষুণি খেয়ে ফেলে। কাঁঠাল পাতার চামচ করে চার-পাঁচ চামচ

খেয়েছে এমন সময় মেয়েরা একটু ভয়চকিত ভাবে রান্নাঘরে ঢুকল। বাচ্চা ছেলেমেয়েরা সব সরে দাঁড়াল। বাঘের মতো এক আওয়াজ।

—দিদি !

দিদিমা কাঁঠাল পাতার চামচ থালায় রেখে ভগবানের নাম করতে লাগল। দরজার চৌকাঠ ছুঁয়ে একজন লোক দাঁড়িয়ে। দাদামশায়।

—দিদি, এ ছেলেটা কে ?

দিদিমা চুপ করে রইল।

—তোমাকে জিজ্ঞেস করছি— ছেলেটা কে ?

—এ…এ…পারুকুট্টির ছেলে।

—কে তোমার এই পারুকুট্টি— কে ?

দিদিমা যেন এখনই চীৎকার করে উঠবে বলে মনে হল। কিন্তু খুব শান্তস্বরে বলল—

আমি ঐ নামের একটা মেয়েকে পেটে ধরেছিলাম।

—ফুঃ…আমার এই বাড়ি কোনো বাউণ্ডুলের জায়গা নয়। কে, কে এই ছেলেটাকে খেতে দিয়েছে ?

দিদিমা উঠে দাঁড়াল। আপ্পুন্নীও কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল। এক্ষুনি বুঝি ওকে মেরে ফেলবে…এই বুঝি ওর মৃত্যু হল। ওর ঘাড়ে এক ধাক্কা দিয়ে উঠোনের দরজা দেখিয়ে দাদামশাই চীৎকার করে উঠলেন।—দূর হয়ে যা এখান থেকে হারামজাদা। আর যদি কোনোদিন এ বাড়ির আশেপাশেও তোকে দেখি তো তোর ঠ্যাং খোঁড়া করে ছাড়ব। দূর হ।

এক ধাক্কায় আপ্পুন্নী বাইরে পড়ে গেল। ও তক্ষুনি উঠে দৌড়োতে আরম্ভ করল। দৌড়োতে গিয়ে উঠোনের বালির মধ্যে পা আটকে পড়ে যাওয়ার সময় শুনতে পেল দিদিমা বলছে,

—শাস্তি পেতে হবে, এর জন্যে তোকে শাস্তি পেতে হবে।

আবার কেউ যদি ওর পেছনে ওকে ধরতে আসে এই ভয়ে ও প্রাণপণে ছুটতে লাগল।

বাড়ির পথ ওর ভালো করে জানা নেই। গলি পার হয়ে উঁচু টিলাটার কাছে পৌঁছোবার পরও ওর ফোঁপানি থামে নি। সার্টের হাতায় চোখ মুছে ও টিলাটার ওপরে উঠল। রোদের তেজ বেশি নেই। বালি আর ছোট্ট ছোট্ট নুড়িগুলোর ওপর দিয়ে ও হাঁটতে লাগল। একটা হলদে বনফুলের ঝোপের কাছে একটা পরিষ্কার পাথর দেখে তার ওপর বসল। পাথরটার ওপর বসে ওর ফোঁপানি যেন আরও বেড়ে গেল। ওকে গলা ধাক্কা দিয়ে বার করে দিয়েছে। ঘেয়ো কুকুরের মতো ওকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছে। এবার আর চোখের জল বাঁধ মানল না। ও হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল। মা প্রথম থেকেই বারণ করেছিল তবুও ও এসেছিল। মা যখন জানতে পারবে—

এরকমটা যে হবে ও তা ভাবতেই পারে নি। ঘেয়ো অস্পৃশ্য কুকুরের মতো ওকে তাড়িয়ে দেবে তা ও ভাবতেই পারে নি। ও-বাড়ির মেয়েরা সব দেখল— বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলোও। গলা ধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দিল। কী লজ্জা, কী অপমান। ওর বাবার আভিজাত্য না থাকলেও, পয়সা না থাকলেও সে ছিল একটা লোকের মতো লোক। বাবার মুখোমুখি হতে কেউ সাহস করত না। সেই বাপের বেটা ও, আর তাকে এমনিভাবে কুকুরের মতো তাড়িয়ে দিল। উঃ অসহ্য! কিন্তু না পালিয়ে গিয়েই বা ও কী করত? দরজা প্রায় আড়াল করে দাঁড়িয়ে থাকা সেই লোকটার চেহারার কথা ওর মনে পড়ল।

কোথাও গিয়ে লুকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করছে। এ মুখ যেন আর কাউকে দেখাতে না হয়। নয়তো এ গ্রাম ছেড়ে ও চলে যাবে। সব-কিছুর ওপর ওর ঘৃণা হল। ঘেয়ো কুকুরের মতো—উঃ। মরে গেলে বোধহয় এর চেয়ে ভালো ছিল। কেউ গলা ধাক্কা দিত না, কেউ বকত না। মরলে ও সোজা আকাশের ওপারে ওই স্বর্গে চলে যেত। স্বর্গে নালুকেট্টুও নেই, দাদামশায়ও নেই।

হঠাৎ সেই সময় ওর পেছনে একটা গলার আওয়াজ শুনতে পেল।

চমকে পেছন ফিরে দেখেই ওর সমস্ত শরীর যেন হিম হয়ে গেল। ওর পেছনে লালচে গোল গোল চোখ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেয়দু আলি কুট্টি। বাবাকে মাংসের সঙ্গে বিষ দিয়ে খুন করেছে। ও কি আবার বিষের সন্ধান করছে? ওকেও কি খুন করবে নাকি? ভয়মিশ্রিত ঘৃণা নিয়ে ও লোকটার মোটামোটা আঙুলগুলোর দিকে তাকাল।

—খোকা, কাঁদছ কেন?

এ স্বর তো কোনো খুনীর স্বর নয়! বড়ো শান্ত গলা।

—এখানে বসে কেন?

আপ্পুন্নী চুপ করে রইল।

—কেঁদো না খোকা।

আশ্চর্য দরদভরা গলার স্বর শুনে আপ্পুন্নী জলভরা দুটি চোখ দিয়ে ওর দিকে তাকাল। ও চোখ দেখে তো মনে ভয় জাগছে না। লালচে ওই চোখদুটির মধ্যে দিদিমার চোখের মতো কেমন যেন একটা দুঃখের ছায়া ও দেখতে পেল।

—বাড়ি যাবে না?

ও মাথা নাড়ল।

—তা হলে এসো আমার সঙ্গে। আমিও ওই দিকে যাচ্ছি।

সেয়দু আলি কুট্টি সামনে ও পেছনে। টিলাটার থেকে নামার সময় আপ্পুন্নীর ফোঁপানি থামল।

—এত সকালে টিলাটার ওপরে বসে কী করছিলে?

—কিছু না।

—এখন কোত্থেকে আসছ?

—ঐখান থেকে, ভডাকেপাট থেকে।

—কাঁদছিলে কেন?

উত্তর নেই।

—রাস্তা চিনতে পারছিলে না বলে?

—উঁ…উঁ…

—রাস্তায় পড়েছিলে ?

—উঁ···উঁ···

—তা হলে কাঁদছিলে কেন ?

—ও-বাড়ি থেকে···ও-বাড়ি থেকে···দাদু···বাকীটা আর বলতে পারল না।

সেয়দু আলি আর বিশেষ কিছু জিজ্ঞাসা করল না। খানিকক্ষণ দুজনে নিঃশব্দে হাঁটতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে সেয়দু আলি বলল,

—ও-বাড়িতে তোমারও অধিকার আছে।

ওর কাঁধে হাত দিয়ে সেয়দু আলি কুট্টি হাঁটছিল। টিলাটার এক পাশে মাটি কেটে নেওয়ার বড়ো গণ্ডিটার ধারে এলে পর আপ্পুন্নীর মনে কী যেন এক অস্বস্তিকর স্মৃতি জাগল।

—অত ধার দিয়ে যেয়ো না খোকা, পড়ে যাবে। ওরা নীচে নামল, আর-কিছুটা হাঁটতেই তিনটে চারটে দোকান পড়ল।

—খোকা চা খাবে ?

—না।

—খাও খাও, নায়ারের দোকানের চা।

ও আর না বলল না। একটা দোকানে ঢুকে চা আর ছোলা ভাজা খেয়ে ওরা পয়সা দিয়ে বেরিয়ে এল। আপ্পুন্নীর বাড়ির কাছাকাছি এলে সেয়দু আলি কুট্টি বলল— এবার তুমি বাড়ি যাও।

আপ্পুন্নী এক ছুটে বাড়ির ভেতর ঢুকে গেল।

*   *   *

এখন দুদিন আর বামুনদের বাড়ি যাওয়ার দরকার নেই। বামুনদের সব কোনো আত্মীয়ের বিয়েতে গেছে। সেদিন তাই সকালে উঠতে পারুকুট্টির একটু দেরিই হল। প্রথমেই মনে হল শঙ্করণ নায়ারকে দিয়ে একটা কাজ করাতে হবে। কোথায় ওকে পাওয়া যাবে ? গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকলে দেখা হতে পারে নইলে আপ্পুন্নীকে দিয়ে ডাকাতে হবে। আপ্পুন্নী আবার ওর বাড়ি চেনে না। বামুনদের বাড়ি যাওয়ার সময় বা সন্ধ্যায় চান

করতে যাওয়ার সময় শঙ্করণ নায়ারকে ওদের বাড়ির সামনে দিয়ে যেতে হয়। আজ আবার ও-বাড়ি কাজ নেই, শঙ্করণ নায়ার হয়তো বেরোবে না।

আগের দিন যখন দেখা হয়েছিল তখন বললেই হত। কিন্তু তখন ভেবেছিল কাল বলবে। কাল যে বামুনদের বাড়িতে কাজ নেই সে কথা ওর মনে ছিল না। তা ছাড়াও শঙ্করণ নায়ারের মুখের দিকে সোজাসুজি ও তাকাতে পারে না। ভডাকেপাটের নালুকেট্টুতে থাকার সময় থেকে ওকে দেখে আসছে। প্রথম প্রথম ও যখন বামুনদের বাড়িতে কাজ করতে গেল, তখনকার কথা ভাবতেও ওর লজ্জা হয়। ঢেঁকিতে ধান ভানার সময়, বারান্দায় অন্য ঝিয়েদের সঙ্গে বামুনদের উচ্ছিষ্ট ভাত খাবার সময়, বাড়ির বউয়ের ওকে হুকুম করবার সময়— বাইরের চাকর-বাকর দেখলে কী খারাপই যে লাগত, মনে হত শরীরের সমস্ত আবরণ খুলে গেছে। আর ও সকলের সামনে নগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

একদিন দুপুরের খাওয়ার পর বারান্দায় যখন বসেছিল তখন বাড়ির বউ ওকে উঠোনের ধানগুলো সব তুলে রাখতে বলল। উঠোনে তখন ইজারাদার দু-গাড়ি ধান ঢেলে রসিদ নেবার জন্য অপেক্ষা করছে।

—ও মেয়ে, ধান মেপে নিয়ে রসিদ দিয়ো।

নামমাত্র তোয়ালে কোমরে জড়িয়ে সদর দরজায় দাঁড়িয়ে বাড়ির আর-এক বামুন চীৎকার করে বলল। দশসেরী ওজনের একটা জায়গায় ধানগুলো মেপে ঢালার সময় ওর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। ধান রাখার জায়গাটার দুটো ধার ধরে কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটাকে ও তখনই দেখল। ওদের ভডাকেপাটের বাড়িতে গাছপালায় জল দিত, গোরুবাছুরকে খাওয়া দিত যে শঙ্করণ নায়ার সে ওর সামনে দাঁড়িয়ে আছে। পারুকুট্টির গায়ের চামড়া যেন খুলে খুলে পড়ছে বলে মনে হল। মনের বিহ্বল ভাব চেপে ও ধান ঢালতে লাগল।

পরে জানতে পেরেছিল যে মাত্র তিনদিন হল শঙ্করণ নায়ার বামুনদের বাড়ি কাজ করতে এসেছে। সেদিন বাড়ি ফেরার পথে শঙ্করণ নায়ারের সঙ্গে দেখা হল। ওর চোখ দুটো তখন জলে ভরে উঠেছিল। কর্কশ গলায় শঙ্করণ নায়ার বলেছিল, —সবই ভাগ্য, পারুকুট্টিআম্মা।

বাপের বাড়ি ছেড়ে আসার পরও শঙ্করণ নায়ারের সঙ্গে অনেকবার দেখা হয়েছে। আপ্পুন্নীর বাবা বেঁচে থাকার সময় শঙ্করণ নায়ার মাঝে মাঝে ওদের বাড়িতে আসত, আপ্পুন্নীর বাবার সঙ্গে মাছ ধরতে যেত। শঙ্করণ নায়ার খুব ভালো মাছ ধরতে পারত। বর্ষা শুরু হবার প্রথম দিকটায় মাছ যখন সব একসঙ্গে হয় সেই সময় শঙ্করণ নায়ার মাথায় তাল পাতার টোকা আর কাঁধে একটা বড়ো জাল নিয়ে আপ্পুন্নীর বাবাকে ডাকতে আসত। আপ্পুন্নীর বাবার মাছ ধরার শখ ছিল ভীষণ। ছোটো মাছ ধরার জাল কোন্তুন্নীর ছিল, বড়ো মাছ ধরতে হলে শঙ্করণ নায়ারের বড়ো জালটা চাই। নালু-কেট্টুতে থাকার সময় শঙ্করণ নায়ার ওকে দেখেছে। ওর নিজের বাড়িতেও ওকে দেখেছে আর আজ ওকে দেখছে বামুনদের বাড়ি ঝিয়ের কাজ করতে।

সবই ভাগ্য!

আপ্পুন্নী স্কুলে গেছে সার্টিফিকেট আনতে। কুয়োর কাছে আপ্পুন্নীর পোঁতা কুমড়ো গাছটায় পারুকুট্টি খানিকটা জল ঢালল। পেঁপে গাছটা নড়নড় করছে। তাতে একটা শক্ত খুঁটি বেঁধে দিল। কলা গাছের কাছে এসে চুলগুলো খুলে কিছুক্ষণ এমনি চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। কলা গাছের তলায় আপ্পুন্নীর ভাঙা আয়নাটার কতকগুলো টুকরো পড়ে রয়েছে। টুকরোগুলো একসঙ্গে জড়ো করে ওপাশে ফেলে দেবে ভাবল, পায়ে ফুটতে পারে। একটা বড়ো কাঁচের টুকরো নিয়ে মুখটা একটু দেখল। কপালের চুলগুলোকে সরিয়ে দিল। মুখটা কেমন যেন শুকনো শুকনো কালো কালো দেখাচ্ছে। ওর দিদিমা ওর সম্বন্ধে বলত যে ওর গায়ের রঙ নাকি

ছিল প্রদীপের শিখার মতো। তখন ওর বয়স ছিল পনেরো। তারপর আরও পনেরো বছর কেটে গেছে। সাবান মেখে বা তেল মেখে চান করা খুব কমদিনই ঘটে। মাথার চুলগুলো সব শুকিয়ে খড়্‌খড়্‌ করছে। রোজ তেল না দিলে ওর চুল বেশ পাটপাট হয়ে থাকে না। ছোটোবেলায় ওর দিদিরা ওর চুলের ঈর্ষা করত। এখনও চুল ছেড়ে দিলে সারা পিঠ ছড়িয়ে থাকে।

কাঁচের টুকরোগুলো ফেলতে গিয়ে দেখল দূরে শঙ্করণ নায়ারের মতো কে যেন আসছে। হ্যাঁ শঙ্করণ নায়ারই তো! ভাগ্য ভালো যে শঙ্করণ নায়ার ঐ পথে আসছে। ও বেড়ার বাইরে এসে ডাকল,

—শঙ্করণ নায়ার!

শঙ্করণ নায়ার ওকে লতাপাতার আড়ালে দেখতে পেল,

—আমাকে ডাকছেন নাকি?

—হ্যাঁ, যদি সময় থাকে তো একবার ভিতরে আসুন, একটা কথা বলার ছিল।

শঙ্করণ নায়ার ভেতরে ঢুকল। সামনে বারান্দায় একটা পুরানো মাদুর বিছিয়ে পারুকুট্টি দরজার সামনে দাঁড়াল। শঙ্করণ নায়ার বোকার মতো চারপাশ দেখতে লাগল।

—কোন্তুন্নীর চলে যাওয়ার পর এই প্রথম আমি এ-বাড়িতে ঢুকলাম।

পারুকুট্টির সারা মুখে এক বিষাদের ছায়া ছড়িয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পরে গলা পরিষ্কার করে বলল,

—তারপর কেউই আর এ-বাড়িতে আসে নি।

প্রতিটি মুহূর্ত যেন ভারী হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

—গাছপালা যে সব শুকিয়ে গেছে।

ঠিকমতো বেড়া নেই। গোরুবাছুর এসে কলাগাছগুলোকে মুড়িয়ে খেয়েছে। আপ্পুন্নীর বাবা বেঁচে থাকতে কলাগাছ পোঁতা হয়েছিল। তার মৃত্যুর পর জমিতে আর কিছুই পোঁতা হয় নি। যত্নের অভাবে

অর্ধেক কলাগাছ নষ্ট হয়ে গেছে। বাকী অর্ধেক পাড়া-প্রতিবাসীর গোরুতে খেয়ে গেছে।

—বেড়া দেওয়া দরকার। দু কাঁদি কলা হলে লঙ্কা নুন কেনার পয়সাটাও তো জোগাড় হয়।

পারুকুট্টি এর উত্তরে কিছু বলল না।

—আপ্পুন্নী কোথায়?

—স্কুলে গেছে।

—স্কুল খুলেছে?

—হ্যাঁ, আজ খুলেছে। ও ক্লাস এইটের পরীক্ষায় পাস করেছে। তার সার্টিফিকেট আনতে গেছে। ওর কথা বলার জন্যই আপনাকে ডেকেছিলাম।

—কী কথা?

—ওর খুব ইচ্ছে যে তৃতালার স্কুলে ভর্তি হয়।

—এ তো খুব ভালো কথা। ভালো করে পড়াশুনো করে নিজেরটা নিজে উপায় করুক।

পারুকুট্টি, নখ দিয়ে দরজা খুঁটতে খুঁটতে, বিষাদের সুরে বলল,

—আমার ওকে অত ভালো স্কুলে পাঠানোর সংগতি নেই কিন্তু ওর ভীষণ ইচ্ছে।

—হুঁ পড়ুক। ভগবান সব-কিছুরই একটা পথ বার করে দেবেন পারুকুট্টি আম্মা।

—মাইনে দিতে হবে মাসে চার টাকা তেরো আনা। ভর্তি হবার ফী আলাদা। তা ছাড়া অন্য খরচাখরচিও আছে। আমার কাছে মাত্র গোটা আষ্টেক টাকা আছে।

শঙ্করণ নায়ারের সন্দেহ হল যে ওর কাছ থেকে টাকা ধার করবে বলে পারুকুট্টি ওকে ডেকেছে। ওর হাতে এখন কিছুই নেই। যদি ওর কাছে ধার চায় তা হলে ও কী করবে? ওঃ আতুন্নীর কাছ থেকে টাকাটা পেলেও কাজ দিত।

—কাল ওকে স্কুলে ভর্তি করাতে যদি নিয়ে যেতে পারেন তো

বড়ো উপকার হয়। শুধু ওর সঙ্গে গেলেই হবে। আমাকে সাহায্য করার আর কেউই নেই···

পারুকুট্টি ওর চোখ ছুটো মুছল।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ আমি ওর সঙ্গে যাব বৈকি। আপনি কিছু ভাববেন না। এইটুকু সামান্য কাজ আপনার জন্য যদি না করি তা হলে আর আলাপ-পরিচয় কিসের— তোয়ালেতে মুখ মুছতে মুছতে শঙ্করণ নায়ার বলল।

মুখ নীচু করে বিষণ্ণ মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে মেয়েটি। মুখের ওপর তার শুকনো চুলগুলো উড়ে উড়ে পড়ছে। ওকে অমনভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে শঙ্করণ নায়ারের মন ওর জন্য সহানুভূতিতে ভরে গেল। ছুজনে বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। পারুকুট্টি পুরোনো দিনের কথা ভাবছিল। শঙ্করণ নায়ারও এটা সেটা ভাবছিল। হঠাৎ ওর মনে পড়ল, এমনভাবে পারুকুট্টি বলল,

—আপ্পুন্নী ও-বাড়িতে গিয়েছিল।

—হ্যাঁ জানি।

—না গেলেই ভালো হত।

—গিয়ে কিছু দোষ করে নি। ও ছেলেমানুষ, দূর হয়ে যেতে বলেছে, চলে এসেছে।

শঙ্করণ নায়ারের ভেতরটা রাগে জ্বলছিল।

—ওখানে আর-পাঁচজনের মতো ওরও অধিকার আছে। রাগে শঙ্করণ নায়ার উঠে দাঁড়াল।

—ভগবান আছেন, এর ফল পেতেই হবে।

তারপর এক মিনিট চুপ করে থেকে বলল,

—আমি কাল সকালেই আসব। আপ্পুন্নী যেন তৈরি হয়ে থাকে।

—ঠিক আছে।

শঙ্করণ নায়ার উঠোনে নামল। তারপর ভুরু চুলকোতে চুলকোতে বলল,

—আপনার যখন যা দরকার হবে আমাকে বলবেন। বলেই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ল।

নৌকার মাঝি আতুন্নী তুটাকা ধার নিয়ে এখনও ফেরত দেয় নি। চাইতে চাইতে হদ্দ হয়ে গেল। কাল যখন ওকে ধরেছিল তখন আজ দেবে বলে দিব্যি গেলেছিল। ওকে ধরতেই শঙ্করণ নায়ার বেরিয়েছিল। পারুকুট্টির বাড়ি থেকে বেরিয়ে শঙ্করণ নায়ার আতুন্নীর কথা ভুলে গেল। সহায়-সম্বলহীনা ঐ স্ত্রীলোকটির কথা ওর বারবার মনে পড়ছিল। কত ভালোভাবে মানুষ হয়েছে আর আজ তার কী অবস্থা! আজ যদি পারুকুট্টির কিছু হয় তা হলে ছেলেটার কি গতি হবে? তুদিন যদি অসুখ করে পড়ে থাকে তো উনুনে আগুন জ্বলবে না। বছরে তু-চার হাজার মন চাল হত যে-বাড়িতে সে বাড়ির মেয়ের আজ এই অবস্থা। রাতে একলা একলা তুটি প্রাণীকে ওই বাড়িতে থাকতে হয়। ঐরকম একটা ভাঙাচোরা বাড়িতে যুবতী একটা স্ত্রীলোক একেবারে একা। কিন্তু মেয়েটার আভিজাত্য আছে। অবস্থা খারাপ হলেও বংশাভিমান খোয়ায় নি। বামুনদের বাড়িতে অন্য যে-সব মেয়েরা কাজ করে তাদের সকলকে খুব ভালো করেই চেনে শঙ্করণ। একজন আছে মূধেবী— তার রকম-সকম দেখলে গা জ্বলে যায়। চল্লিশ-বেয়াল্লিশ বছর হল কিন্তু ভাব দেখলে মনে হয় যেন সতেরো বছরের খুকি। কে যেন ওকে বলেছিল যে পারুকুট্টি বামুনদের বাড়ি কাজ নিয়েছে। সে আজ পাঁচ-ছবছর আগের কথা। শুনে শঙ্করণ নায়ারের পারুকুট্টির ওপর একটু ঘেন্নাই হয়েছিল। বংশের মুখে কালি দিয়েছে এখন আবার বামুনদের বাড়িতে ঝি-এর কাজ করে চরিত্রও খোয়াবে। কিন্তু যেদিন থেকে ও বামুনদের বাড়িতে চাষবাসের দেখাশোনা আরম্ভ করল সেদিন থেকে ওর ভুল ধারণা ভাঙলো। পারুকুট্টি সকালে এসেই বাড়ির মধ্যে ঢুকে যায়। সারাদিন নিঃশব্দে কাজ করে সন্ধেবেলায় বাড়ি ফিরে যায়। ওর অজ্ঞান্তে ওকে লক্ষ্য করেছে শঙ্করণ নায়ার। খুব আগঢাক আছে মেয়েটার। বাড়ির

পুরুষমানুষের সঙ্গে কথা বলে না। নিজের মনে কাজ সেরে বাড়ি চলে যায়।

নাঃ! মেয়েটার কপালের লেখন ভালো নয়, কপালের লেখন ভালো নয়।

—আমার কোনো কাজেই কেউ সাহায্য করার নেই। মা, বোনেরা, ভাই, মামা সব তিন-চার মাইলের মধ্যেই রয়েছে কিন্তু এই অল্প দূরত্ব যে কতবড়ো ব্যবধানের সৃষ্টি করেছে তা ভাবলে অবাক হতে হয়।

আপ্পুন্নীকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছে। বেচারা ছেলেটার কি দোষ। ওঃ সব বড়ো বংশের লোক। যাদের সামান্য মনুষ্যত্বটুকু পর্যন্ত নেই তাদের আবার বংশগৌরব! রাগে শঙ্করণ নায়ার থুথু ফেলল।

পথে উন্নীরির সঙ্গে দেখা। তখন হঠাৎ মনে হল, জিজ্ঞেস করল,

—উন্নীরি, তোর কাছে কঞ্চি আছে। এক জায়গায় বেড়া দিতে হবে।

—বেশি নেই।

—আমার চার-পাঁচ গোছা কঞ্চি চাই। কাল আমি তোর কাছে আপ্পনকে পাঠাব।

—তা তোমার বেড়া দেওয়ার কাজ শেষ হয় নি?

—আমার হয়ে গেছে, আর-একজনের জন্যে।

ভালোই হল। কঞ্চির জন্য উন্নীরিকে কোনো পয়সা দিতে হবে না। দুটো লোক রাখলে একদিনের মধ্যে কাজ শেষ হয়ে যাবে। ওদের দুটো টাকা দিয়ে দিলেই হবে। দুটো টাকার কথা মনে হতেই আতুন্নীর কথা মনে হল। আজ দেবে বলেছিল— দেখি ব্যাটার খোঁজ ক'রে।

ও ইউসুফের দোকানে খোঁজ করল। সেখান থেকে এন্থুদ্দীনের দোকানে। কিন্তু আতুন্নীর খোঁজ পাওয়া গেল না। পাজী

হারামজাদা কখনও কথা রাখে না, ব'লে ওকে মনে মনে গালাগালি দিয়ে ও নদীর ধারে ওর তরী-তরকারীর খেতটা দেখতে গেল। নদীর ধারে কিছু জমি ও নীলামে ডেকে নিয়েছে। তাতে শশা, চালকুমড়ো ইত্যাদি পুঁতেছে। দুবার ফলনও পেয়েছে। এবার ফলন বেশ ভালো হবে মনে হচ্ছে। খেতটা দেখে ও নদীতে চান করতে নামল। চান করে ফেরার পথে মাছওয়ালা মাছ নিয়ে যাচ্ছে দেখে দু-আনার মাছ কিনল, ছোটো পুঁটি। পথে দোকানের ভেতর থেকে পাড়ার বেসরকারী মামা ওকে ডাকলো। এখন দোকানে ঢুকলেও গণ্ডগোল, না ঢুকলেও গণ্ডগোল। কি জ্বালারে বাবা !

বাড়ি ফিরল যখন তখন সন্ধে হয়ে এসেছে। বাড়িতে এসে হাত-পা ধুয়ে ও উঠোনটার তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বালল। তারপর লণ্ঠন জ্বালিয়ে রান্নার জোগাড় দেখতে লাগল। রান্নাবান্না কিছু কিছু ও জানে। বেশ কয়েক বছর একেবারে একা তাই কাজকর্ম কিছু শিখেছে। কিন্তু এখনও ওর ভাতের ফেন গালতে ভয়। বেশির ভাগ দিনই ফেন শুকিয়ে ভাত রান্না করে। আজ প্রায় চোদ্দ-পনেরো বছর ও একা। মা আর দিদি বসন্ত রোগে মরেছে। উনুনের আগুনের দিকে চেয়ে চেয়ে আগেকার দিনগুলোর কথা স্মরণ করতে লাগল।

একার জীবন। দিন কাটাতে বামুনদের বাড়ির কাজই যথেষ্ট। তবু ও এত খাটাখুটি করে কেন লোকে জিজ্ঞেস করে। ঠিকই তো। তরী-তরকারী ফলিয়ে টাকা জমিয়ে ওর লাভটাই বা কি? লোকে বলে,

—তুমি তো বাপু বিয়ে করতে পারো।

ও বলে— চল্লিশ-বেয়াল্লিশ বছর বয়েস হল এখন আর মেয়েদের অধীনে থাকার ইচ্ছে নেই।

কিন্তু আজ যদি ওর কিছু হয় তা হলে ওকে দেখবার একটা লোক নেই। যখন কাজকর্ম করতে পারবে না তখন ওর কী অবস্থা হবে, তা ও চিন্তাই করতে পারে না। গ্রামের বুড়ী দিদির কথা মনে হয়।

যার তার বাড়ি গিয়ে উঠছে। ভিক্ষে চাইছে, উঃ ভাবাই যায় না। তাও তো যতক্ষণ পা-দুটোয় শক্তি আছে, তারপর? তখন হয়তো ছাইয়ের গাদায় কুকুরের মতো মরতে হবে। এ কথা মনে হলেই ও শিউরে ওঠে।

বিয়ের কথাবার্তা এক সময় হয়েছিল। তখন একটা মিষ্টি মেয়ের কল্পনায় মন ভরে উঠেছিল। তখন মামা, বোনেরা সব বেঁচে। মামা ওকে বিয়ে করার জন্যে প্রায়ই বলত কিন্তু ভগবান বাদ সাধলেন।

সবই ভাগ্য, কপালের লিখন।

গ্রামে তখন বসন্ত শুরু হয়েছে। তার প্রথম বলি হল ওর পাত্রী। আত্মীয়স্বজন ভালোবাসার লোক সকলেই প্রায় মারা গেছে। এখন একেবারে একা। সকলে কাজে যায়, সন্ধেবেলায় ফিরে আসে। একঘেয়ে দিনগুলো কেটে যাচ্ছে একটার পর একটা। আস্তে আস্তে প্রিয়জন হারানোর বেদনাও মন থেকে মুছে গেছে।

আগুনের লাল শিখার দিকে তাকিয়ে এ-সব কথা ভাবছিল শঙ্করণ নায়ার। ভাতের জল টগবগ করে ফোটার শব্দে ও যেন এ জগতে ফিরে এল। খাওয়াদাওয়ার পর বাইরের বারান্দায় মাদুর বিছিয়ে শোয়ার পর কালকের সকালের প্রথম কাজটার কথা মনে হল, আপ্পুন্নীকে ভর্তি করাতে যেতে হবে। যদি বয়সকালে বিয়ে হত তা হলে ওরও আজ আপ্পুন্নীর মতো একটা ছেলে হত। ও হয়তো ওর বাবাকে এ বয়সে এত কষ্ট করতে দিত না। আপ্পুন্নীর মতো ওর ছেলেও পড়াশুনো করে বড়ো হত।

ফেলে আসা দিনগুলোর কথা ভেবে আর দুঃখ করে লাভ কি? আপ্পুন্নীর ভালো হবে, ছেলেটার মুখে একটা শ্রী আছে। দেখেই বোঝা যায় যে ও ছেলে বড়ো হবে, ভালো হবে।

—হে মা ভগবতী আমাদের ভাল করো।

শঙ্করণ নায়ার চোখ বুজলো।

* * *

হাইস্কুলে ভর্তি হবার দিন আপ্পুন্নীর খুব উৎসাহ।

শঙ্করণ নায়ার সকাল সকালই এসেছে। তার আগেই ও প্রস্তুত হয়ে ছিল। মা মাইনের টাকাটা শঙ্করণ নায়ারের হাতে দিল। তারপর মা জলভরা চোখে ওকে বিদায় দিয়ে গলির মোড়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। হাইস্কুল বেশি দূরে নয়, তবু ও যখন রওনা দিল মার মনে যেন কিসের একটা উৎকণ্ঠা, কিসের একটা ভয়।

ভডাকেপাটের বাড়ির সামনে দিয়েই স্কুলের রাস্তা। ধানখেতের আলগুলোর একটা সোজা গিয়ে নালুকেট্টুর গেট ছুঁয়েছে। একবার ভালো করে নালুকেট্টুর দিকে তাকিয়ে দেখবে ভাবল কিন্তু দেখল না।

স্কুল বেশ বড়ো। টালি দেওয়া একতলা চারটে বড়ো বড়ো বাড়ি। সামনেই সাইনবোর্ডে জ্বলজ্বলে অক্ষরে স্কুলের নাম ঝুলছে। ঢুকলেই প্রথমে ফুলের বাগান। ওর আগের স্কুলেও ফুলবাগান ছিল কিন্তু একটা গাছেও ফুল হত না। একটা তরকারীর বাগানও করা হয়েছিল তাতে ঢ্যাঁড়স, বেগুন আর শাক হত। ছেলেদের কাজ ছিল এই বাগানে জল দেওয়া। একটা পিরিয়ডে ছেলেরা বাগানের কাজ করত। তরী-তরকারী যা হত মাস্টারেরা তা নিয়ে যেত।

স্কুলের ঘণ্টা এখনও পড়ে নি। সারা স্কুলে ছেলেয় ভর্তি হয়ে গেছে। এদের মধ্যে অনেকে আজ ভর্তি হতে এসেছে। তাদের দেখলেই বোঝা যায়। মুখে চোখে কেমন যেন একটা বিহ্বল-ভাব। তাদের সঙ্গে অভিভাবকেরাও রয়েছেন। আগের স্কুলের কয়েকটা ছেলেকেও আপ্পুন্নী দেখতে পেল, অফিস ঘরের বাইরে অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে আপ্পুন্নীও অপেক্ষা করতে লাগল। ক্লার্ককে আগেই নাম দেওয়া হয়েছিল, সে একের পর এক নাম ডাকছিল।

হেডমাস্টারের ঘরের মধ্যে ঢুকে আপ্পুন্নী হতভম্ব হয়ে গেল। লম্বা টেবিল, কাঁচের আলমারি, দেওয়ালে দেওয়ালে ছবি। টেবিলে কলিং বেল, কাঁচের কাগজদানী। টেবিলের সামনে একটা চেয়ারে একজন মোটাসোটা লোক বসে— হেডমাস্টার।

হেডমাস্টার ওর সার্টিফিকেট দেখলেন, তারপর জিজ্ঞেস করলেন,

—বাবার নাম ?

—টি. কোন্তুন্নী নায়ার।

তারপর আর-একটু যোগ করে বলল— বাবা মারা গেছেন।

—অভিভাবকের নাম ?

হেডমাস্টার শঙ্করণ নায়ারের মুখের দিকে তাকালেন। শঙ্করণ নায়ার একটু ভাবল। আপ্পুন্নীর অভিভাবক কে ? স্ত্রীলোক হলে কি যথেষ্ট ? যদি বলে যে, না, পুরুষ অভিভাবক চাই। বেশি গোলমালে না গিয়ে শঙ্করণ নায়ার বলল,

—টি. শঙ্করণ নায়ার।

ঠিকানাও দিল, আপ্পুন্নী শঙ্করণ নায়ারের মুখের দিকে তাকাল। শঙ্করণ নায়ার দেখতে না পাওয়ার ভান করে মাইনে দিয়ে রসিদ নিল। কাল থেকে ক্লাস আরম্ভ। ওরা নিশ্চিন্তমনে বাড়ি ফিরল। কিন্তু আপ্পুন্নীর মনে বারবার একটা সন্দেহ জাগছিল— শঙ্করণ নায়ার ওর অভিভাবক হয় কি করে ?

নতুন স্কুল আপ্পুন্নীর খুব ভালো লাগল। কত নতুন নতুন বন্ধু, কত ভালো পড়া। প্রতিদিন নালুকেট্টুর সামনে দিয়ে ও সকাল সন্ধেয় যাওয়া-আসা করত। খেতের বড়ো আলটার কাছে পৌঁছে ও একবার তাকিয়ে দেখত। খেতের একধারে ঘন সুপুরির চাষ। সুপুরি গাছের আড়ালে নালুকেট্টু খুব ভালোভাবে দেখা যেত না। এক-একদিন সন্ধেবেলায় ফেরার সময় দেখতে পেত খেতের কাছে খড়ম পায়ে কেশবিরল চক্‌চকে মাথাটা উঁচু করে হাঁটছেন দাদামশায়, মাঝে মাঝে মাথাটা এমন উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকেন যে মনে হয় যেন সারা আকাশটার ভার তাঁর মাথার ওপর। দাদামশায়কে দেখে ওর হাঁটার গতি বেড়ে যায়। দাদামশায় ওকে দেখতে পান না। কতছেলেই তো ও-পথে স্কুলে যায়, ভডাকেপাটের বাগানের পাশ দিয়ে স্কুলে যাবার একটা রাস্তা আছে, ঐ রাস্তা দিয়ে গেলে স্কুলের পথ সংক্ষিপ্ত হয় কিন্তু ও-রাস্তা দিয়ে ও যায় না।

ভডাকেপাট থেকে দুটো ছেলে ওর নতুন স্কুলে পড়তে আসে—

ভাস্করণ আর কৃষ্ণণ কুট্টি। ভাস্করণ ওর ক্লাসে পড়ে কিন্তু সেক্শান আলাদা। কৃষ্ণণ কুট্টি ক্লাস সিক্সে পড়ে। 'এ' আর 'বি' সেক্শানের ড্রিল ক্লাস একসঙ্গে হয়। ড্রিলক্লাসে প্রথম ভাস্করণকে দেখল। ভাস্করণের সঙ্গে কী কথা বলবে? কিন্তু ড্রিল ক্লাসে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে, কলে জল খাবার সময় সামনা সামনি দেখা হলেও ভাস্করণ ওর সঙ্গে একটা কথাও বলল না। ভাস্করণ ওকে ভালোভাবেই চেনে। কুট্টি শঙ্করণের কাছে ভাস্করণই ওর কথা বলেছে। ভাস্করণ আজ তু'বছর ধরে ক্লাস এইটে পড়ে আছে।

ভাস্করণ আর কৃষ্ণণকুট্টি গোরুর গাড়িতে করে স্কুলে আসে। একটা সাদা ষাঁড় গাড়ি টানে। তার শিং তুটো রঙ করা আর গলার বেল্টে ঘন্টি বাঁধা। দূর থেকে ঐ ঘন্টির আওয়াজ শোনা যায়। ওদের যাওয়া-আসা আপ্পুন্নী খুব ঈর্ষার সঙ্গে লক্ষ্য করত। কয়েক দিনের মধ্যেই ও বুঝতে পারল, যে শুধু ও নয়, স্কুলের অনেক ছেলেই ওদের ঈর্ষা করে। সারা স্কুলে মাত্র ওরা তুজনই গাড়ি করে আসে, ভাস্করণ খুব মোটা, ওর কথাবার্তায় চালচলনে একটা হামবড়াই ভাব। চারটের সময় ছুটি হওয়ার আগেই গেটের সামনে গোরুর গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে। মাথায় একটা সবুজ তোয়ালে জড়ানো একটা কালো মোটা লোক গাড়োয়ান, ভাস্করণ স্কুলের গেট পেরিয়ে বইগুলোকে গাড়ির মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কৃষ্ণণ কুট্টিকে বলে— এই উঠে বস্, কৃষ্ণণকুট্টি বসার পর ও পা ঝুলিয়ে এক পাশে বসে। স্কুলের আর রাস্তার সব ছেলেদের নজর যে ওদের ওপর তা ভাস্করণ খুব ভালো করেই জানে।

আপ্পুন্নীর বন্ধু হচ্ছে মহম্মদ। ওদের বাড়ি থেকে অল্প দূরে মহম্মদের বাড়ি। মহম্মদ ওর জন্যে রোজ রাস্তার একধারে অপেক্ষা করে। ভাস্করণদের ঐ গোরুর গাড়ির ওপর মহম্মদের খুব লোভ। পড়াশুনো শেষ করে ও ব্যবসা করতে যাবে। অনেক টাকা রোজগার করে ঐ রকম একটা গোরুর গাড়ি কিনবে। মহম্মদের কাছে আপ্পুন্নী

গল্প করেছিল যে ভাস্করণ, কৃষ্ণণ কুট্টি আর ও একই বাড়ির ছেলে। মহম্মদ আবার কাকে যেন গল্প করেছিল।

—গাড়ি করে ঐ যে ছেলে দুটো আসে ওরা আর আমাদের আপ্পুন্নী একই বাড়ির ছেলে।

ক্লাসের সব ছেলে এ কথা জানল কিন্তু ভাস্করণ জানতে পারার পর আপ্পুন্নীর অপমানের একশেষ হল। ভাস্করণের কতকগুলো বন্ধু আছে তাদের মধ্যে একজন হচ্ছে করুণাকরণ। ও ভাস্করণকে আপ্পুন্নীর কথা বলতে ভাস্করণ মুচকি হেসে বলল,

—হুঁ, একই বাড়ির ছেলে। গতবছর যখন তুল্লল্ দেখতে এসেছিল তখন কি হয়েছিল একবার জিজ্ঞেস কর তো?

কী হয়েছিল, কী হয়েছিল বলে কেউ কেউ আপ্পুন্নীকে বারবার জিজ্ঞেস করলে পর আপ্পুন্নী কেঁদে ফেলল। ভাস্করণ তখন বলেছিল— ও আমাদের বাড়িতে তুল্লল্ দেখতে এসেছিল। দাদু ওকে গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দিয়েছিল। ভয়ে কাছা খুলে কেমন দৌড়টা দিয়েছিল একবার জিজ্ঞেস করে দেখ্-না।

আপ্পুন্নী নিঃশব্দে এ অপমান হজম করল। একটা কথাও বলতে পারল না। শুধু মনে মনে ভাস্করণকে গালাগালি দিল— পাজী, হারামজাদা। ভাস্করণ ওর বড়ো মাসীর ছেলে। ওর বাবা ছিল নাম্বুদিরী বামুন। ওর মার নিজস্ব খেত-খামার আছে। আর ও বামুনদের বাড়ির ঝিয়ের ছেলে, ওর বড়ো বাড়ি নেই, পয়সা নেই। ওর দুজোড়া জামা আর দুটো ট্রাউজার। তাই রোজ কেচে কেচে পরে। ওর সব বইও নেই, অঙ্ক করার মোটা বাঁধানো খাতাও নেই। ভাস্করণ দুপুরে স্কুলের কাছে নায়ারদের হোটেলে ভাত খায় আর ও সকালবেলা দুটি ফেনাভাত খেয়ে আসে। সেই সন্ধেবেলায় বাড়ি ফিরে আবার খায়। দুটো পিরিয়ডের পর থেকেই যেন পেটের মধ্যে খিদের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে। স্কুলের কাছের নায়ারদের হোটেল থেকে সরষে ফোড়ন দেওয়ার গন্ধ ভেসে আসে। একটার সময় টিফিনের ছুটি। তখন স্কুলের কল থেকে পেট ভরে

জল খায়। ওখান থেকে হোটেলের পেছন দিকটা দেখা যায়। একটার পর একটা কলাপাতা সাজিয়ে রেখেছে।

একদিন বিকেলে স্কুলের উঠোনে 'ওট্টন তুল্লল্' নাচ হবে বলে ঠিক হল। আগের দিন ক্লাসে ক্লাসে নোটিশ গিয়েছিল যেন প্রত্যেকে তু্আনা করে পরের দিন নিয়ে আসে। কিন্তু ওর কাছে পয়সা ছিল না। মা পাড়াপড়শীর কাছে ধার করতে ছুটে গেল কিন্তু পেল না।

সকালে প্রথম ঘণ্টায় মাস্টারমশায় সকলের কাছ থেকে পয়সা নিলেন। ক্লাসে শুধু চারজন দিতে পারল না— তাদের মধ্যে আপ্পুন্নী একজন। ওদের তুপুরবেলায় পয়সা আনতে বললেন মাস্টারমশায়। আপ্পুন্নী টিফিনের সময় বই নিয়ে সোজা স্কুলের বাইরে চলে এল। ও মহম্মদকেও কিছু না বলে সোজা হাঁটতে লাগল। তুপুরে মাস্টার মশায় পয়সা চাইলে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। ক্লাসের সমস্ত ছেলেরা ওর দিকে তাকিয়ে দেখবে অন্তত এটুকুও তো এড়ানো যাবে।

উঃ কি ভীষণ রোদ। মাঠ যেন আগুন হয়ে আছে। ও রাস্তায় হাঁটতে আরম্ভ করল। ভডাকেপাটের বেড়ার কাছে আসতে কে যেন বাগানের ভেতর রয়েছে বলে মনে হল। ও ভালো করে সেদিকে না তাকিয়েই তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগল আর তখনই একটা ডাক্ শুনল,

—আপ্পুন্নী দাদা।

ও থেমে পড়ল। মালু ডাকছে। মালু পানের বরোজ থেকে একটা একটা করে পান তুলছে।

—কি আপ্পুন্নী দাদা, স্কুল এত তাড়াতাড়ি ছুটি হয়ে গেল যে ?

ওঃ মিষ্টি মিষ্টি কথা বলতে এসেছে— আপ্পুন্নীর ভীষণ রাগ ধরল। ও শুধু হুঁ বলল।

—তোমাকে এ পথ দিয়ে যেতে আমি প্রায়ই দেখি। ভাস্করণ দাদা পিসীকে বলছিল আমি শুনেছি। এর উত্তরেও আপ্পুন্নী কিছু বলল না।

—ঠাকুমা তোমার সঙ্গে একবার দেখা করতে চায়। আমাকে বলেছে তুমি এ পথে যাওয়ার সময় ডাকতে।

ওঃ দেখবে। একবার কি দেখে নি? যখন ওকে গলা ধাক্কা দিয়ে বার করে দিয়েছিল তখন সকলে হাঁ করে দেখে নি?

—ঠাকুর্দা আর বাবার মধ্যে···

মালু হঠাৎ চুপ করে গেল।

—কার সঙ্গে এত কথা বলছিস রে মালু?

সুপুরি গাছের আড়াল দিয়ে একটা মেয়ের ছবি দেখা যাচ্ছে। এখন চলে গেলে কেমন হয়? কিন্তু মেয়েটা যখন এগিয়ে এল ও দেখল আম্মিনী না! আম্মিনী মাসী। সাপের ফণার ওপর সওয়ারী অর্ধনগ্ন রাজকুমারী, খুব অবাক হয়ে আপ্পুন্নী আম্মিনীকে দেখতে লাগল, কোমরের ওপর থেকে নগ্ন এক রাজকুমারী। খোলা চুলগুলো তার পিঠের ওপর ছড়িয়ে পড়ে সাপের মতো হেলছে দুলছে। সেই রাজকুমারী এখন একটা নীল সিল্কের ব্লাউজ আর সবুজ পাড়ের একটা মুণ্ডু* পড়েছে। কপালে চন্দনের রেখা। টানা টানা চোখ দুটিতে কাজলের টান।

—আরে! এ যে আপ্পুন্নী।

ওঃ নামটা তা হলে বেশ মনেই আছে। আম্মিনীর এই রূপ আপ্পুন্নীর অজানা, বার বার ওর চোখের সামনে ভেসে উঠছে সেই সর্পকন্যার ছবি। আম্মিনী হাসলে বা কথা বললে ওর চোখ দুটো যেন অর্ধেকটা বুজে আসে।

আপ্পুন্নীর অদ্ভুত দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে আম্মিনী বলল, অমন করে তাকিয়ে আছিস যে? আমাকে চিনতে পারছিস না?

হ্যাঁ, হ্যাঁ। তোমাকে খুব ভালো করেই চিনি। আমাকে গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দিয়েছে যে দাদামশায় তার বড়ো আদরের সবচেয়ে ছোটো মেয়ে তুমি। আমার চেয়ে তুমি তিন বছরের বড়ো তাই তোমাকে মাসী বলে ডাকতে হবে।

আম্মিনী ঠোঁট দুটো হাসিতে ভিজিয়ে বলল— তুই না চিনলেও

* কেরলের মেয়েদের জাতীয় পোষাক।

আমি তোকে চিনি।

হাত থেকে পড়ে যাওয়া সুপুরিটা কুড়োতে গিয়ে ওর খোপা ভেঙে চুলগুলো সব কাঁধের ওপর ছড়িয়ে পড়ল।

—মালু, ছাঁচিপান পেলে আমাকে একটা দিস।

আমি চললাম, বিশেষ কাউকে উদ্দেশ্য না করে বলে আপ্পুন্নী হাঁটা দিল।

আম্মিনী ডাকল—আপ্পু শোন্।

ও ফিরে না তাকিয়ে হাঁটতে লাগল।

বাড়ি ফিরে দেখে মা বামুনদের বাড়ি থেকে ফিরেছে, শুধু মা নয়, বারান্দায় শঙ্করণ নায়ারও বসে। ও ধুমধাম শব্দ করে বাড়ির ভেতর ঢুকলে মা ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

কিরে আপ্পুন্নী, আজ এত সকাল সকাল যে?

ওর সব মিলিয়ে ভীষণ রাগ ধরছিল। বিশেষ কারুর ওপর নয়। মার প্রশ্নের উত্তরে বললে— এমনি।

—এমনি? কেন রে?

—কিছু না।

বইগুলো একপাশে ছুঁড়ে ফেলল তারপর একটু চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলো,

—ভাত আছে?

ওর ভাবসাব ওর মার ভালো লাগছিল না। আপ্পুন্নী এর আগে কখনও মুখ কালো করে মার সঙ্গে কথা বলে নি। মা ভাত বাড়ার সময় পিঁড়ে না নিয়েই ও মাটিতে বসে পড়ল।

—কাপড় ময়লা হয়ে যাবে, পিঁড়ে পেতে বোস।

ভাত খানিকটা পেটে যেতে অকারণ রাগ খানিকটা কমল।

পিঁড়ে চাই না। ও শান্ত স্বরে বলল।

মা তখন বাইরে গেছে। শঙ্করণ নায়ারের গলা শোনা গেল,

—আপ্পুন্নীর কি হয়েছে?

—কি জানি, কি হয়েছে। আমিও তো তাই ভাবছি। মাথা

খারাপ হয়ে গেল নাকি ছেলেটার? কখনও তো এমন করে না।

—আচ্ছা ওটা আমি ঠিক করব। আপনি কিছু ভাববেন না। যাতে ফাইন না দিতে হয় তার ব্যবস্থা করব।

ফাইনের কথা মানে মাইনে দেওয়ার কথা হচ্ছে। মাইনে দেওয়ার সময় হয়েছে। মা বোধহয় শঙ্করণ নায়ারের কাছে টাকা ধার চাইছে।

—তা হলে তো আমার খুবই উপকার হয় শঙ্করণ নায়ার।

—আমাকে দিয়ে যতটা সাহায্য পাওয়া যায় তা সব আপনি পাবেন।

শঙ্করণ নায়ার চলে যায়ার পর মা ভেতরে ঢুকল, আপ্পুন্নী তখন আঁচাচ্ছে।

—কি রে আপ্পুন্নী, তুই কেন সকাল সকাল স্কুল থেকে ফিরেছিস বললি না তো?

—এমনিই মা। মাস্টারমশায় বললেন যারা চায় তারা বাড়ি যেতে পারে।

ও বাইরে এল। মা আজকে বামুনদের বাড়ি কাজে যায় নি কেন জিজ্ঞেস করবে ভেবেছিল কিন্তু করল না। ও ভুলতে চাইল যে ওর মা বামুনদের বাড়ির ঝি—সেখানে গিয়ে ধান সেদ্ধ করে, শুকোতে দেয়, ধান ভানে, কাঠ কাটে আরও কত কি? ঝিয়ের ছেলে? নাঃ ও ঝিয়ের ছেলে নয়। ও কোন্তুন্নী নায়ারের ছেলে। দেশের সবচেয়ে বড়ো পকীড়া খেলুড়ে মান্নানকে হারিয়ে দিয়েছে যে পকীড়া খেলুড়ে— সেই কোন্তুন্নী নায়ারের ছেলে। মুত্লিমকুন্নতে যখন হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা হয়েছিল তখন একাই একশো হয়ে লড়েছিল যে কোন্তুন্নী নায়ার, ও তার ছেলে।

বুড়ীদিদির কুঁড়েঘরের দরজা খোলা। বুড়ীদিদির সঙ্গে আজ বেশ কিছুদিন হল দেখা হয় নি। দরজার সামনে কুলোয় চাল ঝাড়ছিল বুড়ীদিদি।

—কে রে?

—আমি, দিদিমা।

—ওঃ আপ্পু। ভাই কাঁকরগুলো একটু বেছে দে-না। তোর দিদিমা চোখে ভালো করে দেখতেও পায় না।

আজকাল বুড়ীদিদির গল্প শোনার ওর একদম সময় নেই। সকাল সকাল বাড়ি থেকে বেরুতে হয়। স্কুলের রাস্তা অনেক দূর। বিকেলবেলা আসতে আসতে সন্ধে। শনি-রবিবার সময় হলে বুড়ীদিদিকে আবার ঘরে পাওয়া যায় না।

—কে রে বাড়িতে এসেছিল ?

—শঙ্করণ নায়ার।

—কেন ?

—জানি না কেন, আমি এই এলাম।

—তেঙ্গুমপোট্টা শঙ্করণ নায়ার লোক ভালো।

কিন্তু বুড়ী ওখানেই থামল না।

—লোক ভালো হলেও—

—কি দিদিমা ?

—নাঃ কিছু না।

—চালের কাঁকর বেছে ও যখন বাইরে এল, বুড়ী বলল,

—লোককে পাঁচটা কথা বলার সুযোগ দেওয়া কেন ?

লোকে কী বলছে ? রাস্তা থেকে একটা ঢিল তুলে নিয়ে আপ্পন্নী খুব জোরে দূরে ছুঁড়ে ফেলে বাড়ির দিকে হাঁটা দিল।

তৃতীয় অধ্যায়

ভডাকেপাটের রান্নাঘরের সমস্ত কাজ মীনাক্ষীকে করতে হয়। মীনাক্ষীকে সাহায্য করে মালু। ঠাকুমার মেজো মেয়ে মীনাক্ষী পিসী। মীনাক্ষী পিসী বড়ো পিসীর মতো নয়। মালুকে দিয়ে খুব বেশি কাজ করায় না। তাই মালুর মীনাক্ষী পিসীকে খুব পছন্দ, পিসীর ছেলেমেয়ে হয় নি।

পিসেমশায়ের নাম অচ্যুতন নায়ার।

মীনাক্ষী পিসী যে বাড়িতে আছে তা বেশি লোক জানতে পারে না। খুব ভোরে উঠে চান করে পিসী রান্নাঘরে ঢোকে আর রাতে সবার খাওয়া শেষ হলে রান্নাঘর ধুয়ে, উনুন নিকিয়ে তারপর বের হয়। ঠাকুর্দা বিকেলের দিকে বাইরে বেরোন। গাছ-গাছালি খেত-আবাদ সব একবার ঘুরে দেখে তারপর বাড়ি ফেরেন। ঠাকুর্দা যেদিন দেরি করে বাড়ি ফেরেন সেদিন শুতে শুতে পিসীর অর্ধেক রাত। ভাত তরকারী সব রান্না করে রান্নাঘরে পিঁড়ে পেতে পিসী অপেক্ষা করে। যত দেরিই হোক-না কেন ঠাকুর্দার খাওয়া শেষ হলে তবে বাড়ির আর-সকলে খেতে পারবে। বাইরে থেকে ঘুরে এসে ঠাকুর্দা বেশ কিছুক্ষণ তেল মাখবেন। তারপর কোমরে, শুধু তোয়ালে জড়িয়ে সারা গায়ে জবজবে তেল লাগিয়ে উঠোনের এদিক থেকে ওদিক অনেকবার পায়চারি করবেন। কুয়োর কাছে দু-ঘড়া ঠাণ্ডা জল আর এক-ঘড়া গরম জল ও আর মীনাক্ষী পিসী এনে রেখে দেয়। ঠাকুর্দা চান করার সময় দক্ষিণের ঘরে প্রদীপ জ্বালিয়ে মাদুর পেতে, কপালে ভস্ম লাগাবার সব আয়োজন করে রাখে আম্মিনী পিসী। চান করে গোলাবাড়ি গিয়ে কাপড়-চোপড় বদলে আসতে ঠাকুর্দার বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগে। ঠাকুরকে নমস্কার করে কপালে ভস্ম লাগিয়ে ঠাকুর্দা যখন আবার গোলাবাড়ির ওপরে ওঠেন তখন সেখানে মাছ ভাজা বা ডিম ভাজা পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

শুধু ঠাকুর্দার জন্যই মাছ ভাজা বা ডিম ভাজা হয়। ঠাকুর্দা যখন খেতে আসেন তখন বাড়ির সব ছেলেমেয়েরা ওখান থেকে সরে যায়। ঠাকুর্দা যখন পাশ দিয়ে যান তখন কিসের একটা দুর্গন্ধ বেরোয়। গোলাবাড়িতে ধানের সিন্ধুকের মধ্যে নাকি বোতলগুলো লুকিয়ে রাখা হয়েছে।

ঠাকুর্দার খাওয়ার পর মালুর বাবা, পিসেমশায়, ছেলেপিলেরা সব খাবে। তারপর মেয়েরা। সকলকে খেতে দেয় মীনাক্ষী পিসী। সবার শেষে পিসী যখন খেতে বসে তখন অন্যরা সব হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে। মালুর তখন পিসীর জন্য বড়ো কষ্ট হয়। পিসী ওকে বসে থাকতে দেখে বলে— তুই শুয়ে পড় মালু, অনেক রাত হল, আমার তো রোজই এই অবস্থা।

মীনাক্ষী পিসীর গলার স্বর বেশি শোনা যায় না, সবচেয়ে বেশি গলা শোনা যায় বড়ো পিসীর— ভাস্করণ দাদার মার। বড়ো পিসী সব সময় মীনাক্ষী পিসীর সঙ্গে ঝগড়া করে। মীনাক্ষী পিসী একটা কথাও বলে না। বড়ো পিসী কিছু বললে বলে,

—সব আমার কপালের লিখন।

ঠাকুমাও তার মেজো মেয়ের কথায় বলে,

—ওর কপালের লিখন।

কিন্তু রান্নাঘরের কাজে একটু দেরি হলে ঠাকুমারও রাগ হয়।

—ওরে চৌষট্টিজন লোককে ভাত বেড়ে দিয়েছি আমি। মাঝে মাঝে এ কথা ব'লে ঠাকুমার যেন বেশ আনন্দ হয়।

মেজো পিসেমশায়ের বয়স বেশি হয়েছে। উনি কারুর সঙ্গে কথাবার্তা বেশি বলেন না। শুধু খাওয়ার সময় খেতে আসেন, তা ছাড়া পিসেমশায় সব সময় বাইরে বাইরে ঘোরেন। রাতে ঠাকুরমার পাশের ঘরটায় এসে শোন। ওর বাবা আর পিসেমশায় যেন একই ধরনের লোক। দুজনের রকম-সকম দেখে মনে হয় যেন ওঁরা এ বাড়িতে খুব ভয়ে ভয়ে আছেন।

বড়োপিসী আর তার ছেলেমেয়েরা জমি-জায়গা ধন-সম্পত্তির

ম্যুলিক। তাঙ্কদিদির বাবা নামকরা নাম্বুদিরী বংশের ছেলে ছিলেন। মারা যাওয়ার আগে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি বউয়ের নামে লিখে দিয়ে গেছেন। বড়োপিসীর দূরে কোথায় যেন একটা বাড়ি আর জমিজমা আছে। জমিজমা দেখাশুনো করে কুঞ্জন নায়ার। জমিজমা থেকে যে আয় হয় তার টাকাটা কুঞ্জন নায়ার বড়ো পিসীর হাতে দেয়। ঠাকুমা বলে— ওর পয়সায় ছাতা পড়ে গেল। আমার মেয়ে বলে লাভ কি? একটা পয়সা ওর হাত দিয়ে গলে না, এমন হাড়কিপ্‌টে।

ঠাকুরমা আর বড়ো পিসীর মধ্যে মাঝে মাঝে খুব ঝগড়া হয়। যখনই ঝগড়া হয় বড়ো পিসী বলে,

—তোমরা আমার আর আমার ছেলেমেয়েদের সর্বনাশ করে ছাড়বে।

একদিন দুপুরবেলা খুব গণ্ডগোল লেগে গেল। বেড়ায় কাপড় শুকোতে দেওয়া হয়েছিল। বাইরে থেকে একটা গোরু বেড়া ভেঙে কাপড়ের অর্ধেকটা খেয়ে ফেললো। ঐ একটা গোরু— জামা কাপড় পেলেই খায়। বড়োপিসী তাই দেখে ছুটে গিয়ে গোরুর মুখ থেকে বাকী কাপড়টা বার করল। সঙ্গে সঙ্গে গোরুকে কী গালাগালি। গোরু গালাগালিতে ভ্রূক্ষেপ না করে আপন মনে চলে যাওয়ায় পিসীর রাগ আরও বেড়ে গেল। বাড়ির মধ্যে এসে পিসী আরম্ভ করল,
—কেউ কি এ বাড়িতে আছে যে একটু নজর রাখবে?

—গোরুকে খেতে কি কেউ দেখেছে? ঠাকুমা জিজ্ঞেস করল।

—দেখলেও কেউ টুঁ শব্দটি করবে না! আমার নষ্টে তোমাদের কি? কাজের নামে খোঁজ নেই শুধু গাণ্ডেপিণ্ডে গেলার লোক এ বাড়িতে আছে।

ঠাকুরমার এ কথা শুনে খুব রাগ হল।

—বেশি বাজে বকিস নি। এখানে বাইরের লোক কেউ থাকে না।

—মার তো চোখে পড়বে না কি ভাবে এখানকার সব উচ্ছন্নে যাচ্ছে।

—এখানে কী হচ্ছে না হচ্ছে তোর মামা দেখবে।

—তোমাদের আর কি? আমি আর আমার ছেলেমেয়েরাই ভুগব।

—এখানে তো আরও লোক রয়েছে।

এমনিভাবে কথা কাটাকাটি চলতে চলতে শেষকালে বড়োপিসী বলল— তুমি আমাকে আর আমার ছেলেমেয়েদের দেখতে পারো না। আমার ছেলেমেয়েদের দেখতে পারলে ছেলের মেয়েকে নিয়ে এত নাচানাচি করতে না। ঠাকুমা আর-কিছু না বলে জপ করতে শুরু করল। মালু এ বাড়িতে থাকে বড়ো পিসীর ইচ্ছে নয়। মালুর বাবাকেও* পিসী দেখতে পারে না। এক পয়সার মুরোদ নেই গাণ্ডেপিণ্ডে গিলে এখানকার সব ধ্বংস করতে বসেছে— এমন কথাও পিসী ওর বাবার সম্বন্ধে বলেছে। বাড়ির দক্ষিণে আর উত্তরের দিকে ওপরের তিনখানা ঘর বড়োপিসীর আর তার ছেলে-মেয়েদের। মালু ওদিকে বড়ো একটা যায় না। সামনের ঘরটায় ভালো একটা খাট পাতা। তাতে বড়োপিসী আর তাঙ্কদিদি শোয়। মাঝের ঘরটায় ভাস্করণদাদা আর কৃষ্ণণকুট্টি। তৃতীয় ঘরটা সবসময় তালাচাবি বন্ধ থাকে। একবার মাত্র ও ভেতরটা দেখেছিল। তাতে দুটো খাট আছে, তার ওপর তোষক বালিশ সাজানো। খাট দুটোও বেশ বাহারে। দেওয়ালে ভালো ভালো ছবি টাঙানো আর একটা খুব বড়ো আয়না। আয়নার কাছে দুটো মাটির হরিণের মাথা দেওয়ালে আটকানো। খাটের নীচে কাঁসার আর রুপোর বাসনপত্র। ঘরের মাঝখানে একটা বড়ো গোলটেবিল। এ ঘরটা তাঙ্কদিদির।

—আমার ঐ একটাই মেয়ে— ওর বিয়ের পর ওর একটা নিজের ঘর চাই না?—পিসী বলে।

তাঙ্কদিদির আর তার বরের জন্য ঐ ঘরটা সাজিয়ে রাখা হয়েছে। তাঙ্কদিদি ক্লাস ফাইভ অবধি পড়েছে। ওর বয়স এখন পনেরো, মালুর বারো।

* মাতৃমুখ্য সমাজে ভাইয়ের ছেলেমেয়েরা তাদের মামার বাড়ি থাকবে।

মালু ঠাকুমার ঘরে শোয়। ঠাকুমা একটা নীচু খাটে শোয় —নীচে মাতুর বিছিয়ে মালু। বর্ষাকালে ঠাকুমা ওকে খাটের ওপর শুতে বলে। খুব বৃষ্টি আর ঠাণ্ডার সময় গরম কম্বলের নীচে শুতে কী আরাম!

মালু যে এ বাড়িতে আছে তা ওর বাবার যেন খেয়ালই নেই। ওকে ডেকে তুটো কথাও জিজ্ঞেস করে না। ওকে কোনোদিন কিছু কিনেও দেয় নি। ঠাকুমা বলে, ওর হাতে কি একটা পয়সাও আছে যে মেয়েকে কিছু কিনে দেবে?

চাষবাস দেখার জন্য আগে লোক ছিল। এখন মালুর বাবাই সব দেখাশোনা করে। সকালে খুব ভোরে উঠে বাবা পশ্চিমের বারান্দায় গিয়ে "কু কু" করে ডাক দেয়। তার উত্তরে টিলাটার ওপাশ থেকে চার-পাঁচবার "কু কু" আওয়াজ শোনা যায়। টিলাটার ওপাশে থাকে খেত-মজুরেরা। ওরা এসে গোয়াল থেকে গোরুগুলোকে বের করে জল খাইয়ে বাইরে নিয়ে আসার সময় বাবাও ওদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে। ফিরতে তুপুর শেষ হয়ে যায়।

গোয়ালে চার জোড়া ষাঁড় আছে। তিন জোড়াকে লাঙ্গল দেওয়ার জন্য মাঠে নামানো হয়। বাকী থাকে তুটো ষাঁড় তাদের নাম, এরু আর মানি। এই ষাঁড় তুটোকে ষাঁড়ের দৌড়-প্রতিযোগিতায় নামানো হয়। ষাঁড়ে ষাঁড়ে দৌড়ানো প্রতিযোগিতা ঠাকুর্দার যেন জীবন। গত আষাঢ়ে উটাকাণ্ডতীলে* ষাঁড়ের দৌড় হয়েছিল। অনেক জায়গা থেকে বড়ো বড়ো ষাঁড় এসেছিল। দৌড় প্রতিযোগিতার আগের রাতে ঠাকুর্দা শোবার আগে লণ্ঠন নিয়ে গোয়ালঘরে এসে সব ভালো করে দেখবেন গামলায় খড় জল ঠিকমত আছে কিনা, গলার বেল্ট বাঁধা হয়েছে কিনা। ঠাকুর্দা মাসে একবার করে তৃতালার হাট থেকে পাঁঠার মাথা কিনে এনে সেদ্ধ করে গুঁড়ো করে এরু আর মানিকে খাওয়ান যাতে তাদের গায়ে আরও জোর হয়।

*জায়গার নাম

সপ্তাহে একবার করে ষাঁড়ের জন্য আলাদা তিল ঘানিতে ভেঙে তেল তৈরি হয়। তারপর বাকী সব তিল ঝেড়ে ভালো ভালো তিল সব থলেয় ভর্তি করে ঠাকুমার বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ভাঙা তিলগুলো সব এ বাড়ির ভেতর যায়। এ বাড়ির ঠাকুমার তিল-ভাজা গুঁড়ো করে খেতে খুব ভালো লাগে। মাসে এক সের তেল গায়ে মাখার জন্যে বরাদ্দ। মঙ্গলবার আর বুধবার বাড়ির মেয়েরা তেল মেখে চান করে। তবে বড়োপিসী আর ছেলেমেয়েরা এর মধ্যে নেই। বড়োপিসী ওপরের ঘরে বড়ো একটা কালো বোয়েমে তেল ভর্তি করে রেখেছে।

বাবাকে কিছু বলতে মালুর ইচ্ছে করে না। লকেটের আংটাটা ভেঙে গেছে। ওটা সারাতে পারলে ভালো হত। কিন্তু সরাসরি বাবাকে না বলে ও ঠাকুমাকে বলল— স্যাকরাকে চার আনা দিতে হবে।

—কি জানি ওর হাতে কি পয়সা আছে? স্যাকরা এদিক দিয়ে গেলে তুই ডাকিস। আমি বলে সারিয়ে দেব।—ঠাকুমা বলল।

বাবার হাতে পয়সা নেই ও জানে, ঠাকুমাও জানে। তবু ওনম্ এগিয়ে আসার সময় ঠাকুমা বাবাকে বলল,

—কুট্টা, ওনম্ আসছে, মেয়েটার জন্যে দুটো-একটা মুণ্ড কিনতে হবে।

বাবা বলল— আমার হাতে পয়সা নেই।

—মেয়েটার বারো-তেরো বছর বয়স হল, এ বয়সের মেয়েরা কি লেংটি পরে ঘুরে বেড়াবে নাকি?

বাবা চুপ করে রইল।

—তুই চুপ করে আছিস যে?

—কি বলব?

—ওর করবেটা কে শুনি?

বাবা তবু চুপ করে রইল।

—কুট্টী, তুই তো বেশ মজার লোক, সব দেখেশুনেও চুপ করে বসে আছিস ?

বাবা বসে ছিল, উঠে পড়ল। বাবার কালো মুখ আরও কালো হয়ে উঠল। ঠাকুমার দিকে তাকিয়ে রুক্ষ স্বরে বলল— তুমি ভালো করেই জানো যে এ বাড়ির ভাগ থেকে আমি বছরে চারটে মুণ্ড, দুটো তোয়ালে আর দুটো লেঙ্গুটি পাই।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানি।

—তা হলে কেন এ-সব বাজে কথা বলছ। হাতে ছুঁতে একটা পয়সা পর্যন্ত পাই না। মোষের মতো সকাল থেকে সন্ধে অবধি খাটছি। মেয়ের জন্যে কিছু করার সংগতি আমার নেই সে তো তুমি ভালো করেই জানো। আমি তো বলেই ছিলাম যে আমার পক্ষে কোনো দায়-দায়িত্ব নেওয়া সম্ভব হবে না। যদি কিছু না পাওয়া যায় তা হলে এ বিয়ের সম্বন্ধ কোরো না। আমি তো বিয়ে করতে রাজীই হই নি।

—সে ভার তো গেছে।

—হ্যাঁ, কষ্টের লাঘব হয়েছে। তুমি কি ভাবো আমার জ্ঞানগম্যি কিছু নেই নাকি ? কিন্তু কোথা থেকে পাব ? আমার হাতে কি একটা পয়সা আছে ?

ঠাকুর্দা নিজের খুশিমতো ভাগনের বিয়ে দিয়েছে। ওদের একই বংশের কর্তাব্যক্তির মেয়ে ছিল মালুর মা। মালু যখন ওর নিজের বাড়িতে ছিল তখন মা-বাবার এই বিয়ের গল্প শুনেছিল। ঠাকুর্দা বাবাকে ডেকে বললেন, আর বাবা সঙ্গে সঙ্গে আদেশ পালন করল। ওরা শুধু মুণ্ড আর পান খাওয়ার পয়সা দিয়ে বাবাকে ওদের সঙ্গে নিয়ে গেল, চারজন নায়ার।

ঠাকুমা বলল,

—তা হলে তোর মামার কাছে বল্। ওনমের সময় মেয়েটা একটা নতুন কাপড় পাবে না সেই বা কেমন কথা ?

—আমি পারব না। তোমার তো ছোটো ভাই। তুমিই বলো।

—তুইই বল্‌-না বাবা। ওকি তোকে খেয়ে ফেলবে নাকি? বাবার গলার স্বর হঠাৎ রুক্ষ হয়ে উঠল— হ্যাঁ বলব। সব-কিছু বলব বলে ঠিক করেছি।

বাবার গলার স্বর শুনে ঠাকুমা চমকে উঠল।

—কী সব যা তা বকছিস?

—হ্যাঁ, যা বলছি ঠিকই বলছি। আমি কিছু ভুলে যাই নি। সব মনের মধ্যে গাঁথা আছে। মামার শ্বশুরবাড়িতে গাছ পোঁতার জন্য মাটি খোঁড়া হচ্ছে, ভালো করে বেড়া দেওয়া হচ্ছে, বাড়িতে চূনকাম করা হচ্ছে, এ-সব পয়সা কোত্থেকে আসছে? অ্যাঁ? এ-সব …এ-সব…

মালুও অবাক হয়ে গিয়েছিল। ওর বাবা যে এরকমভাবে বলতে পারে ও তা ভাবতেই পারে নি। মুখে একটাও রা করে না যে মানুষটা সে আজ এমনিভাবে খোলাখুলি ভাবে সব বলছে?

—আমি রোদে পুড়ে জলে ভিজে যে রোজগার করছি তার টাকায় এ-সব হচ্ছে।

—চুপ কর, চুপ কর। তোর মামা শুনতে পাবে। হে ভগবান! —বলে ঠাকুমা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল।

—কেন চুপ করব? এতদিন চুপ করে ছিলাম, এখন মুখ খোলার সময় এসেছে। কী ভেবেছে মামা, ভাগনের গলায় ছুরি বসাবে? —বলে বাবা বেরিয়ে গেল।

আজকাল ঠাকুর্দা আর ঠাকুমার মধ্যে বেশি কথাবার্তা নেই। আগে কিছু বলতে হলে বাড়ির ভেতর এসে দিদি বলে ডাক দিতেন। ঠাকুমা ঠাকুর্দার চেয়ে দশ বছরের বড়ো। গত বছর সর্পতুল্ললের পরের দিন থেকেই দুজনের মধ্যে মনকষাকষি শুরু হয়েছে। সকাল-বেলায় আপ্পুন্নী দাদাকে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছিলেন ঠাকুর্দা। সন্ধেবেলায় দুজনের মধ্যে কথা কাটাকাটি হল। ঠাকুমা বলল—

ও ছেলেটারও এ বাড়িতে একটু অধিকার আছে।

ঠাকুর্দা উঠোনে পায়চারী করছিলেন। থেমে পড়লেন,

—অধিকার? কে ঐ ছোঁড়া?

—ও, ও এ-বাড়ির ছেলে।

—এই বুড়ী, বেশি কথা বোলো না।

দিদির বদলে বুড়ী বলল,

—তুই সাক্ষাৎ যম, এ পরিবারের যম।

ঠাকুর্দা চীৎকার করে উঠল,

লাথি মেরে…

ঠাকুমা আর কিছু বলল না, ভেতরে উঠে গেল। ভেতরে গিয়ে বিড়বিড়োতে লাগল,

—ও সব করতে পারে, হারামজাদা বদমাইশ।

* * *

আপ্পুন্নীর স্কুলে যাওয়ার কথা ঠাকুমা মালুর মুখ থেকে শুনেছিল।

—সত্যি?

—হ্যাঁ ঠাকুমা, আমি ওকে এদিক্ দিয়ে যেতে দেখেছি।

—আহা ছেলেটার মঙ্গল হোক্। ভগবান ওর ভালো করুন। পারুর ও ছাড়া আর কেউই নেই রে।

প্রথম প্রথম ঠাকুমাও আর সকলের মতো বিশ্বাস করত যে ছোটো পিসী খুব খারাপ কাজ করেছে। বংশের মুখে কালি দিয়েছে। তখন যদি পারুপিসীর সম্বন্ধে কেউ কিছু জিজ্ঞেস করত তো ঠাকুমা বলতো—ও শুধু এই বাড়িতে জন্মেছেই, ওর সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই।

কিন্তু বছরের পর বছর কাটার পর মেয়ের সম্বন্ধে মায়ের কৌতূহল বাড়তে লাগল। দু-তিন মাইল দূরে মেয়ের বাড়ি কিন্তু এই দুই-তিন মাইলই যে কতদূর মা এখন তা বেশ ভালো করেই বুঝতে পারল। ও-বাড়িতে কেউ যাবে না, গেলে এ-বাড়ির গেট পার

হতে পারবে না বলে হুকুম দেওয়া হয়েছে। সে হুকুম অমান্য করার সাধ্য কারুর নেই।

খুব গোপনে মা জানতে পেরেছিল মেয়ের প্রসবের কথা। খেত-মজুরদের কে যেন এসে বলেছিল। মা সে কথা শুনে জিজ্ঞেস করেছিল,

—সত্যি? ছেলে না মেয়ে রে?

—ছেলে।

—কখন হল? প্রসব হতে কোনো কষ্ট হয় নি তো? কে প্রসব করালো?

—কাল রাতে শোওয়ার সময় ব্যথা উঠেছিল। সকাল হবার আগেই বাচ্চা হয়েছে।

—দাইটাই কেউ···

শেষ করার আগে বড়ো মেয়ে মার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল—মেয়ের জন্যে যদি এতই দরদ তা হলে প্রসবের সময় গেলেই পারতে।

মা আর কথা না বলে তাড়াতাড়ি নিজের ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকেছিল। যেদিন কোন্তুন্নী নায়ারের মৃত্যুর খবর শুনল সেদিন একা একা ঐ ঘরে লুকিয়ে কেঁদেছিল—

মেয়েটার আর কেউ রইল না।

চেঁচিয়ে শোকপ্রকাশেরও উপায় ছিল না। খেত-মজুরদের কেউ এলে বা বাইরের কাজ করতে মুসলমান বউটা এলে তাদের কাছে খবর নেবে ভেবেছিল। বড়ো মেয়ে যেন জানতে না পারে। মীণাক্ষী জানলে কিছু হবে না, ওর কোনো কিছুতেই উৎসাহ নেই।

আপ্পুন্নীকে একবার দেখার বড়ো ইচ্ছে হয়েছিল। বাড়ির সামনে দিয়েই দুবেলা যাওয়া-আসা করে শুনেছে। ও নাকি ভাস্করণ আর কৃষ্ণণ কুট্টির স্কুলে পড়ে। ভাস্করণকে জিজ্ঞেস করেছিল। ছেলেটা ওর মার মতো বজ্জাৎ, ঠিকমতো জবাব দিল না। বিকেলে উঠোনটার পাশের বাগানটার কাছে দাঁড়ালে আপ্পুন্নীকে দেখা যায় কিন্তু

উঠোনে নামতে আজকাল বড়ো কষ্ট হয়। দশ-বারোটা সিড়ি ভেঙে বাড়ির বাইরের উঠোনে নামতে হবে। নামার চেয়ে ওঠার কষ্ট আরও বেশি। তার ওপর আবার আপ্পুন্নীর সঙ্গে কথা বলছে, ভাই দেখতে পেলে আর-এক বিপদ।

তাকে লাথি মারবে বলেছে এ কথা মালুর ঠাকুমা কিছুতেই ভুলতে পারছিল না। ভাইকে সেই এতটুকু ছোটোবেলা থেকে মানুষ করেছে সে। সারা গায়ে খোস-পাচড়া হয়েছিল তা পরিষ্কার করা, তাতে ওষুধ দেওয়া, সব সে করেছে আর ভাইকে সে কোলে করে নিয়ে বেড়াতো। তাকে চান করানো খাওয়ানো হাগানো মোতানো সব সে করেছে। সেই ভাই যখন বড়ো হল, বাড়ির কর্তা হল তখন তাকে সমীহ করে চলতে হল। তার সঙ্গে পারিবারিক বিষয়ে কিছু আলোচনা করার সময় তার অবসরমতো কথা বলতে হত। আর তারপর এই চরম অপমান।

'লাথি মেরে'—এ কথা ভাবতেই বুড়ীর তুচোখ জলে ভরে উঠল।

—পাবে পাবে শাস্তি পাবে। এর প্রতিফল পেতেই হবে।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে মালু জিজ্ঞেস করল—

কে শাস্তি পাবে ঠাকুমা?

—কেউ না। চারটে বেজেছে রে?

—হ্যাঁ, এই বাজল ব'লে।

—ছেলেটাকে ডেকে যে তুটো কথা বলব তাও ও যমের পছন্দ হবে না।

—আপ্পুন্নী দাদার আসতে আর একটু দেরি হবে।

—লাভ কি? ও যম তো পেটের কাছাকাছিই থাকবে।

—ঠাকুর্দা তো বাড়ি নেই।

ঠাকুর্দাকে যম বলেছে তা মালু বুঝতে পেরেছে জেনে বুড়ীর ভালো লাগল না।

—তুই ঠিক জানিস যে তোর ঠাকুর্দা বাড়ি নেই?

—হ্যাঁ ঠাকুমা। ঠাকুর্দা আম্মিনী পিসীকে নিয়ে ও-বাড়িতে গেছে। পরশুদিন আসবে।

কবে গেল আর কবে এল আমার তাতে কিছু যায় আসে না।

ভাই বাড়িতে নেই। আপ্পুন্নীকে ডেকে একটু খবর দিলে কেমন হয়? কিন্তু বড়ো মেয়ে কুঞ্জুকুট্টির আবার ভালো লাগবে না। নিকুচি করেছে ওর ভালোলাগার। কুঞ্জুকুট্টিটা বড়ো পাজী। ছোটো-বেলায় ও কিন্তু এরকম ছিল না। তিন মেয়ের মধ্যে ওর মধ্যেই স্নেহ-ভালোবাসাটা একটু বেশি রকমই ছিল। যেদিন থেকে বামুনদের বাড়ি বিয়ের কথা হল সেদিন থেকে মেয়ে যেন একেবারে বদলে গেল। মেয়ের অবশ্য এ সম্বন্ধে একেবারে মত ছিল না কিন্তু মা আর মামার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কিছু বলতে পারে না তাই এখন তার সব শোধ নিচ্ছে।

—মালু।

—কি ঠাকুমা?

—তোর বড়োপিসী কোথায়?

—বড়োপিসী আর তাঙ্কদিদি পুকুরে চান করতে গেছে।

ঠাকুমা আস্তে আস্তে উঠল।

—তুইও আমার সঙ্গে আয়, বাগানের ঐ দিকটায় যেতে হবে।

মালুকে ধরে সিড়ি ভেঙে বুড়ী উঠোনে নেমে বাগানের এক পাশে গিয়ে দাঁড়াল। মালু বাইরে মাঠে দাঁড়াল, কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। কিছুক্ষণ পরে দূরে টোপিওকা চারাগাছগুলোর আড়ালে একটা সাদা সার্ট দেখা গেল, একটু কাছে এলে মালু বলল—

ঐ দেখ ঠাকুমা আপ্পুন্নী দাদা।

কিন্তু আপ্পুন্নী বাড়ির কাছাকাছি না এসে দূরে মাঠের আলগুলোর ওপর দিয়ে হাঁটতে লাগল।

—ওরে, ডাক্ ডাক্, ওকে একবার ডাক্। বল্ যে দিদিমা এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

মালু এক ছুট দিল। আপ্পুন্নী ঘেমে নেয়ে বই বগলে মুণ্ড

হাঁটুর ওপর তুলে হন্ হন্ করে হাঁটছে। মালু হাঁফাতে হাঁফাতে বলল,

—আপ্পুন্নী দাদা তোমাকে ডাকছে।

আপ্পুন্নী হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞেস করলো,

—কে ?

—ঠাকুমা। ঐ দেখো-না ওখানে দাঁড়িয়ে আছে।

—আমার বাড়ি ওদিক নয়।

—ঠাকুমা তোমাকে একবার ওদিকে আসতে বল্ছে।

—বললাম না আমি ও দিকে যাচ্ছি না।

আপ্পুন্নী খুব জোরে জোরে হাঁটতে লাগল। বেচারী মালু হতাশ হয়ে ঠাকুমার কাছে ফিরে এল। ঠাকুমা জিজ্ঞেস করলো—

কোথায় সে ?

—আসতে চাইল না ঠাকুমা।

—আমি ডাকছি বললি না।

—বললাম তো। তা 'আমার বাড়ি ওদিকে নয়' ব'লে তাড়াতাড়ি চলে গেল।

ঠাকুমা কিছু না বলে চুপচাপ কী যেন ভাবতে লাগল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল—

ও আর আসবে না। কোন্ লজ্জায়ই বা আসবে ?

চতুর্থ অধ্যায়

পরের দিন তিরুবাডীরা। ইউসুফের দোকানে খুব ভিড়। শঙ্করণ নায়ারের মনে পড়ল কিছু লঙ্কা কিনতে হবে। ও ইউসুফের দোকানের দিকে রওনা দিল। গ্রামের মধ্যে ইউসুফের দোকানটাই সবচেয়ে বড়ো। সরকারী জিনিসপত্র সব এই দোকানে পাওয়া যায়।

দোকানের বাইরের রকে গ্রামেব বেকাব লোকেদের ভিড়। দর্জির কলের কাছে কতকগুলো ছেলে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। মুলম্ মন্দিরের উৎসবের গল্প করছিল কয়েকটা লোক। কুঞ্জু আর বাপুট্টি নিজেদের মধ্যে কারবারের কী সব কথা যেন বলছিল। শঙ্করণ নায়ারকে দোকানে ঢুকতে দেখে সকলের কথাবার্তা বন্ধ হয়ে গেল। রামুন্নী জিজ্ঞেস করলো,

—কি শঙ্করণ নায়ার। তিরুবাডীরার জোগাড়জাগাড় কদ্দূর এগোলো?

—আমাদের আবার তিরুবাডীরা কী—ব'লে ও ভিড় ঠেলে দোকানীকে একপো শুকনো লঙ্কা দিতে বলল।

দোকানী বলল—এত অল্প লঙ্কায় কি হবে গো কত্তা?

—হ্যাঁ হ্যাঁ। ওই যথেষ্ট।

ইতিমধ্যে ভেলাপ্পন, রামুন্নী আর আসানকুট্টির মধ্যে চোখে চোখে কী কথাবার্তা হয়ে গেল। আসানকুট্টি বিড়ি ধরিয়ে একটু হেসে বলল,
—শঙ্করণ নায়ারের তো এখন খরচাখরচি একটু বেশি হওয়ার সময়, তাই না?

দোকানের মালিক ইউসুফ জিজ্ঞেস করল—কেন?

—ওকেই জিজ্ঞেস করো-না বাপু।

—তোর মাথা খারাপ। খবর কিছু থাকলে নায়ার আমাকে বলবে না, তা কি হয়?

আসানকুট্টি আবার বলল,

—তিরুবাড়ীরার উৎসব ওভাবে সারলে চলবে না নায়ার। শঙ্করণ নায়ারের পায়ের বুড়ো আঙুল থেকে একটা কাঁপুনি মাথা পর্যন্ত উঠে এল। ও একটাও কথা বলল না। দোকানী তখনও লঙ্কা ঠোঙায় ভরে নি। এবার বাপ্পুটিও এই কথাবার্তায় যোগ দিল,

—কি ইউসুফ কাকা, শঙ্করণ নায়ারের নতুন খবর কিছু আছে নাকি ?

—আমি জানি না বাপু। রামুন্নীকে জিজ্ঞেস করো। মনে হচ্ছে ও সব জানে।

—তাই নাকি ? তা শঙ্করণ নায়ার, আমরা সব এ সুখবর থেকে বাদ পড়লাম কেন ?

শঙ্করণ নায়ারের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে আসছিল। স্বরটাকে একটু নীচু করে বাপুট্টি বলল,

—তা ব্যাপারটা এমন কিছু খারাপ নয় শঙ্করণ নায়ার, মা আর ছেলে দুইই একসঙ্গে পাচ্ছে।

শঙ্করণ নায়ার এতক্ষণ চোখ পিটপিট করে একটা ভিজে মুরগীর মতো দাঁড়িয়েছিল। এবার ও ফিরে তাকাল। বাপুট্টি বিড়ি ধরিয়ে শয়তানীর হাসি হাসছে। শঙ্করণ নায়ার আর সহ্য করতে পারল না। ও বাপুট্টির ডান গালে প্রচণ্ড একটা চড় মারল।

ব্যাপারটা এমন আকস্মিক ভাবে ঘটল যে দোকানের লোকের কথাবার্তা, হাসিঠাট্টা সব হঠাৎ থেমে গেল। খরিদ্দারেরা সব এক পাশে ভয়ে ভয়ে ঘেঁষে দাঁড়াল।

বাপুট্টির চোখ দিয়ে আগুন বের হচ্ছে। ও সব-কিছু করতে পারে। তিনটে ফৌজদারী মামলার আসামী ছিল ও, একবার জেল খেটেও এসেছে। ও লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। কোমরের ছুরি তখন ওর হাতে।

সর্বনাশ ! ব'লে ইউসুফ চেঁচিয়ে উঠল। কিন্তু শঙ্করণ নায়ার যে ভয় পেয়েছে তার মনে হল না, ও বাপুট্টির হাতে ঝকঝকে ছুরি দেখেও চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। বাপুট্টি ওর ছুরিসুদ্ধু হাত

সবে ওপরে তুলেছে হঠাৎ একটা মোটা শক্ত হাত ওর হাত চেপে ধরল। সকলে তাকিয়ে দেখে সেয়তুআলি কুট্টি।

সেয়তুআলি কাকা, আমার হাত ছেড়ে দাও।

—ছুরি নীচে নামা।

—আমি যদি না এ নায়ারের নাড়ীভুড়ি ছিঁড়ে বার করি তো আমি বাপের ছেলে নই।

—বললাম না যে ছুরি নামিয়ে নে, নইলে আমার হাতে তোর…

বাপুট্টি একান্ত অনিচ্ছায় হাত নামিয়ে নিল। ও তখন হাঁপাচ্ছিল। সেয়তুআলি কুট্টি ছুরি আবার ওর বেল্টের মধ্যে গুঁজে রাখল। কঠোর স্বরে বলল—

এরকম ব্যবহার যেন আর কখনো না দেখি।

বাপুট্টি রক্তবর্ণ মুখে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

—নায়ার, তুমি এখান থেকে চলে যাও।

যেন কিছুই হয় নি এমনিভাবে শঙ্করণ নায়ার বেরিয়ে গেল। রাস্তায় ওর মনে নানারকম চিন্তার উদয় হল।

"সব পাজী বদমাইশের দল… এখন পারুকট্টির নামে যা তা বলে বেড়াবে।" এ কথা ভাবতেই ওর মনে হল দোষী যেন ওইই। এ অপবাদের জন্য দায়ী কি ও নিজে নয়? ও যে আপ্পুন্নীদের বাড়িতে যায় পারুকুট্টির সঙ্গে কথাবার্তা বলে তা গ্রামের লোকেরা সবই লক্ষ্য করেছে। শুধু শুধু আর ওরা বলছে না। কিন্তু দোষটাই বা কী করেছে? একটা অসহায় পরিবারকে সাহায্য করেছে—এই না? তার জন্যে পারুকুট্টির নামে…শঙ্করণ নায়ারের রক্ত যেন টগ্‌বগ্‌ করে ফুটতে লাগল। বেসরকারী মামার দোকানের সামনে এলে পর ওপর থেকে ডাক এল,

—শঙ্করণ একবার এদিকে এসো।

এড়াতে না পেরে শঙ্করণ নায়ার ওপরে উঠল।

—কি খবর শঙ্করণ?

শঙ্করণ নায়ার কিছু উত্তর দিল না।

—আচ্ছা খবর কিছু না থাকে তো এই পানটা একটু ছেঁচে দাও—ব'লে হামানদিস্তেটা ওর দিকে এগিয়ে দিল। পৃথিবী সুদ্ধু সকলের ওপর রাগ নিয়ে শঙ্করণ নায়ার খুব জোরে জোরে পান ছেঁচতে লাগল।

—আস্তে আস্তে, আমার হামানদিস্তেটা ভেঙো না।

শঙ্করণ নায়ার যেন ওর কথা শুনতে পেল না। ও ছাঁচা পান মামার হাতে দিল।

হ্যাঁ শঙ্করণ, শুনলাম আপ্পুন্নীর বাড়ির খবরাখবর তুমিই নাকি আজকাল নিচ্ছ?

শঙ্করণ নায়ারের জিভ যেন আটকে গেছে।

—কী হে ব্যাপারটা কী?

শঙ্করণের গলা থেকে একটা অস্পষ্ট আওয়াজ বের হল।

তা কতদিন ধরে এ-সব ব্যাপার চলছে শুনি?

মামার বয়স হয়েছে, পাড়ার সকলের মামা, কিছু বলারও উপায় নেই। ও খুব রাগ রাগ ভাবে বলল,

—এই কিছুদিন হল।

—না, তা এতে খারাপ কী আছে? মেয়েটা বড়োই অসহায়—তারপর বাইরে পানের পিক্ ফেলে বলল,

—তবে দেখো লোকে যেন বদনাম না করে। চারটে লোক ডেকে এ-সম্বন্ধ তো পাকা করে নিলেই হয়। শঙ্করণ নায়ারের কপালে ঘাম ফুটে উঠল। মামা বলছে কি?

—তোমার তো চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বছর হল। বিয়ে করতে দোষটাই বা কি?

শঙ্করণ নায়ার আর যেন ওখানে দাঁড়াতে পারবে না ব'লে মনে হল।

আমার একটু কাজ আছে। পরে আপনার সঙ্গে দেখা করব, ব'লে ও তাড়াতাড়ি ওখান থেকে পালিয়ে গেল।

সে রাতে ওর ঘুম হল না।

পরের দিন বামুনদের বাড়িতে ও পারুকুট্টির মুখের দিকে ভালো করে তাকাতে পর্যন্ত পারল না। একটার পর একটা ঘটনা ওর মনের মধ্যে ভেসে উঠল। আপ্পুন্নীকে স্কুলে ভর্তি করা, মাইনের টাকা ধার দেওয়া, বাড়িতে বেড়া তৈরি করে দেওয়া, মাঝে মাঝে গিয়ে খোজখবর নেওয়া, এমনি নানাভাবে ও ঐ অসহায় পরিবারটিকে সাহায্য করেছে। লোকে বলতে ছাড়বে কেন? তবে লোকে বললে ওর বয়ে গেল। ও কি লোকের বলা না-বলার ওপর নির্ভর করে বেঁচে আছে নাকি? কয়েকদিন পরে সমস্যার সমাধান যেন করতে পারল। সেদিন সন্ধে-বেলায় ও সকলের চোখের সামনে দিয়েই আপ্পুন্নীর বাড়ির দিকে হাঁটা দিল। দেখুক, সব লোকে দেখুক।

সূর্য অস্ত গেলেও চারি দিক তখনও অন্ধকার হয় নি। উঠোনে পা দিয়ে দেখতে পেল যে পারুকুট্টি সন্ধ্যাদীপ দেখানোর জন্যে প্রদীপ হাতে নিয়ে দরজা খুলে বাইরে আসছে। ছোট্ট প্রদীপটার আলো ওর সারা মুখে ছড়িয়ে পড়েছে। ও যে বামুনদের বাড়ির ঝি সে কথা যেন এখন বিশ্বাস করা যাচ্ছিল না। কাজ সেরে সন্ধেবেলায় চান করেছে। পিঠ ভর্তি চুল ছড়ানো। কপালে ভস্ম প্রদীপের আলোতে চিকচিক করছে। প্রদীপের ঐ স্বল্প আলোতে মুখখানি যেন বড়ো করুণ, বড়ো অসহায় দেখাচ্ছে।

ও যখন বারান্দায় উঠে বসল তখন আবার যেন একটা অপরাধ-বোধ ওকে চেপে ধরল। কিন্তু সব-কিছু চেপে কিছু একটা জিজ্ঞেস করার ভঙ্গীতে বলল।

সন্ধে দেখানোর সময় হল?

পারুকুট্টি বাঁ হাতে প্রদীপ ধরে ডানহাতে তার শিখাটা বাড়াতে বাড়াতে বলল,—হ্যাঁ। আপনি কি এখন কাজ থেকে ফিরছেন নাকি?

—বামুনদের বাড়ি থেকে আজ দুপুরেই ফিরেছি। দু-একটা কাজ ছিল। আপ্পুন্নীকে দেখছি না তো?

—চান করতে গেছে।

কথাবার্তা ওখানেই শেষ হয়ে গেল। পারুকুট্টি প্রদীপ নীচে নামিয়ে রেখে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল।

শঙ্করণ নায়ারের মনের মধ্যে কথাগুলো তখন ঘূর্ণিঝড়ের মতো পাক খেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বলবে কি বলবে না···সব-কিছু খোলাখুলি বলবে বলে খুব সাহস দেখিয়ে এ বাড়িতে ঢুকেছিল এখন যেন গলা আটকে গেছে। অনেক কষ্টে মুখ না তুলে ও বলল

—পারুকুট্টি আম্মা, আমি এখানে আসার জন্যে লোকে নানা কথা বলতে শুরু করেছে।

পারুকুট্টি খুব শান্তস্বরে বলল,

—লোকে তো কত কীই বলে।

শঙ্করণ নায়ারের এবার একটু সাহস হল।

—আমি চাই না যে আমার জন্যে আপনার বদনাম হয়।

পারুকুট্টি খুব অবাক হয়ে ওর দিকে তাকালে, তারপর বলল,

—আপনার সাহায্য আমি জীবনে ভুলব না।

শঙ্করণ নায়ারের আত্মবিশ্বাস যেন ফিরে এল,

—পারুকুট্টি আম্মা, কিছু মনে করবেন না আমি একটা কথা বলতে এসেছিলাম।

—কি কথা ?

—আপনাকে···আপনাকে সাহায্য করার কেউ নেই, আমিও ···আমিও অনেকদিন একা একা কাটাচ্ছি। যদি আপনার অমত না হয় তা হলে আমাদের মধ্যে একটা স্থায়ী বন্ধন···

—না, শঙ্করণ নায়ার।

খুব স্পষ্টস্বরে পারুকুট্টি বলল। এরপর শঙ্করণ নায়ার আর মুখ তুলতে পারল না।

—আমার ভাঙা কপাল, এ আর জোড়া লাগবে না। আপনি কিছু মনে করবেন না।

শঙ্করণ নায়ার চুপচাপ বসে রইল। সারা মন ওর কেমন যেন একটা অস্বস্তিতে ধূমায়িত হয়ে উঠছিল। এমন সময় সদর দরজার হঠাৎ একটা শব্দ হল। তাকিয়ে দেখে—আপ্পুন্নী। আপ্পুন্নী ত্ব-জনের কারুর দিকে না তাকিয়ে সোজা গিয়ে ঘরে ঢুকল।

শঙ্করণ নায়ার উঠল।

—আমি যা বলেছি তা ভুলে যান। আমারই দোষ…

পারুকুট্টি মুখ নীচ করে দাঁড়িয়েছিল।

—পারুকুট্টি আম্মা, আবার বলছি এ-সব কথা ভুলে যান। আর যখনই আমার সাহায্যের দরকার হবে তখনই আমাকে বলতে লজ্জা করবেন না।

পারুকুট্টির চোখ ত্বটো জলে ভরে উঠল। শঙ্করণ নায়ার আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল।

আপ্পুন্নী মেঝেতে বসে লণ্ঠনের আলোতে ওর স্কুলের পড়া তৈরি করছিল। নির্নিমেষ চোখে ছেলের দিকে তাকিয়ে পারুকুট্টি দরজা ধরে দাঁড়িয়ে রইল।

আপ্পুন্নী বড়ো হচ্ছে। ওর পনেরো বছর বয়স। কিন্তু দেখতে তার চেয়েও বড়ো লাগে। কিন্তু বড়ো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ও যেন দূরে চলে যাচ্ছে। আগের মতো বেশি কথাবার্তা বলে না। কিছু জিজ্ঞেস করলে, তার উত্তর দেয়। স্কুল থেকে বাড়ি ফিরেই আবার বাইরে বেরিয়ে যায়। কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়ায়। পাড়ার বুড়ী দিদির কাছে যায়। ওর হাবভাব দেখে মনে হয় ওর মন যেন এ পৃথিবীতে নেই। ঝট করে ওর আজকাল রাগ হয়ে যায়। ওকি বদলে যাচ্ছে? যতক্ষণ না খাওয়ার ডাক পড়ে ততক্ষণ বই মুখে নিয়ে বসে থাকে। খাওয়া-দাওয়ার পর যতক্ষণ ঘুম না আসে ততক্ষণ পড়ে, তারপর বাতি নিভিয়ে একসময় ঘুমিয়ে পড়ে। যা-কিছু পারুকুট্টি জিজ্ঞেস করে তাতেই উত্তর দেয় "কিছু না"। এই 'কিছু না' শুনলেই পারুকুট্টির মন ভয়ে ভরে ওঠে। হে ভগবান, ওর যেন কোনো অমঙ্গল না হয়।

* * *

সেদিন অকারণে হাঁটতে হাঁটতে আপ্পুন্নী নদীর ধারে একটা জায়গায় পৌঁছলো। ওখানটায় নদী ঘুরপাক্ খেয়ে ঘুরছে। গরম কালেও নদীর ঐ জায়গাটা বেশ গভীর। নদী এখন শুকিয়ে একটা ছোট্ট খালের মতো দেখাচ্ছে। বাঁকটার কাছে নদীর ঘূর্ণির কাছটায় বেশ খানিকটা জল শান্তভাবে বয়ে যাচ্ছে। আপ্পুন্নী নদীর উঁচু দিকটায় বসল। চারিদিক কী নিস্তব্ধ। কী শান্ত! শুধু নদীর ছোট্ট ছোট্ট ঢেউগুলো একটার পর একটা তীরে এসে আছড়ে পড়ে ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে। আজ ছুটি। কিন্তু বাড়িতে বসে থাকতে ভালো লাগছিল না। খেলাধুলোর সঙ্গী-সাথীও কেউ নেই। তাই বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা হাঁটছিল। হাঁটতে হাঁটতে এখানে এসে পৌঁছেছে। ছুটির দিনগুলো ওর বড়ো খারাপ লাগে। বাড়িতে বসে থাকতে পারে না। মাকে দেখলেই বুড়ী দিদির কথাগুলো মনে পড়ে যায় আর তখন ভীষণ রাগ হয়। বুড়ী দিদি যা বলেছে তা সব সত্যি। ও ইতিমধ্যে অনেক প্রমাণ পেয়েছে।

চান করতে পুকুরে গেলে লোকে ওকে দেখে কি ফুসফাস করে। ওর দিকে কেমন করে যেন তাকায়। ওকি আর এ-সবের মানে বোঝে না? কেন ঐ লোকটা ওদের বাড়িতে আসে? ওর মার সঙ্গে গল্প করে? লোকেরা যা বলাবলি করে তা শুনলে গায়ের চামড়া যেন খুলে যাবে বলে মনে হয়। ঐ লোকটা···ঐ লোকটা নাকি মাকে বিয়ে করতে যাচ্ছে।

কালকের ঘটনা ওর মনে পড়ছে। সন্ধের সময় মন্দিরের পুকুরে চান করতে গিয়েছিল। ছেলেদের ঘাটে খুব ভিড় দেখে ও অন্য একটা ঘাটে গিয়ে চান করছিল, কাছেই মেয়েদের ঘাট। একজন মহিলা আর-একজনকে জিজ্ঞেস করলো,

—কে রে ঐ ছেলেটা?

—পারুকুট্টির ছেলে।

তারপর ওরা কি বলবে এই ভয়ে ওর বুকের মধ্যে ধুক্‌ধুক্ করছিল। শুনতে চায় নি কিন্তু শুনতে হল।

—তেঙ্গুমপোট্টা শঙ্করণ নায়ারের এখনই তো ও-বাড়িতে যাওয়ার সময়—না ?

ও যে কি ভাবে চান করল, গা-মাথা মুছল কিছুতেই ওর খেয়াল ছিল না। কেমনভাবে পুকুরঘাট থেকে সোজা বাড়িতে এল তাও ওর মনে পড়ে না। বাড়ি এসে দেখল কি ? না বারান্দায় ঐ লোকটা বসে আর মা তার সঙ্গে গল্প করছে। প্রথমে ওর মনে হল শঙ্করণ নায়ারকে গলা ধাক্কা দিয়ে বার করে দেয়। ওর বাড়ি এটা, ওর বাবার বাড়ি। সে বাড়িতে বাইরের একটা লোক এসেছে মার সঙ্গে গোপন কথা বলতে— তা হলে···লোকে যা বলে সব সত্যি ? লোকটা শীঘ্রি মাকে বিয়ে করবে। বুক অবধি জল ভেঙে কাঁধে করে ওর মাকে নিয়ে এসেছিল ওর বাবা আর সেই বাবা মারা যাওয়ার পর এখন শঙ্করণ নায়ার···ওই লোকটা মার বর হবে আর এই বাড়ি থেকে ওর অস্তিত্ব সম্পূর্ণ মুছে যাবে···ওর নিজের বলে আর কিছুই থাকবে না। ওর মা অপরের বউ হবে। ওর বাড়িতে অপরে এসে বাস করবে। সকলেই ওর শত্রু, শঙ্করণ নায়ার, ভাস্করণ, দাদামশায়, সকলে সকলে। এখন মাও ওঁদের দলে গিয়ে ভিড়েছে। বাপের বাড়ির মান-ইজ্জত নষ্ট করেছে মা, আবার এ বাড়িরও মান-ইজ্জত নষ্ট করতে যাচ্ছে।

কতদিনের পুরোনো ঐ ভডাকেপাট বংশ ! ঐ নালুকেট্টুতে ও আজ ভাস্করণ আর কৃষ্ণণ কুট্টির মতো মাথা উঁচু করে বাস করতে পারত কিন্তু এখন···বন্ধুদের কাছে মাথা তুলতেও লজ্জা করে। বামুনদের বাড়িতে ঝি-এর ছেলে আর তেঙ্গুমপোট্টা শঙ্করণ নায়ারের বউ ওর মা। ও রাগে নদীতে খুব জোরে একটা ঢিল ছুঁড়ে উঠে দাঁড়াল। নদীর ধার দিয়ে আনমনে হাঁটছে এমন সময় ওর পেছনে একটা ডাক্ শুনতে পেল,

—আপ্পুন্নী।

গলার স্বর শুনেই আপ্পুন্নী বুঝতে পেরেছে যে শঙ্করণ নায়ার। ও ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে শঙ্করণ নায়ারের দিকে তাকাল।

—নদীর ধারে যে ?

—এমনি ।

—শুধু শুধু বেড়াতে এসেছ ?

—হ্যাঁ ।

ও হাঁটতে লাগল, পেছনে শঙ্করণ নায়ারও। বড়ো রাস্তায় এলে পর শঙ্করণ নায়ার ওর কাঁধে হাত দিয়ে হাঁটতে লাগল। আপ্পুন্নীর ভীষণ রাগ হচ্ছিল। ও মনে মনে বলতে লাগল— আপনি আমার কেউ না। আমি কোন্তুন্নী নায়ারের ছেলে আপ্পুন্নী— আমি আপনাকে ঘৃণা করি।

আপ্পুন্নী কপালে ঘামের ফোঁটা দেখা দিল। শঙ্করণ নায়ারকে এড়াবার জন্যে ও খুব তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগল। শঙ্করণ নায়ারও নিঃশব্দে ওর পেছন পেছন আসতে লাগল। আর ঠিক সেই সময়ে মাথায় তোয়ালে বেঁধে লুঙ্গি আর গেঞ্জি পরে বাপুট্টি ওদের সামনে এসে দাঁড়াল। মুখোমুখি হতে ওরা তিনজনই থেমে গেল। বাপুট্টি একবার শঙ্করণ নায়ারের দিকে তাকাল তারপর,

—বাপ আর ছেলে এক সঙ্গে কোথায় যাওয়া হচ্ছে ?—ব'লে পালিয়ে গেল।

আপ্পুন্নীর মনে হল ও যেন চরম অপমানে মরে গেছে। ও হিংস্রদৃষ্টিতে শঙ্করণ নায়ারের দিকে তাকাল যেন ওকে এক্ষুনি খুন করবে। শঙ্করণ নায়ারের চোখ দুটো মাটিতে আটকে গেছে, ও নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আপ্পুন্নী নিজেকে সংযত করে বাড়ির দিকে হাঁটা দিল। বাঁড়ি গিয়ে লুকিয়ে একবার কাঁদতে ইচ্ছে করল। ও ঘরে গিয়ে বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ল।

রাতে মা এসে ডাকতেও ও উঠল না। ভাত বেড়ে পারুকুট্টি অনেকবার ছেলেকে ডাকল তারপর জিজ্ঞেস করল,

—কিরে, তোর মাথা ব্যথা করছে ?

কোনো উত্তর নেই।

—আপ্পুন্নী, ভাত বেড়েছি।

তারও কোনো উত্তর নেই।

ওর মা ওর গায়ে হাত রাখতেই ও লাফিয়ে উঠে পাগলের মতো বলতে লাগল— আমাকে ছুঁয়ো না...ছুঁয়ো না।

পারুকুট্টি চমকে উঠল। ভয়বিহ্বল স্বরে জিজ্ঞেস করল—খোকা, তোর হয়েছে কি ?

তখনও আপ্পুন্নী বলে চলেছে 'আমায় ছুঁয়ো না, আমায় ছুঁয়ো না'।

সে রাতে মা আর ছেলে দুজনেই কিছু খেল না। দুজনে পাশাপাশি শুল কিন্তু কেউ কারুর সঙ্গে একটা কথাও বলল না। শুধু মায়ের ফোঁপানি রাত্রির সেই ঠাণ্ডা নিস্তব্ধতার বুকে যেন আঁচড় কাটতে লাগল।

খুব ভোরে আপ্পুন্নী উঠল। তখনও অন্ধকার। মা বিছানায় চোখ বন্ধ করে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। হয়তো ঘুমোয় নি। ও তাড়াতাড়ি জামা পরল। বাঁশের আলনা থেকে বাকী আর সার্ট আর মুণ্ড নিয়ে বই-এর ব্যাগের মধ্যে ভরল, ও যখন দরজার কাছে তখন মার খোলা চোখ দুটি ও দেখতে পেল। উঠে বসে খুব ক্লান্ত স্বরে মা জিজ্ঞেস করলো—

এত ভোরে কোথায় যাচ্ছিস ?

—আমি চলে যাচ্ছি।

—খোকা— ডাক নয় এক আর্তনাদ।

—খোকা কোথায় যাচ্ছিস ?

—যেখানে দুচোখ যায় ?

—খোকা আমাকে একা ফেলে কোথায় যাবি ?

—কেন, একা কেন ? তোমার··· তোমার তো শঙ্করণ নায়ার আছে।

ও সজোরে দরজা খুলে উঠোনে নামল।

—আপ্পুন্নী !

ও ফিরে তাকাল না। সারা শরীর ওর কাঁপছে। তবুও আপ্পুন্নী

তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগল। পেছনে মার কান্না ভরা ডাক তখনও শোনা যাচ্ছে।

*　*　*

ছোটো টিলাটার ওপরের ঢালুতে কতকগুলো লতাপাতার আড়ালে ঢাকা পাথরটার ওপরে আপ্পুন্নী বসে ছিল। সকাল থেকে ও এখানে বসে আছে। জায়গাটা নির্জন। এখানে কারুর সঙ্গে দেখা হওয়ার ভয় নেই। কাউকে কৈফিয়ৎ দেবার দরকার নেই। দূরে মাঠে কতকগুলো ছাগল চরে বেড়াচ্ছে। রোদ বেশ তেতে উঠেছে। ওর সারা শরীর ঘামে নেয়ে উঠেছে। হঠাৎ দূর থেকে কে যেন আসছে দেখে আপ্পুন্নী উঠে পশ্চিম দিকে হাঁটতে শুরু করল। কতক্ষণ হেঁটেছে ঠিক নেই, কিন্তু বড্ড ক্লান্তি বোধ করতে লাগল। একটা গাছের ছায়ায় বসে খানিকক্ষণ জিরিয়ে নেবে ভাবল।

দূরের আঁকাবাঁকা রাস্তাটায় একটা ছাতা দেখা গেল। কে এইদিকেই আসছে সেটা ওর নজরে পড়ল না। লোকটা যখন ওর কাছাকাছি এল তখন একবার মুখ তুলে দেখলও না। লোকটা ওকে পেরিয়ে গিয়ে হঠাৎ থেমে পড়ল। তারপর বলল—

আরে নায়ারদের ছেলে না?

সেয়দ্ আলি কুট্টি।

আপ্পুন্নী ওর ক্লান্ত চোখদুটি দিয়ে একবার ওকে দেখল। হঠাৎ ওর মনে হল যেদিন নালুকেট্টু থেকে অপমানিত হয়ে বেরিয়ে এসেছিল সেদিনও এই টিলাটার কাছে ওর সঙ্গে দেখা হয়েছিল সেয়দ্ আলি কুঁট্টির। আশ্চর্য!

—কী ব্যাপার? এখানে কী করছ খোকা?

মন ভারী হয়ে আছে। কাঁদবে না ভেবেও চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।

—আপ্পুন্নী, কাঁদছ কেন?

ও কোনো উত্তর দিল না।

—এ রাস্তায় কেন?

—এমনি।

—স্কুলে যাও নি?

—না।

—জনমনিষ্যি নেই, এই টিলার ওপর একা একা কী করছ? তারও কোনো উত্তর নেই।

সেয়তু আলি কুট্টি ছাতা আর ব্যাগ নীচে নামিয়ে রেখে ওর কাছে এল— কোথায় যাচ্ছ বলো।

—যেদিকে ত্বচোখ যায়।

—যেদিকে খুশি কি যাওয়া যায়? এসো, আমার সঙ্গে এসো।

—আমি যাব না।

সেয়তু আলি কুট্টির গলার স্বর বদলে গেল। বেশ দৃঢ় স্বরে বলল,

—তা হলে কোথায় যাচ্ছ বলো, আমিও তোমার সঙ্গে যাব। নইলে আমার সঙ্গে এসো। আমি এখন বিয়েবাড়িতে যাচ্ছি। ওখানে আজ থেকে কাল বাড়ি যেয়ো।

নেমন্তন্ন···বিয়েবাড়ি···মাংস পরোটা। মাংসের স্বাদটা ভালো না—বুড়ো খাসী কিনা, সাদা বিষ, সাদা বিষ।

—আমি যাব না।

সেয়তু আলি কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল,

—কখন বাড়ি থেকে বেরিয়েছ?

—সকালে।

—বাড়ি ফিরবে কখন?

—বাড়ি আর ফিরব না। ও-বাড়ি আমার বাড়ি নয়।

সেয়তু আলি কুট্টি অবাক্ হল ওর কথা শুনে। তারপর বলল,

—কেন ও বাড়ি তোমার নয় কেন? তোমার বাড়ি তোমার মা। তুমি ছাড়া মার আর কেউ নেই।

—আমি না গেলেও মার কিছু হবে না, মার অন্য লোক আছে।

সেয়তু আলি কুট্টি এবার আরও বেশি অবাক হল। তারপর বলল,

—তুমি দেখছি তোমার বাপের মতোই জেদী। তা মার সঙ্গে ঝগড়া করে কি এই পাহাড়ের ওপর বসে থাকবে নাকি ?

'কোথায় যাব' এমনি প্রশ্ন নিয়ে আপ্পুন্নী ওর দিকে তাকাল।

—এক কাজ করো। দুদিন কোথাও কাটিয়ে তারপর বাড়ি যাও। তখন রাগটাগ সব পড়ে যাবে।

আপ্পুন্নীর ভীষণ রাগ হল এই কথায়। জিজ্ঞেস করল,

—আমি কোথায় যাব ?

—যাও, ভডাকেপাটে যাও, ওটাও তো তোমার বাড়ি।

—ভডাকেপাটে ? ওখান থেকে আমাকে না গলা ধাক্কা দিয়ে বার করে দিয়েছে ?

—তা দিক। তোমার ও-বাড়িতে অধিকার আছে। শুধু চাই সাহস আর মনের জোর। যাও, ও বাড়িতে যাও। যদি চলে যেতে বলে তো বলবে 'যাব না'।

—বাড়ির কাছাকাছি দেখলে পায়ের হাড় ভেঙে দেবে বলেছে।

—দেখা যাবে কেমন হাড় ভেঙে দেয়। দেশে কোর্ট উকিল তা হলে আছে কি জন্যে ?

আপ্পুন্নী চুপ করে রইল।

ওরকম ভাবে চুপচাপ বসে থাকলে চলবে না। হয় বাড়ি যাও, নয়তো ভডাকেপাটের বাড়িতে যাও। দুটোর একটায় না গেলে আমি তোমাকে ছাড়ব না।

আপ্পুন্নী উঠে দাঁড়াল।

—আমি যাচ্ছি।

—কোথায় ?

দৃঢ় গলায় ও বলল,

—আমাদের পরিবারে— ভডাকেপাটে।

—হ্যাঁ যাও।

দুজনে হাঁটতে লাগল। নালুকেট্টুর কাছাকাছি এলে সেয়দু আলি কুট্টি বলল,

—সোজা চলে যাও। তবে একটা কথা বলি শোনো। রাগ পড়ে গেলে মার কাছে যেয়ো। মার তুমি ছাড়া আর কেউ নেই।

আপ্পুন্নী কিছু বলল না। সেয়দু আলি চলে যাওয়ার পর ও ধাক্কা দিয়ে গেটটা খুলল। গেটের পর খানিকটা উঠোন মতো তারপর লাল ইঁটের সিঁড়ি একটার পর একটা ওপরে উঠে গেছে। দুপাশে দেওয়াল, শ্যাওলায় ভরা এখানে ওখানে ভেঙে গেছে। বাড়ির সামনে একটা বেলগাছ তার তলাটা সিমেণ্ট দিয়ে বাঁধানো আর দক্ষিণ দিকে গোলাবাড়ি। একমুহূর্ত ও দ্বিধা করল তারপর সিঁড়ি বেয়ে ওপরের উঠোনে নামল। বাইরের উঠোনে তখন কেউ ছিল না।

দাদামশায় বোধহয় গোলাবাড়ির ওপর থেকে ওকে দেখছেন। দেখুন—দেখুন যে গলা ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া আপ্পুন্নী আবার ফিরে এসেছে। ও বারান্দায় উঠল। ঘরের দরজার কাছে একটা মাথা উঁকি মেরে চলে গেল। আপ্পুন্নী বইগুলো বারান্দায় নামিয়ে রাখতে শুনতে পেল,

—কে?

—আমি।

মনে মনে বলতে লাগল— আমার এখন সাহস চাই, আমাকে এখন বাবার মতো বেপরোয়া হতে হবে।

বড়োমাসী—ভাস্করণদাদার মা। যেন ওকে চেনে না, এমনিভাবে জিজ্ঞেস করল—

কী চাই?

তক্ষুনি উত্তর জোগাল না। এক মিনিট ভেবে বলল,

—দিদিমার সঙ্গে দেখা করতে চাই।

ঠিক সেই সময় মালু ওখানে এসে ওকে দেখে আবার ভেতরে ঢুকে গেল।

—আপ্পুন্নী!

বাড়ির দক্ষিণ দিক থেকে দিদিমা আসছে। মনে আর কোনো

দ্বিধা বা ভয় নেই। ও ছুটে দিদিমার কাছে গেল। দিদিমার কাছে দাঁড়াতেই ওর সমস্ত মন যেন কী একটা আনন্দে ভরে গেল। দিদিমা তার জরাগ্রস্ত হাত দুটি দিয়ে ওর মাথায় আর গায়ে হাত বুলিয়ে বলল,

—আহা! তোকে একটু দেখার জন্যে মনটা আমার ছটফট করছিল রে।

আপ্পুন্নী দিদিমার সঙ্গে বাড়ির ভেতর ঢুকল। তাঙ্কদিদি রান্নাঘরের দিকে যাওয়ার সময় ওর দিকে একবার তাকাল। ও কি বাঘ না ভালুক যে ওকে ওরকম হাঁ করে দেখছে?

বড়োমাসী নিজের প্রতাপ জাহির করার জন্য বার দুই ধুমধাম শব্দ করে সামনে দিয়ে ঘুরে গেল। যারা শোনবার শুনুক এমনভাবে বলল,

—মামা এলে মজা দেখতে পাবে।

তাতে কেউ কোনো উত্তর দিল না দেখে আপ্পুন্নীর দিকে তাকিয়ে রুক্ষ স্বরে বলল,

—সেদিনকার গলা ধাক্কা এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেলি?

—ভুলি নি।

—তা হলে আবার এ বাড়িতে পা দিয়েছিস যে?

আপ্পুন্নীর মুখ কালো হয়ে উঠল।

—মামা কখন বাড়ি আসবে ঠিক নেই। যা, তাড়াতাড়ি এখান থেকে চলে যা।

—আমি যাব না।

—কী?

—বললাম তো আমি যাব না।

ওর সাহস দেখে বড়োমাসী কিছুক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর চুলগুলো বাঁধতে বাঁধতে আপনার মনে কি বিড়বিড় করতে করতে চলে গেল। আপ্পুন্নী দিদিমার দিকে চাইল। ঐ জরাগ্রস্তা লোলচর্মা বৃদ্ধাকে দেখে ওর স্বর কোমল হয়ে এল-

—আমি এখানে থাকব দিদিমা।

ভেবেছিল দিদিমা হয়তো এ কথা শুনে ভয় পেয়ে যাবে কিন্তু দিদিমা শুধু বলল,

—থাক্।

দিদিমার ঐ একটা কথা শুনে জরাজীর্ণ ঐ দেহটাকে একবার জড়িয়ে ধরে আপ্পুন্নীর কাঁদতে ইচ্ছে করল।

দাদামশায় আগের দিন তাঁর বউয়ের বাড়িতে গেছেন, যে-কোনো সময় আসতে পারেন। এলে যে কি এলাহী কাণ্ড হবে, তাই ভেবে ভয়ে সকলে সারা হচ্ছিল। এই ভয় যেন ধোঁয়ার মতো সারা বাড়িতে ছড়িয়ে পড়েছিল।

মালু কৃষ্ণণ কুট্টির ওপর নজর রাখছিল। ঠাকুর্দা এলে ঐ সকলের আগে গিয়ে খবরটা দেবে। ঠাকুর্দা ওকে একটু ভালোও বাসে। বাড়িতে যদি একটা পেঁপেও পড়ে তো সঙ্গে সঙ্গে খবর চলে যাবে গোলাবাড়িতে ঠাকুর্দার কাছে।

কিছুক্ষণ পরে আপ্পুন্নীর নিজের ওপর কেমন যেন একটা বিশ্বাস এল—নাঃ অত তাড়াতাড়ি ও কাবু হবে না। দাদামশায় আসুন, ওকে যত খুশি বকুন। গলা ধাক্কা দিয়ে আবার ওকে বের করে দিন, তবুও যাবে না।

দাদামশায় পরের দিন সন্ধেবেলায় এলেন। দাদামশায়ের সঙ্গে তাঁর আদুরে মেয়ে অম্মিনীমাসীও, আপ্পুন্নী যে আবার এসেছে তা দাদামশায় শীঘ্রিই জানতে পারলেন।

—কে ঘরের মধ্যে!

উঠোন থেকেই চীৎকার শোনা গেল। সকলে ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এসে জড়ো হল— দিদিমা, বড়োমাসী, মীনাক্ষীমাসী, তাঙ্কদিদি, মালু— সকলে।

—কার এত বড়ো সাহস যে আমার হুকুম অমান্য করে ওকে আবার বাড়ির ভেতর ঢুকতে দিয়েছে?

কেউ কোনো উত্তর দিল না।

—কোথায় সেই হারামজাদা ?

তখন আপ্পুন্নী আস্তে আস্তে বেরিয়ে এল। ওর সারা শরীর কাঁপছিল। ওকে দেখামাত্র দাদামশায় খড়ম তুটো উঠোনে রেখে বারান্দায় লাফ দিয়ে উঠলেন।

—দাঁড়া হারামজাদা তোকে আমি···

দাদামশায় আর ওর মাঝখানে দিদিমা এসে দাঁড়িয়ে চীৎকার করল,

—কুঞ্জীকৃষ্ণণ।

—সরে দাঁড়াও। ওকে আজ আমি একেবারে শেষ করে ফেলব, বলে দিদিমাকে এক ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দাতু ওর সামনে এসে দাঁড়াতে ও ওর সমস্ত সাহস সঞ্চয় করে বলল,

—আমার গায়ে হাত দেবেন না।

—কেন কি হবে তোর গায়ে হাত দিলে···

বাক্য অসমাপ্ত রইল। একখানা হাত আপ্পুন্নীর বাঁ গালে ঠকাস করে পড়ল। তারপর আর একবার হাত তুলতেই বেশ কর্কশ স্বরে কে যেন বলে উঠল,

—ছেলেটাকে মেরো না।

দাদামশায় তুই চোখে অসীম ক্রোধ দিয়ে তাকিয়ে দেখেন ভাগনে। কুট্টামামা বারান্দায় এসে বলল,

—আমি তোমায় বারণ করছি, ছেলেটার গায়ে হাত দিয়ো না।

দাদামশায়ের হাত নীচে নামল।

—তুই আমাকে হুকুম করার কে ?

—আমি যেই হই না কেন। ছেলেটাকে মারধর কোরো না, তোমায় বললাম। করলে এখানেই তার শেষ হবে না।

দাদামশায় ভাগনের দিকে তাকিয়ে তাচ্ছিল্য ভরা স্বরে বললেন,

—ফুঃ তোর আবার এত বাড় বেড়েছে যে তুই আমাকে শাসন করতে আসিস ?

তখন কুট্টামামা খুব গম্ভীর স্বরে বলল,

—তোমার বয়সের মর্যাদা আমি দেব না কিন্তু।

সাপের ফণা গুটিয়ে নেওয়ার মতো দাদামশায়ও যেন মিইয়ে গেলেন। বড়োমাসী, মীনাক্ষীমাসী, তাঙ্কদিদি পরস্পরের দিকে চাওয়াচাওয়ি করল।

কী যে করবেন ঠিক না করতে পেরে দাদামশায় কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন তারপর উঠোনে নামতে নামতে বললেন,

ঠিক আছে, এর শোধ আমি নেব।

তারপর নিজের মনে কী যেন বিড়বিড় করতে করতে সোজা গোলাবাড়ির ওপরে গিয়ে উঠলেন।

সন্ধেবেলায় ও পুবদিকের বারান্দায় বসে ছিল। একা একা বসে সকালের সমস্ত ঘটনা একের পর এক মনে পড়তে লাগল। সকালের ঘটনা যেন কতদিন আগেকার ঘটনা বলে মনে হচ্ছিল। আবছা অন্ধকারে কে যেন এসে দাঁড়াল।

—আপ্পুন্নী।

আম্মিনী মাসী। ও ওর বাঁ গালে একবার হাত বুলোলে, তখনও জায়গাটায় ব্যথা করছিল,

—আপ্পুন্নী, খুব লেগেছে?

ওর ভীষণ রাগ হল। বাবা মেরেছে আর মেয়ে সহানুভূতি দেখাতে এসেছে।

—কি রে আপ্পুন্নী, কথা বলছিস না যে?

আর তখনই বড়োমাসী ভেতর থেকে ডাক দিল,

—আম্মিনী।

আম্মিনী তাড়াতাড়ি ভেতরে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরে মালু ওকে খেতে ডাকল। রান্নাঘরে কুট্টামামা, মেসোমশায়, ভাস্করণ আর কৃষ্ণণকুট্টির সঙ্গে ওরও ভাত বাড়া হয়েছে। তবে ওদের পাতাগুলো বেশ বড়ো বড়ো আর ওরটা ছোটো।

রান্নাঘরের কাছে একটা ছোট্ট ঘরে ও শোওয়ার জায়গা পেল।

নালুকেট্টু এখন অন্ধকারের নিস্তব্ধতায় ডুবে গেছে। একা একা

এই ছোট্ট ঘরটায় শুয়ে ওর ভয় করছিল। এ বাড়ির মৃত পিতৃ-পুরুষদের আত্মারা সব চারি দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে হয়তো। ওপরে ঠাকুর ঘরে দেবী ভগবতীর পায়ে নূপুরের শব্দ যেন শোনা যাচ্ছে। ভাবতে ভাবতে শরীর আর মন যখন একেবারে অবশ হয়ে এল তখন কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে জানতেই পারল না।

সকালবেলায় বাড়ির অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে ওকেও ফেনাভাত দিয়ে দিদিমা ডাকতে এল। একটু সকাল সকাল আপ্পুন্নী স্কুলে রওনা হল। যাওয়ার সময় ও দিদিমার ঘরের কাছে 'দিদিমা আমি যাচ্ছি' বলে রওনা দিল। বিকেলে স্কুল থেকে ফেরার সময় উঠোনে দাদামশায় পায়চারি করছেন দেখতে পেল। ওকে দেখতে পেয়েও না-দেখার ভান করে দাদামশায় অন্য দিকে তাকিয়ে পায়চারি করতে লাগলেন। ও যখন মেয়েমহলে ঢুকল তখন শুনতে পেল দাদামশায় বলছেন,

—এ পরিবার উচ্ছন্নে যাবে। কোনো আচার-বিচার নেই। বাড়িতে যে কুলদেবতা ভগবতী আছেন সেদিকে কারুর নজর নেই।

সেদিন রাতে মীনাক্ষী মাসী ওকে বলল, স্কুল থেকে ফেরার সময়ে ও যেন রান্নাঘরের পাশ দিয়ে বাড়ি ঢোকে। স্কুলের কাপড়-চোপড় পরে ভগবতীর ঘরের সামনে দিয়ে আসাটা ঠিক নয়।

পরের দিন গোলাবাড়ি থেকে ধান বের করে দেবার দিন। সপ্তাহে একবার করে গোলাবাড়ি থেকে সারা সংসারের খরচের জন্য ধান দেওয়া হয়। সকালে মীনাক্ষী মাসী ধান নেবার জন্যে গোলাবাড়ি এলে দাদামশায় বললেন,

—এ বাড়ির কাজকম্মো দেখার আর-একজন তো আছে, সে এসে ধান মেপে দিক।

মীনাক্ষী মাসী দ্বিধাগ্রস্তভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখে দাদামশায় বললেন,

—আমি একমুঠো ধানও এখান থেকে বের করে দেব না। দেখি তোদের শিক্ষা হয় কিনা?

বাড়ির ভেতর থেকে বড়োমাসী চীৎকার করে উঠল,

—ও মা কি হবে গো! না খেতে পেয়ে যে মরে যাব গো।

কুট্টামামা মাঠ থেকে আসার পর সব শুনতে পেল। মালুই বাবাকে সব বলেছে। কুট্টামামা সোজা গোলাবাড়ির দিকে যাওয়ার সময় দিদিমা বাধা দিল। তখন কুট্টামামা বলল,

—এতদিন আমি সহ্য করেছি কিন্তু আর নয়। আমারও এ বাড়িতে অধিকার আছে কিনা দেখি।

গোলাবাড়ির ওপরের ঘরে চেঁচামেচি শোনা গেল।

—গোলাঘর আমি খুলব না, তুই আমাকে হুকুম করার কে?

বাড়ির মেয়েরা সব ভেতরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে শুনছিল।

—আমি—আমি এ সংসারের একজন পুরুষ। সকাল থেকে সন্ধে অবধি মুখের রক্ত উঠিয়ে খাটছি বলেই এ সংসারের চোদ্দগুষ্টির পিণ্ডি জোগাড় হচ্ছে।

তারপর কুট্টামামা দাদামশায়ের শ্বশুরবাড়ির কথা তুলে কী সব যেন কটাক্ষ করল। দাদু গোলাঘরের সিন্ধুকের চাবি দিলেন না। তখন কুট্টামামা গোলাঘর থেকে ধানের বীজ নিয়ে মেপে দিল। মীনাক্ষী মাসীকে দ্বিধাগ্রস্তভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কুট্টামামা মাসীকে খুব বকুনি দিল।

ধানের বীজ সংসারের খাওয়ার জন্য খরচ হচ্ছে দেখে দিদিমার খুব মন খারাপ হয়ে গেল। কুট্টামামা দিদিমাকে পষ্টাপষ্টি বলল,

—হয় এর একটা সুরাহা চাই নয় আমার ভাগ আমার চাই। এই আমার হক্ কথা। এর থেকে আমি একচুলও নড়ব না।

সব-কিছুর হিসেবনিকেশ যে একদিন করতে হবে তা কুট্টন নায়ারের জানা ছিল কিন্তু সে হিসেব নিকেশের দিন যে এত তাড়াতাড়ি আসবে তা সে ভাবতে পারে নি। পনেরো ষোলো বছর থেকে মাঠে কাজ করতে নেমেছে। আজ কুড়ি বছরেরও বেশি হল কঠিন পরিশ্রম করে চলেছে। তবুও আজ ওর একখানা ভালো মুণ্ড পর্যন্ত নেই। বছরে চারটে সাধারণ মুণ্ড, দুটো তোয়ালে আর

পঞ্চাশ সের ধান ওর পারিশ্রমিক। খেত-মজুরদের অবস্থা এর চেয়ে ভালো। তাদের বচ্ছরকালের পরবে নতুন মুণ্ড, চাল, নারকেল আরও কত কী দেওয়া হয়। ওদের অবস্থা যেন ওর চেয়েও ভালো। তফাত শুধু ও বড়ো বংশের ছেলে— তাতে লাভটা কি? মালুর কথা ভাবলে সত্যিই কষ্ট হয়। আর দু-তিন বছরের মধ্যে মালু পূর্ণ যুবতী হয়ে দাঁড়াবে। ওর গলায় বা কানে এক ফোঁটা সোনা নেই। এ বাড়িতে ওর সঙ্গে ঠিক যেন ঝিয়ের মতো ব্যবহার করা হয়। সকাল আর সন্ধেয় মালুকে বড়ো বড়ো ঘড়া করে জল বয়ে নিয়ে যেতে দেখেছে ও। মালুর এখানে থাকাটা মালুর বড়োপিসীর আবার পছন্দ নয়। মামার মেয়েও তো এ বাড়িতে আছে কিন্তু গোলাবাড়ি থেকে সে নামবে না। বোনেরও তো একটা মেয়ে আছে কিন্তু সে কুটোটি ভেঙে দুখান করবে না। সব-কিছুতে মীণাক্ষী আর মালু। সমস্ত কিছুই ও সহ্য করে যাচ্ছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর পারল না। আপ্পুন্নী যে এ বাড়িতে এসেছিল তা ও জানত না। আপ্পুন্নীর ওপর ওর ভালোবাসা বা ঘৃণা কিছুই নেই। কিন্তু মামা আপ্পুন্নীকে গলা ধাক্কা দিয়ে বার করে দিয়েছে শুনে ওর একটু কষ্ট হয়েছিল। ছেলেটা তো জন্তু-জানোয়ার নয় আর তা ছাড়া এ বংশের ছেলে। কেউ কিছু টুঁ শব্দ করে না বলে মামা যা খুশি তাই করবে নাকি? আবার ওর মালুর কথা মনে হল। মানুষের অবস্থা কবে কী হয় কিছুই বলা যায় না। আজ যদি ও চোখ বোজে তা হলে কাল মালুর অবস্থাও আপ্পুন্নীর মতো হবে। ওকেও গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দেবে— ওরও এ বাড়িতে অধিকার নেই।*

সেদিন সন্ধেবেলায় বাড়ি এসে কি দেখল? একটা বাচ্চা ছেলেকে এখনি মেরে গুঁড়ো গুঁড়ো করে দেবে বলে মনে হল। আর ও সহ্য করতে পারল না, এতদিনকার আটকে রাখা বিক্ষোভ সিংহ গর্জনে বেরিয়ে এল। গোলমাল শুরু হয়ে গেছে। গোলাঘর থেকে,

*মাতৃমুখ্য সমাজে বাবার বাড়িতে ছেলেমেয়ের অধিকার নেই।

ধান বার করে দেবে না। ধানের সিন্ধুক বন্ধ করে চাবি কোমরে বেঁধে নিয়ে ঘুরছে। ধান সব বিক্রি করে দেবে বলে শাসিয়েছে। বাড়ির সকলকে ভাতে মেরে করুক ধান বিক্রি। দেখা যাক্ কতদূর গড়ায়। ভড়াকেপাট বংশে শুধু একজনেরই নয়—আরও অনেকেরই অধিকার আছে এ কথা মামার জানার সময় এসেছে।

পঞ্চম অধ্যায়

আজ প্রায় চার-পাঁচদিন হল ঘোর বর্ষা নেমেছে। প্রচণ্ড ঝড়ের সঙ্গে বাজপড়া বৃষ্টি নয়। কালো আকাশের বুক থেকে শুধু অঝোর ধারায় বৃষ্টি ঝরছে।

পারুকুট্টি বারান্দায় চুপচাপ বসে বৃষ্টিপড়া দেখছিল। বামুনদের বাড়িতে আজ কদিন কাজ নেই। বৃষ্টি বন্ধ হলে ধান সেদ্ধ করা হবে বলে বউ বলেছে। বেড়ার বাইরে কাঁচা সড়কটা কাদায় ভর্তি হয়ে গেছে। সেই সড়কের দিকে তাকিয়ে পারুকুট্টি ভাবছিল—আপ্পুন্নী তো এল না।

আপ্পুন্নী কি আর ফিরবে না?

সেদিন সকালে যখন আপ্পুন্নী চলে গেল সে যে একেবারেই চলে গেল তা পারুকুট্টি ভাবতে পারে নি। স্কুলে ছুটি হবার পর ঠিক ফিরে আসবে ভেবেছিল কিন্তু সন্ধে হয়ে গেল তবু আপ্পুন্নী ফিরল না। অনেককে সেদিন জিজ্ঞেস করেছিল কিন্তু কেউই আপ্পুন্নীকে দেখে নি। সেদিন সন্ধ্যায় কাঁদতে কাঁদতে ছেলের খোঁজে এখানে-ওখানে ছোটাছুটি করেছে। কিছু দূরে কাদের আলির বাড়ি। তার ছেলে আপ্পুন্নীর সঙ্গে পড়ে। অন্ধকার হলে আর বেরোনো যাবে না বলে প্রায় ছুটতে ছুটতে কাদের আলির বাড়ি গিয়ে ছেলের খোঁজ করেছে। কাদের আলির ছেলে মহম্মদের কাছ থেকে জানতে পারল যে আপ্পুন্নী সেদিন নাকি স্কুলে আসে নি। শুনে পারুকুট্টি মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছিল।

বাড়ি ফিরে প্রদীপ জ্বালিয়ে ছেলের জন্য সদর দরজায় দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছিল। শঙ্করণ নায়ার এলে তাকে ছেলের খোঁজে পাঠাতে পারত কিন্তু শঙ্করণ নায়ার আজকাল আর ও-পথে আসে না। সেদিনের সেই কথাবার্তার পর শঙ্করণ নায়ার আর ওর বাড়িতে পা দেয় নি, শঙ্করণ নায়ারও আর আসবে না।

বামুনদের বাড়ি কাজ করবার সময় ওর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখার সাহসও পারুকুট্টির হয় নি।

কাকে যে ওর দুঃখের কথা বলবে? আজ বেশ কিছুদিন হল বুড়ী দিদিও ওর কুঁড়েঘরে নেই। সেদিন সারারাত লণ্ঠন জ্বালিয়ে ছেলের ফেরার প্রতীক্ষায় জেগে ছিল কিন্তু ছেলে ফিরে এল না। কেমন করে যে সে রাত প্রভাত হল তাও ওর মনে নেই।

বুড়ী দিদি কদিন পরেই এল। বুড়ী বলার পর জানতে পারল যে আপ্পুন্নী নালুকেট্টুতে গিয়ে উঠেছে। বুড়ীকে বলেছে চাকাম্মা আর চাকাম্মাকে বলেছে সেয়দু আলি কুট্টি। আপ্পুন্নী ভডাকেপাটের বাড়িতে গিয়ে উঠবে এ কথা পারুকুট্টির বিশ্বাস হল না। ওই বাড়ি থেকে ওকে না অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছিল? নাঃ আপ্পুন্নী ও বাড়িতে থাকবে না, ঠিক ফিরে আসবে। বামুনদের বাড়ি কাজ করার সময় বউ জিজ্ঞেস করেছিল,

—হ্যাঁরে পারু, ছেলে তোর ফিরেছে?

—শিগ্‌গির ফিরবে—উত্তর দিয়েছিল।

লোকে তা হলে জেনে গেছে যে ছেলে তার ঝগড়া করে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে।

সন্ধ্যার সময় যখন চারিদিক আস্তে আস্তে অন্ধকার হয়ে আসে তখন সবচেয়ে কষ্ট হয়। বৃষ্টি শুরু হওয়ার পর থেকে অন্ধকার যেন আরও তাড়াতাড়ি ঘনিয়ে আসে। উঠোন, বাগান, রাস্তাঘাট সব জলে থৈ থৈ। অকারণে একটা ভয় মনকে ছেয়ে ফেলে। রাতে বুড়ীদিদি এসে শোয়। বুড়ী শুয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ে। পারুকুট্টির চোখে কিন্তু ঘুম আসে না। উঠোনে কোথাও শব্দ হলে কান খাড়া করে থাকে। আপ্পুন্নী কি আর এই রাতে আসবে? মন তবু মানে না। একটু কিছু শব্দ শুনলেই কান খাড়া করে থাকে।

এই বৃষ্টিতে আপ্পুন্নী কি স্কুলে যাচ্ছে? নদীতে কানায় কানায় জল। মুসলমানদের বউ আম্মিন্নী উম্মা বলছিল যে আজ তিনদিন হোলো খেয়া-পারাপার বন্ধ রয়েছে।

—আর দুদিন এভাবে বৃষ্টি হলে বাণ ডাকবে।

আম্মিন্নী উম্মা বাইরে থেকে শুনে এসে পারুকুট্টিকে বলল। নদীর এক ধারেই সড়ক। কখন যে নদী কূল ছাপিয়ে সব ভাসিয়ে নিয়ে যাবে কে জানে। হে ভগবান! আপ্পুন্নী তো ঐ পথেই স্কুলে যাওয়া-আসা করে— ওর যদি কিছু হয়?

—হে ভগবতী, ছেলের আমার যেন কোনো অমঙ্গল না হয়, আমি তোমায় গুড়ের পায়স মানত করছি।

ঘরে চাল নেই। কাল দুপুরে আম্মিন্নী উম্মার কাছ থেকে আধা সেরটাক চাল ধার করেছিল। তার কিছুটা এখনও বাকী আছে। কাল সকাল পর্যন্ত চলবে, তারপর?

এ বৃষ্টি কি আর থামবে না?

বৃষ্টি শুরু হওয়ার পর থেকে বুড়ী দিদি পারুকুট্টির কাছে আছে। গায়ে একটা গরমচাদর ঢাকা দিয়ে মাদুরের ওপর বসে বুড়ী বৃষ্টিকে অভিশাপ দেয়,

—উঃ কি বৃষ্টি রে বাবা! এমন বৃষ্টির মুখে আগুন।

আবার কখনও ছোটো ছেলেমেয়েদের মতো বলে,

—হে বৃষ্টি থেমে যা, নেবুর পাতা করমচা।

টোকা মাথায় দিয়ে বাড়ির পেছনের বেড়া দিয়ে আম্মিন্নী উম্মা উঠোনে এল,

—শুনছ পারুকুট্টি আম্মা, উঁচু জায়গায় পর্যন্ত জল উঠতে আরম্ভ করেছে। সর্বনাশ হবে—হায় আল্লা!

বুড়ী ডাকল— ভেতরে এসো না গো উম্মা।

আম্মিন্নী উম্মা টোকা বাইরে রেখে বারান্দায় উঠল। বুড়ী গল্প শুরু করল,

—২৪ সালের বাণের কথা মনে আছে?

হ্যাঁ, তা আর মনে নেই? সে বছরই তো আমাদের বড়ো কাঁঠাল গাছটা ভেঙে পড়ে গেল।

বুড়ীর এই বাণ নিয়ে অনেক কিছু গল্প করার আছে। সেবার

বাণের জল এসে বুড়ীর কুঁড়েঘরে পর্যন্ত ঢুকে গিয়েছিল। কেমন ভাবে একটা মেয়েমানুষ বাণের জলে ভাসতে ভাসতে কাঁঠাল গাছে আটকে গিয়েছিল তার গল্পও বুড়ী করল।

চব্বিশ সালের বাণের কথা পারুকুট্টির আবছা আবছা মনে আছে। ভড়াকেপাটের বাড়িতে সেদিন নানা জায়গা থেকে লোক এসে আশ্রয় নিয়েছিল। ওদের বাড়িটা অনেক উঁচু জমির ওপর। সেখানে কোনোকালেই জল ঢোকে না। ওর মনে আছে ওদের বার-বাড়ির দুটো বারান্দা লোকে ভরে গিয়েছিল। লোকে সেখানে তিন-দিন ছিল, রান্নাবান্না করেছে, রাতেও থেকেছে। খেত-মজুরেরা গোয়ালে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। তিন দিনের দিন সন্ধের সময় জল নামতে শুরু করেছিল। সে কতদিন আগেকার কথা।

মাঠ সব পাকা ধানে হলদে হয়ে আছে। যদি সড়ক ভেঙে যায় তো ধানখেত সব জলে ডুবে যাবে। শস্য সব নষ্ট হয়ে যাবে। যদি জল তাড়াতাড়ি সরেও যায় তা হলেও ভাদ্রমাসে ধান কাটার সময় শুধু খোসাটাই থাকবে, চাল পাওয়া যাবে না।

লোকের মনে সত্যিই ভয় ঢুকেছে, কি হবে। সেদিন দুপুরের পর বৃষ্টি একটু থামল। আকাশটা একটু পরিষ্কার দেখাচ্ছে। লোকের মনে একটু ভরসা হল— দুদিন যদি রোদ ওঠে তা হলে সব রক্ষে হবে। কিন্তু সেদিন রাত আটটা ন'টার সময় আকাশ জুড়ে মেঘের হানাহানি আর বাজের গুড়গুড় শব্দে লোকেরা সব ভয়ে বিহ্বল হয়ে পড়ল। আস্তে আস্তে বৃষ্টি শুরু হল, সেইসঙ্গে ঝড়ও।

বুড়ী দিদি আশ্বাস দেবার ভঙ্গীতে বলল,

—ঝড় ওঠা ভালো। মেঘ সব উড়িয়ে নিয়ে চলে যাবে, বেশি বৃষ্টি হবে না।

কিন্তু পারুকুট্টি ঝড়বৃষ্টির কথা ভাবছিল না। ও ভাবছিল এই বৃষ্টিতে আপ্পুন্নী কোথায় শুচ্ছে, কোথায় খাচ্ছে। বাজ পড়ার সময় যদি বারান্দায় বসে থাকে?

—হে ভগবতী, ছেলেকে আমার রক্ষে কোরো।

আকাশে আবার গোলমাল শুরু হল। ঠিক যেন জংলী বেড়ালের দল নিজেদের মধ্যে মারামারি করছে। আকাশের বুকে কে যেন একটা বড়ো রোলার এদিক থেকে ওদিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, গুমগুম্ একটা চাপা শব্দ। হঠাৎ আকাশের বুক চিরে একটা বিদ্যুৎ ছুটে গেল। তারপর কড় কড় কড়াৎ করে কোথায় যেন একটা বাজ পড়ল। বুড়ী দিদি ভয় পেয়ে "নারায়ণ" "নারায়ণ" বলে জপ করতে লাগল। ঝড়ের বেগ বাড়তে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টিরও। ঝড় আর বৃষ্টির মধ্যে যেন প্রতিযোগিতা লেগেছে। বাগানের কোথায় যেন একটা কী গাছ ভেঙে পড়ে গেল। উঠোনটায় কী একটা ভাঙার শব্দ হল। বুড়ী ভয়ে যেন কেমন হয়ে গেছে। এতক্ষণ চোখ বুজে ছিল একবার চোখ খুলে বলল,

পারুকুট্টি, আমাদের এ বাড়ি ভেঙে পড়ে যাবে না তো ?

না, বুড়ী দিদি। তোমার অত ভয়ের কিছু নেই। হঠাৎ বাতাস এসে এক ঝাপটায় ঘরের ভেতরের আলোটাকে নিভিয়ে দিল। বুড়ীর নামজপ আরও বেড়ে গেল। বাইরে বাতাসের সোঁ সোঁ শব্দের মধ্যেও যেন আর-একটা কিসের শব্দ পারুকুট্টি শুনতে পেল। ও কান খাড়া করল, হ্যাঁ কে যেন ডাকছে। ও তাড়াতাড়ি আলো জ্বাললো। বুড়ীকে বলল,

—কে যেন বাইরে ডাকছে বুড়ী দিদি।

বুড়ী কোনও উত্তর না দিয়ে চোখবুজে নামজপ করতে লাগল। পারুকুট্টি দরজাটা অল্প একটু খুলল। দরজা খুলে দেখতে পেল বাইরের বারান্দায় ভিজে জবজবে হয়ে লণ্ঠন আর টোকা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আম্মিনী উম্মা।

—পারুকুট্টি আম্মা, বড়ো বিপদ হল যে ?

—কি আম্মিনী উম্মা ?

—আমার কত্তা একটু আগে এসে খবর দিল যে নদীর তীর ছাপিয়ে জল সড়কে আসতে শুরু করেছে। এক্ষুনি এখান থেকে পালিয়ে না গেলে বাণের জলে আমরা সব ভেসে যাব।

—কোথায় যাবে উম্মা ?

—তা জানি না, যেখানে আশ্রয় পাব সেখানে যাব। আমার ছেলেমেয়েরা জিনিসপত্র বাঁধছে। মুরগী আর ছাগলগুলোকে নিয়ে কি করব তাই ভাবছি।

পারুকুট্টিকে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আম্মিনী উম্মা তাড়া দিল,

—তাড়াতাড়ি করো, পারুকুট্টি আম্মা। একটু পরে অবস্থা যে কি হবে তা আল্লাই জানেন।

—আমি কোথাও যাব না আম্মিনী উম্মা।

—তোমার মাথা খারাপ পারুকুট্টি আম্মা। লোকে নিজেরা তো পালাচ্ছেই। গোরু-বাছুরগুলোকে পর্যন্ত নিয়ে যাচ্ছে।

বেড়ার ওপাশে দেখা যাচ্ছে লোকেরা লণ্ঠন হাতে জিনিসপত্র নিয়ে বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে চলেছে।

—কি পারুকুট্টি আম্মা, এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছ যে ?

—আমি কোথাও যাব না উম্মা। তুমি যাও। আম্মিনী উম্মা খুব দুঃখের সঙ্গে বলল,

—হায় আল্লা! তুমি বলছ কি ?

—সত্যিই আমি কোথাও যাব না, তুমি যাও।

বাইরে থেকে আম্মিনী উম্মার বড়ো ছেলে মাকে তাড়াতাড়ি করে আসতে বলল।

—পারুকুট্টি আম্মা।

—তুমি যাও, বুড়ী দিদিকেও সঙ্গে নিয়ে যাও।

বুড়ী ওর গরম চাদরে সর্বশরীর ঢেকে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে। আম্মিনী উম্মার কর্তা বাইরে থেকে ওকে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডাকতে লাগল।

—যাও উম্মা, তাড়াতাড়ি যাও।

—পারুকুট্টি আম্মা, তুমি যে একেবারে একা।

—ভগবান আছেন। তোমরা যাও শীঘ্রি।

—হায় আল্লা ব'লে আম্মিনী উম্মা বুড়ী দিদির সঙ্গে উঠোনে নামলো। উঠোনে নামার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টির জল পড়ে চিমনী ভেঙে লণ্ঠন নিভে গেল। আম্মিনী উম্মা তখনও দ্বিধাভরে দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখে পারুকুট্টি বলল,

—কিছু ভাবনা কোরো না। যদি না মরি তো আবার দেখা হবে।

অন্ধকারে ওরা পরস্পরের চোখ মুছলো— পরস্পরের কেউ তা দেখল না। যতক্ষণ না ছায়া দুটো মুছে যায় ততক্ষণ বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইল, তারপর ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করলো।

মন অসাড় হয়ে গেছে। ভয় বা বেদনা তাতে সাড়া জাগাতে পারছে না। কোনও কিছু চিন্তা করার শক্তি ও যেন হারিয়ে গেছে।

সারা দেশ জলে ভেসে গেছে— জলে ভেসে যাওয়া এক খণ্ড গুঁড়ি কাঠ ধরে ও ভেসে যাচ্ছে। হাত ছেড়ে দিলেই হু হু করে ভেসে যাবে। হাত যেন অসাড় হয়ে গেছে। হঠাৎ একটা ঘূর্ণির মধ্যে গুঁড়িটা পড়ে যেতেই হাত ফসকে গেল। ও ডুবে যাচ্ছে, অগাধ জলে ডুবে যাচ্ছে। ও চীৎকার করে উঠল। উঃ মাগো এতক্ষণ ও স্বপ্ন দেখছিল। মাদুরের ওপর উঠে বসেও ওর সারা শরীরের কাঁপুনি থামে নি।

দরজা খুলে বারান্দায় এসে দাঁড়াতে মাথা ঘুরছে বলে মনে হল। জল বাড়ির ভেতরে ঢুকেছে। জল, চারিদিকে শুধু জল। অগাধ সীমাহীন সমুদ্রের মাঝখানে ও যেন একখণ্ড ক্ষুদ্র দ্বীপের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। কাল পর্যন্ত যে একটু সবুজ দেখা যাচ্ছিল আজ তা সব সাদা। কাল পর্যন্ত মাঠ ভরা ধানখেতগুলোতে আজ ছোটো ডিঙি চলছে।

আশেপাশের বাড়িগুলো সব শূন্য। বৃষ্টি তখনও সম্পূর্ণ থামে নি তবে ঝড় সব থেমে গেছে। উঠোনের কলাগাছগুলো সমস্ত পড়ে গেছে আর একটু দূরে বাঁশবাগানের বাঁশগুলো সব মাটিতে শুয়ে পড়েছে। সারা উঠোন ভাঙা আমের ডাল আর খড়কুটোয় ভর্তি হয়ে গেছে। বুড়ী দিদির কুঁড়ের চালের প্রায় সবটাই উড়ে গেছে।

জল সরার কোনো লক্ষণ নেই, আরও যেন বাড়বে বলে মনে হচ্ছে। এখন যদি চীৎকার করে ডাকেও কেউ শুনতে পাবে না। মন থেকে ভয় ভাবনা সব উড়ে গেছে। শুধু একটা শান্ত ব্যথা মনের মধ্যে অনুভব করছে। সব-কিছু শেষ হয়ে যাওয়ার লক্ষণই বুঝি এই।

আগের দিনের কটা চাল ধামায় পড়ে আছে কিন্তু উনুনে আগুন দিতে বা রান্না করতে ওর একেবারেই ইচ্ছে করছিল না। অকূল জলসমুদ্রের দিকে তাকিয়ে ও চুপচাপ বসে রইল।

হঠাৎ দূরে একটা ছাগলের আর্ত চীৎকার ও শুনতে পেল— মৃত্যু এগিয়ে আসছে ঐ নিরীহ পশুটাও জানতে পেরেছে।

দুপুরের দিকে মাঠের ছোটো ছোটো ডিঙিগুলোও আর দেখা গেল না। চারিদিকে কি অসীম এক নিস্তব্ধতা। কোনো ছাগল বা ছাগশিশুর ক্রন্দন আর শোনা যাচ্ছে না। চারিদিক যেন মৃত্যুর মতো অসাড় আর ঠাণ্ডা। মৃত্যু আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে, ঘরের মধ্যে যেন মৃত্যুর তুহিন শীতলতা ও অনুভব করতে পারছে।

প্রবল জলোচ্ছ্বাসের শব্দ শোনা যাছে। সদর দরজা দিয়ে প্রবল বেগে জল ঢুকছে। বাগান উঠোন সব জলে ভর্তি হয়ে গেছে। বারান্দার পৈঠেটা পর্যন্ত জলে ভরে গেছে।

পারুকুট্টির এবার দৃঢ় ধারণা হল যে এবার আর ওর রক্ষে নেই। সব-কিছু এবার শেষ হতে চলেছে। ও ঘরের মধ্যে গিয়ে বসল। বাইরে তাকানোর আর সাহস নেই। আর কয়েক মুহূর্ত— তারপরেই সব শেষ।

সন্ধের সময় কী যেন একটা ভেঙে পড়ার ভারী শব্দ শুনতে পেল। জানলা দিয়ে দেখল যে বুড়ী দিদির কুঁড়েঘরটা পড়ে গেছে।

আঁধার ঘনিয়ে আসার সঙ্গে ঝড়বৃষ্টি থেমে গেল। অন্ধকারে সমস্ত অন্তরীক্ষ ভিজে চুপসে আছে। বাইরে দেওয়ালের গায়ে জলের ধাক্কার ছলছলাৎ শব্দ মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে। যেন কার পায়ের শব্দ। আস্তে আস্তে সেই পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে।

চোখের সামনে অনেকগুলো ছবি একটার পর একটা ভেসে

আসছে। একটা বিরাট বাড়ি—নালুকেট্টু। বড়ো বড়ো তার থাম, মাঝে উঠোনের মধ্যে বেলফুলের গাছ। পান খেয়ে লাল করা দুটি ঠোঁট, বিশাল সুদৃঢ় বক্ষ। ঘামে ভেজা কাঁধের ওপর একটা অসহায় মেয়ে। কোঁকড়া চুল। কপালের শিরাগুলো দেখা যাচ্ছে। সুন্দর একটা মুখ। সে ছবি দূর হতে দূরে সরে যাচ্ছে।

কাল হয়তো ওর মৃতদেহ জলের সঙ্গে ভেসে উঠবে। জল যখন সরে যাবে তখন ওর দেহ হয়তো কোনো বাঁশ গাছের ঝাড়ে অথবা কেয়ার ঝোপে আটকে থাকবে। কেউ হয়তো চিনতে পারবে না। কেউ ওর খোঁজ করবে না।

একবার যদি আপ্পুন্নীর সঙ্গে দেখা হত।

ওকে যেন কোনো দুঃখকষ্ট সহ্য করতে না হয়। বামুনদের বাড়ির ধান সেদ্ধ করা ঝিয়ের ছেলে হয়ে যেন ওকে আর পরিচয় দিতে না হয়। আপ্পুন্নী ভালো থাকুক, সুখে থাকুক— হে মা ভগবতী, ওর মঙ্গল কোরো।

বালিসে মুখ গুঁজে উপুড় হয়ে পারুকুট্টি শুল। ঘুম এলে যেন সব-কিছুর সমাধান হয়। শীতল হাতের স্পর্শের মতো জল ওর সারা শরীর ছোঁওয়ার আগে ও যেন ঘুমিয়ে পড়ে। ছোটোবেলায় চোখে ঘুম না আসলে মা বলত—"নম শিবায়ঃ" জপ কর, ঠিক ঘুম আসবে। ও চোখবুজে প্রাণপণে বলতে লাগল— নম শিবায়ঃ, নম শিবায়ঃ। দেওয়ালগুলো ভিজে-চুপসে গেছে।—নম শিবায়ঃ, নম শিবায়ঃ। সমস্ত-শরীর যেন অবশ হয়ে আসছে। যেন অগাধ জলে ও ডুবে যাচ্ছে আর তখনই শুনতে পেল কে যেন ডাকছে,

—পারুকুট্টি আম্মা।

শরীর ও মন দুইই কেঁপে উঠল। মানুষের গলার আওয়াজ কিন্তু চোখ খুলতে পারছে না। শরীরটা যেন জীর্ণ বস্ত্রের মতো লাগছে। আবার সেই আওয়াজ,

—পারুকুট্টি আম্মা!

অতি কষ্টে চোখ খুলে আস্তে আস্তে উঠে বসল।

সারা দেহ কাঁপছে। গলা দিয়ে আওয়াজ বের হচ্ছে না। কাঁপতে কাঁপতে উঠে কোনোরকমে গিয়ে দরজা খুলল। বাইরে কে যেন একজন দাঁড়িয়ে আছে। ভয় পেয়ে চীৎকার করে উঠল,

—মাগো।

—আমি···পারুকুট্টি আম্মা···আমি শঙ্করণ নায়ার।

পা থরথর করে কাঁপছে। গাছের সর্বশেষ মূলটি উপড়ে যাওয়ায় মতো পারুকুট্টিও পড়ে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগে দুটো শক্ত হাত ওকে তুলে ধরল।

—ডিঙি এনেছি, এসো আমার সঙ্গে। ব'লে শঙ্করণ নায়ার ওর দেহটাকে দুহাতে বুকের কাছে তুলে ধরে জলে নামল।

পারুকুট্টি যখন চোখ খুলল ওর মনে হল ও যেন অসীম সমুদ্রের মাঝখানে। বৈঠা বাওয়ার ছপছপ্ শব্দ হচ্ছে। ও কোথায় ভাবতে কিছুক্ষণ সময় লাগল, ও নৌকোর মধ্যে আর শঙ্করণ নায়ার জলের ঢল আর ঘূর্ণির মধ্যে মল্লযুদ্ধ করে ডিঙিটাকে চালাচ্ছে। সারা মুখ ওর ঘামে ভেসে যাচ্ছে আর তখনই পারুকুট্টি বুঝতে পারল যে ও ওই লোকটির কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে আছে। ও ওর মাথা সরিয়ে নিল না। চোখ বুজে শুধু জিজ্ঞেস করল,

—আমরা কোথায় যাচ্ছি?

একটা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে ডিঙিটা প্রায় ধাক্কা খাচ্ছিল তার থেকে ডিঙিটাকে ঠেলে আর একদিকে নিয়ে গিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে শঙ্করণ নায়ার বলল

—যেখানে জল নেই।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সেদিন ক্লাসে স্কুলের পিওন একটা মেমো নিয়ে ক্লাসে ঢুকল। রামনাথন্ মাস্টার মশায়ের ইতিহাসের ক্লাস। মাস্টার মশাই মেমো পড়ে বললেন,

—ভি· আপ্পুন্নীকে হেডমাস্টার মশাই ডাকছেন।

ক্লাসের সব ছেলের নজর আপ্পুন্নীর ওপর গিয়ে পড়ল। সাধারণত যারা দুষ্টু ছেলে তাদেরই হেডমাস্টারের ঘরে ডাক পড়ে। হেডমাস্টার মশাই তাদের বেত মারেন আর দোষ যদি অল্প হয় তো বকুনি দিয়ে ছেড়ে দেন। হেডমাস্টারের কাছে ওর ডাক পড়ল কেন? আপ্পুন্নী ভেবে দেখল ও কোনো অপরাধ করেছে কিনা— কই কিছুই তো করে নি। নিশ্চয়ই ভাস্করণ ওর নামে হেডমাস্টারের কাছে মিথ্যে মিথ্যে লাগিয়েছে। কিন্তু বাইরে ওর মানসিক অস্বস্তি কিছু প্রকাশ না করে ও হেডমাস্টার মশায়ের ঘরে গেল। পা দুটো ওর তখন কাঁপছিল। হেডমাস্টার মশাই জিজ্ঞেস করলেন,

—কি, পড়াশুনো হচ্ছে কেমন?

—ভালোই স্যার।

তারপর হেডমাস্টার মশাই বললেন যে ও বৃত্তি পরীক্ষায় পাস করেছে। মাসে ছ টাকা করে বৃত্তি পাবে। উঃ কী মজা। আর তা হলে ওকে স্কুলের মাইনের জন্য ভাবতে হবে না। স্কুলের মাইনে চার টাকা তেরো আনা আর বাকী একটাকা তিন আনা ওর। উঃ ভাবতেই পারা যায় না।

—এখানে সই করো।

সই করার পর হেডমাস্টার ওর দিকে এক বাণ্ডিল নোট এগিয়ে দিয়ে বললেন,

—গত আটমাসের টাকাটা পাস হয়েছে।

তার মানে আটচল্লিশ টাকা। আপ্পুন্নী বিশ্বাস করতে পারছে না।

টাকাগুলো নেওয়ার সময় ওর হাত দুটো কাঁপছিল। সাতচল্লিশ টাকা পনেরো আনা নিয়ে ও যখন ঘর থেকে বেরিয়ে এল ওর তখন মনে হল ও যেন এক বিরাট সম্পত্তির মালিক। নালুকেট্টুতে আসার পর থেকে ও রোজ সন্ধেবেলায় ভগবতীর ঘরে বসে প্রার্থনা করেছে। দেবী তাকে আশীর্বাদ করেছেন। সেদিন থেকে ওর দেবী ভগবতীর ওপর বিশ্বাস অনেক বেড়ে গেল। মাইনে দেবার দিন যত এগিয়ে আসছিল ওর ভেতরটা তত শুকিয়ে উঠছিল— চারটাকা তেরো আনা কে দেবে ? এখন সব সমস্যার সমাধান হল।

বাড়ি ফেরার আগেই ওর বৃত্তি পাওয়ার কথা সকলে জেনে গেছে। ভাস্করণ বলেছে বোধহয়। সেদিন দাদামশায়ের রাগ যেন একটু কমেছে বলে মনে হল। অন্যদের সঙ্গে ভাত খেতে ওকেও ডাকলেন। সাতচল্লিশ টাকা পনেরো আনার যে এত দাম তা ও আগে বুঝতে পারে নি।

রাতে দিদিমা বলল—

পয়সাগুলো আজেবাজে খরচ করিস নি। আমার কাছে দে, রেখে দিই।

এমনিভাবে ওর দুটো জামা হল। দিদিমা ঐ পয়সা থেকে পাঠার মাথা আর তেল কেনবার জন্যে কিছু পয়সা নিয়েছিল। কুট্টামামা দিদিমার কাছ থেকে বাকী পয়সা ধার করেছিল পরে জানতে পেরেছিল। এতে অবশ্য ওর মনে দুঃখ হয় নি। ও যেন হঠাৎ বড়োলোক হয়েছে। কুট্টামামার পর্যন্ত ওর কাছে ধার। দিদিমা ওর টাকা নিয়ে খরচ করেছে। মনে ওর একটু গর্বই হচ্ছিল।

কুট্টামামা আর দাদামশায়ের মধ্যে মন কষাকষি বেড়েই চলছিল। সম্পত্তি ভাগাভাগির কথাও হচ্ছিল। বেশ কিছুদিন হল ভাগাভাগি নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছে কিন্তু আজ পর্যন্ত এ নিয়ে একটা মীমাংসায় কেউ পৌঁছোতে পারে নি।

যেদিন থেকে ভাগাভাগির কথা উঠেছে সেদিন থেকে বড়োমাসী বলতে শুরু করেছে,

—আমার আর আমার ছেলেমেয়েদের অংশের ঠিকমতো ভাগ চাই।

মীনাক্ষী মাসী আর মেসোমশায়ের কোনো অভিমত নেই। সবচেয়ে কষ্ট হচ্ছিল দিদিমার।

—আমাকে এও দেখতে হল।

গ্রামের পাঁচটা মুরুব্বী লোক যখন এই ভাগাভাগির কথা বলতে আসে তখন দিদিমা বলে,

—আমাকে তোমরা এ বাড়িতে শান্তিতে দু-চোখ বুজতে দাও।

নালুকেট্টুতে লোকজন অনেক থাকলেও আপ্পুন্নী যেন একেবার একা এইরকম একটা চিন্তা আজকাল ওকে পেয়ে বসেছে। কেউ ওর নাম ধরে ডাকে না। কেউ ওকে কিছু কাজ করতে বলে না। সকালবেলা ভাত খেয়ে স্কুলে যায়। সন্ধেবেলায় স্কুল থেকে ফিরে এসেই বাড়ির পুকুরে চান করতে যায় তারপর পুজোর ঘরে গিয়ে ঠাকুরকে নমস্কার করে পড়তে বসে। খাওয়ার ডাক দিলে উঠে গিয়ে খেয়ে আসে। কেউ ওকে কিছু জিজ্ঞেস করে না, কেউ কিছু বলেও না।

দাদামশায়ের রাগ এখনও যায় নি। আপ্পুন্নী আর ফিরে যাবে না জেনে দাদামশায় গজগজ করে—উচ্ছন্নে যাবে, উচ্ছন্নে যাবে, সব উচ্ছন্নে যাবে। যত-সব রাস্তার জঞ্জাল এসে উঠেছে। মা ভগবতী এ-সব অনাচার আর বেশি দিন সহ্য করবেন না।

শুধু মালুর ওর ওপর রাগ নেই। ও মাঝে মাঝে আসে, গল্প করে, কত কি জিজ্ঞেস করে। আপ্পুন্নী যখন পড়ে ও তখন মাঝে মাঝে এসে কাছে দাঁড়িয়ে থাকে। আপ্পুন্নীর কিন্তু ভালো লাগে না। সকাল থেকে সন্ধে অবধি বাড়িতে যা যা ঘটেছে তার একটা ছোট্ট ফিরিস্তি দেয় মালু। রোগা, কালো লম্বাটে মুখওয়ালা ঐ মেয়েটাকে কি জানি কেন আপ্পুন্নীর ভালো লাগে না। মেয়েটা অবশ্য খুবই বেচারী, ওর জন্য কষ্টও হয়, কিন্তু ও যখন তার স্নেহ-ভালোবাসা আপ্পুন্নীকে দেখাতে আসে তখন আপ্পুন্নীর তা একেবারেই পছন্দ হয় না। রান্নাঘরে যখন কাজ থাকে না তখন ও কাছে এসে বসে।

—আপ্পুন্নী দাদা কি করছ? আপ্পুন্নী দাদা কি পড়ছ? এই-সব প্রশ্ন।

ওর মতো মালুরও এ বাড়িতে দাম নেই। মালুর এখানে থাকাটাও এ বাড়ির অনেকে পছন্দ করে না।

মালুর অনেক কাজ। তাই ওর কাপড়চোপড় সব সময় নোংরা। তাঙ্কদিদি আর আম্মিনী মাসী আঁটোসাঁটো সিল্কের ব্লাউজ পরে যখন পাশ দিয়ে চলে যায় তখন কী সুন্দর একটা গন্ধ বেরোয়— তেল, চন্দন আর কেয়া ফুলের মিষ্টি গন্ধ। মালু কাছে এলে সবসময় ভেজা কাপড়চোপড়ের একটা আঁশটে গন্ধ ভেসে আসে।

আম্মিনী মাসী মাঝে মাঝে তার নিজের বাড়ি যায়। চার-পাঁচদিন পরে আবার ফিরে আসে। দাদুর শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার সময় কাউকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া চাই। আগে ছিল দেবকী মাসী— দেবকী মাসীর বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর আম্মিনী মাসী দাদামশায়ের সঙ্গে যায়। দিদিমা খুব অল্প সময়ই এ বাড়িতে আসে। গত তিরুবাতীরাতে এসে সপ্তাহখানেক ছিল।

একদিন আপ্পুন্নী শুধু গেঞ্জি পরে উঠোনে ঘুরছিল তাই দেখে আম্মিনী মাসী বলল,

—আপ্পুন্নীকে গেঞ্জিতেই ভালো মানায়।

আম্মিন্নী মাসীর সাথে গল্প করতে আপ্পুন্নীর কেমন যেন লজ্জা লজ্জা লাগে। আম্মিনীও মাঝে মাঝে আপ্পুন্নীর সঙ্গে গল্প করতে আসে। কিন্তু ওর উপস্থিতি আপ্পুন্নীর মনে কেমন যেন একটা অস্বস্তি জাগায়। ওকে দেখলেই ওর মনে পড়ে যায় সেই সর্পতুল্ললের কথা। কোমরের ওপর থেকে নিরাভরণা এক সুন্দরী, সুপুরির শীষ হাতে নিয়ে হেলছে দুলছে। তার কালো চুলগুলো মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। প্রদীপের আলোতে তাকে দেখাচ্ছে যেন এক সর্পকন্যা।

বিকেলবেলা দাদামশায় বেড়াতে বেরোলে আম্মিনী মাসী গোলা-বাড়ির পশ্চিম দিকের উঠোনটায় চুল ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তখন আপ্পুন্নী ওকে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখে। ও একটু নড়াচড়া করলেই

পড়ন্ত রোদে ওর সিল্কের ব্লাউজটা ঝিকমিক করে আর ব্লাউজের তলা থেকে ধবধবে ফর্সা পেটের খানিকটা দেখা যায়। ওর চোখ দুটো এত টানাটানা যে দেখে মনে হয় যেন চোখ দুটি আধ বোজা। ছড়িয়ে পড়া চুলগুলো বাঁধার সময় হাতের কাঁচের চুড়িগুলো রিম্‌-ঝিম শব্দ করে।

আম্মিনী মাসী যখন ওর কাছে এসে দাঁড়ায় তখন সোজাসুজি আপ্পুন্নী ওর দিকে তাকাতে পারে না। ক্রোধ আর ঘৃণা নিয়ে ওর দিকে তাকাবে ভাবে কিন্তু পারে না। ওকে সবচেয়ে যে ঘৃণা করে সেই দাদামশায়ের আদুরী মেয়ে আম্মিনী মাসী। দাদামশায়ের ওপর ওর ঘৃণার সবটা আম্মিনী মাসীকে দেখাবে ভাবে কিন্তু আম্মিনী যখন ওর কাছে আসে ও মুখ তুলতে পারে না। কিন্তু দূর থেকে দেখতে বেশ ভালো লাগে। ওর কালো চুলগুলো যখন পিঠ ছাপিয়ে এধার-ওধার লুটোপটি করে তখন কতকগুলো কালো সাপ হেলেদুলে খেলা করছে বলে মনে হয়। ওর আধখোলা আধবোজা চোখদুটি দেখলে মনে হয় ও যেন স্বপ্নের মধ্যে বিচরণ করছে।

সত্যি আম্মিনী মাসী যেন এক সুন্দরী নাগিনী। দূর থেকে ফণা তুলে দাঁড়িয়ে আছে দেখতেই ভালো লাগে। কাছে এলে আপ্পুন্নীর ভয় করে।*

একদিন সন্ধেবেলায় প্রদীপের আলোতে বসে ও বইয়ে মলাট লাগাচ্ছিল। আম্মিনী এসে ওর কাছে ঘেঁষে বসল,

—আপ্পুন্নী কী করছিস রে?

আপ্পুন্নী বইয়ে মলাট দিতে দিতে বলল,

—কিছু না।

—দেখি তোর বইটা দেখি।

*মাতৃমুখ্য সমাজে আপ্পুন্নী যদি আম্মিনীর চেয়ে বয়সে বড়ো হত তা হলে তাদের মধ্যে বিবাহ বন্ধন স্থাপিত হতে পারত। এ সমাজে পিসতুতো মামাতো ভাইবোনে বিয়ে হয়, খুড়তুতো জ্যাঠতুতো ভাইবোনে বিয়ে হওয়াটাও ব্যতিক্রম নয়।

আম্মিনীর মাথার বেল ফুল থেকে সুন্দর একটা গন্ধ ভেসে আসছিল। মলাট দেওয়া শেষ হলে আম্মিনী বইটা দেখতে লাগল।

আম্মিনী ক্লাস ফাইভ্ অবধি পড়েছে। ইংরিজী পড়তে পারে না —আপ্পুন্নীর বেশ অহংকার হল— ও ইংরিজী পড়তেও পারে, লিখতে পারে। বইটা নেড়েচেড়ে আম্মিনী বলল,

—তুই এ-সব পড়তে পারিস ?

—হ্যাঁ।

একটু পড়্-না শুনি।

কেউ পড়লে কি শুনতে ভালো লাগে ? তবু পড়ে ওর জ্ঞান দেখাতে পারত কিন্তু কেমন যেন লজ্জা করল।

—এটা কার ছবি রে ?

—রানী লক্ষ্মীবাঈএর।

—কোন্ লক্ষ্মীবাঈ ?

এঃ আম্মিনী মাসী লক্ষ্মীবাঈএর কথা শোনে নি। ও ঝাঁসীর রানীর সব গল্প জানে কিন্তু কী দরকার ওর এ-সব গল্প করার। ও শুধু বলল,

—অনেকদিন আগেকার এক রানীর।

—আর এটা ?

ওটা ? ওটা পক্ষীরাজের গল্প। রাজকুমার আর রাজকুমারী ঘোড়ার পিঠে চড়ে উড়ে যাচ্ছে।

—কোথায় যাচ্ছে ?

—রাজকুমারের রাজ্যে।

—যাওয়ার পর ?

—যাওয়ার পর ? যাওয়ার পর বেশ সুখেই দিন কাটাতে লাগল দুজনে।

—তারপর ?

এরপর কী বলবে ঠিক করতে না পেরে ও চুপ করে গেল।

আম্মিনী জোরে হেসে উঠল। আর সঙ্গে সঙ্গে আপ্পুন্নীও হাসতে লাগল। কিন্তু হাসি ওর হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল— ওর কাঁধে হাত দিয়ে আম্মিনী উঠে দাঁড়াল—আবার বেল ফুলের সৌরভ।

—আপ্পুন্নী, এই বইয়ের সব গল্প তুই জানিস?

—হ্যাঁ, আমাদের তো পড়তে হয়।

—তবে আমাকে গল্প বললি না কেন?

আপ্পুন্নী চুপ করে রইল।

—কী রে চুপ করে আছিস যে?

ও তার উত্তরে কিছু বলল না।

—তুই কি আমার ওপর রাগ করেছিস?

—কেন? রাগ করব কেন?

আম্মিনী কি যেন একটু ভাবল। তারপর চলে গেল।

বাড়িতে কুট্টামামা আর দাদামশায়ের ঝগড়া যেন একটা নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। দাদামশায় ভাগাভাগিও চান না, সংসার খরচের জন্য ধানও দেরেন না। দাহুর গলাই সবচেয়ে জোরে শোনা যায়।

বাৎসরিক পরীক্ষার ফল আপ্পুন্নী স্কুল খোলার আগেই জানতে পেরেছিল। ও পাস করেছে। কত হয়েছে জানে না। প্রথম ও হবে না তবে দ্বিতীয় যে হবে সেটা নিশ্চিত। ওর পাশের খবর পেয়ে বাড়ি এলে আম্মিনী মাসী জিজ্ঞেস করল—

—আপ্পুন্নী, পাস করেছিস?

—হ্যাঁ।

—কত হয়েছিস?

—তা এখনও জানি না।

—তুই ঠিক ফার্স্ট হবি দেখবি।

তারপর একটু থেমে বলল,

—তোর জীবনে খুব উন্নতি হবে।

আম্মিনী মাসী কি ঠাট্টা করছে?

—তুই পাসটাস করে যখন খুব বড়ো চাকরি পাবি— আম্মিনী কথাটা শেষ করল না। আম্মিনী মাসীর টানাটানা চোখ দুটো যে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে তা ও মুখ না তুলেই বুঝতে পারল।

শ্রাবণমাসের এক রাত্রি। প্রদীপে তেল ফুরিয়ে যাওয়ায় আপ্পুন্নী উঠে পুবদিকের বারান্দায় গিয়ে বসল। সেদিন দাদামশায় বাড়ি ছিলেন না। গুরুভায়ুরে গেছেন। দিদিমা সন্ধের সময় অল্প কিছু খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। বড়োমাসী আর তার ছেলে-মেয়েরা খাওয়া-দাওয়ার পর ওপরের ঘরে গিয়ে শুয়েছে। রান্নাঘরে মীনাক্ষী মাসী আর মালু তখনও কাজ করছে।

মাঠ থেকে একটা ভেজা বাতাস ভেসে আসছে। আপ্পুন্নী বসে বসে কী সব ভাবছিল, হঠাৎ আম্মিনী মাসীর গলার স্বর শুনে চমকে উঠল। —আপ্পুন্নী তুই কি বসে বসে ঘুমোচ্ছিস নাকি ?

আপ্পুন্নী চুপ করে আছে দেখে বলল,

—আলো নেই পড়ার ?

—নেই।

—বাবা নেই। গোলাবাড়ির ওপরের ঘরে প্রদীপ জ্বেলে দিচ্ছি। গিয়ে পড়।

—দরকার নেই।

ও ওই গোলাবাড়িতে একবারও ঢোকে নি, ঢোকার ইচ্ছেও নেই।

—কেন দরকার নেই ? এত তাড়াতাড়ি পড়া হয়ে গেল ?

—হ্যাঁ।

—তা হলে শুতে যাস নি কেন ?

শোওয়ার সময় এখনও হয় নি।

—আপ্পুন্নী, তুই আমাকে বইয়ের গল্প সব বলবি বলে বললি না তো ?

—বইয়েতে গল্প নেই।

আম্মিনী ওর কাছ ঘেঁষে বসল,

—মিছে কথা। পক্ষীরাজ, রাজকুমার আর রাজকুমারীর গল্প বইয়ে নেই ?

—ঐ একটাই গল্প আছে।

—একটা পক্ষীরাজ ঘোড়া পেলে বেশ হত না রে, আপ্পুন্নী, আপ্পুন্নীর খুব মজা লাগছিল। আম্মিন্নী মাসীর বয়স আঠারো কিন্তু কথাবার্তা বলছে যেন একটা বাচ্চা মেয়ের মতো। ধানের খেত থেকে একটা ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। হঠাৎ আম্মিনী বলে উঠল।

—উঃ কি ঠাণ্ডা হাওয়া রে। আপ্পুন্নী তোর ঠাণ্ডা লাগছে না ? গায়ে তোর একটা সার্ট পর্যন্ত নেই ?

আপ্পুন্নীর কাঁধে আম্মিনীর শরীরের ছোঁয়া লাগছে। আম্মিন্নীর হাতগুলো কি গরম।

—তোর বেশ মজা আপ্পুন্নী কোণের ঘরটায় দরজা জানলা বন্ধ করে এই ঠাণ্ডায় শুতে কি আরাম। একটু থেমে জিজ্ঞেস করল।

—কোণের ঘরে শুতে তোর ভয় করে না ?

—কেন ? ভয় করবে কেন ?

—ওঃ তোর খুব সাহস তো। এ বংশের মৃত আত্মারা সব রাতে বাড়ির চারপাশে ঘুরে বেড়ায় জানিস না ? কোন্ দিন তোর ঘাড়টা মটকে রেখে যাবে।

আপ্পুন্নী হেসে উঠল,

—ঘাড় মটকাবে না আরও কিছু।

—ওঃ এত সাহস! দাঁড়া আমি রাত্তির বেলায় এসে তোকে ভয় দেখাব। দেখি তুই চীৎকার করিস কিনা।

ওর কাঁধে আম্মিনী মাসী হাত রাখলে পর ওর শরীরের মধ্যে কেমন যেন একটা অস্বস্তি লাগছিল। আম্মিনী মাসীর দেহ থেকে কী সুন্দর একটা সাবানের গন্ধ ভেসে আসছে। আম্মিনী ওর হাতের তালু দিয়ে ওর কাঁধটা চেপে বলল,

—তোর ভয় করবে না, ঠিক বলছিস ভয় করবে না ?

আপ্পুন্নীর সারা শরীরে শিহরণ জাগতে লাগল। দক্ষিণ দিকের বারান্দায় একটা আলোর রেখা দেখা গেল— মালু, তার পেছনে মীনাক্ষী মাসী। মালুর গলা শোনা গেল— আম্মিনী পিসী, আম্মিনী পিসী ! আম্মিনী তাড়াতাড়ি আপ্পুন্নীর কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

—এই যে আসছি। তুই গোলাবাড়ির দরজা বন্ধ কর।

মীনাক্ষী মাসী আপ্পুন্নীকে দেখে বলল—

কিরে আপ্পু, তুই এখনও শুতে যাস নি ?

—হ্যাঁ, এই যাচ্ছি।

—তাড়াতাড়ি কর। দরজাটরজা সব বন্ধ করে তবে আমি একটু গড়াতে পারব।

কোণের ঘরে গিয়ে অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে ওর মাদুরটা বিছোলে। বিছানা শুধু এই মাদুরটা, একটা বালিশ পর্যন্ত নেই, একটা ঢাকা দেওয়ার চাদরও নেই।

একটা প্রদীপ হাতে আম্মিনী কোণের ঘরে এল, সঙ্গে মালু। কোণের ঘরের মধ্যেই কাঠের সিঁড়ি। সিঁড়ি দিয়ে উঠে ওপরের খালি ঘরটা পড়ে। এখানে আম্মিনী আর মালু শোয়। আম্মিনী সিঁড়িতে ওঠার আগে মালুকে বলল—

ওপরের বাথরুমে জল আছে মালু ?

—কী জানি।

—যা, এক গাড়ু জল নিয়ে আয়।

মালু জল আনতে গেল। আম্মিনী কিন্তু ওপরে না উঠে রেলিঙটা ধরে দাঁড়িয়ে রইল। প্রদীপের আলোয় ওর মুখটা মাত্র দেখা যাচ্ছিল। অন্ধকারে মেঝেতে আপ্পুন্নী ঘুমিয়ে পড়েছে কিনা তা ও ভালো করে দেখলে। আপ্পুন্নী ঝট্ করে চোখ বুজল।

—ঘুমের ভান করা হচ্ছে— না ?

আপ্পুন্নী নড়াচড়ার শব্দ করল না।

—রাতে আসব ভয় দেখাতে।

মালু জল নিয়ে এলে ওরা ওপরে উঠে গেল। ওপরে ওদের নড়াচড়া, বাথরুমের দরজা বন্ধ করা, খাটের শব্দ সব আপ্পুন্নী শুনতে পাচ্ছিল। খাটে আম্মিনী মাসী শোয়, মেঝেতে মালু।

আপ্পুন্নীর চোখে ঘুম আসছিল না। খোলা জানলা দিয়ে একটা ঠাণ্ডা হাওয়া আসছিল। কোথায় যেন বৃষ্টি হচ্ছে। একটু শীত শীত করতে ও উঠে জানলাটা বন্ধ করে দিল। সারা ঘরে ঘন অন্ধকার। ভয় ওর একটুও করছিল না। ওপরেই আম্মিনী মাসী আর মালু শুয়ে আছে। ওদিকটায় বড়ো মাসী আর তার ছেলে-মেয়েরা। রান্নাঘরের পাশের ঘর থেকে নাকডাকার শব্দ শোনা যাচ্ছে। ও চোখ বন্ধ করল। অন্ধকারে ঠাণ্ডা ঘরে শুতে সত্যিই আরাম। শুধু গায়ে ঢাকা দেবার যদি কিছু থাকত। বর্ষাকালে মা ওর গায়ে ঢাকা দিয়ে দিত। খুব ঠাণ্ডা লাগলে মাকে জড়িয়ে ধরে শুত। সে অবশ্য খুব ছোটোবেলায়। মার সঙ্গে এরকমভাবে শোওয়ার পর যেন কত যুগ কেটে গেছে। হঠাৎ মার কথা মনে পড়ে মনটা একটা অস্বস্তিতে ভরে উঠল। অতীত নিয়ে চিন্তা করে কোনো লাভ নেই। ও জোর করে ওর চোখ দুটো বন্ধ করল।

চোখে ঘুম জড়িয়ে আসছে। উড়তে উড়তে হঠাৎ মেঘের মধ্যে এক বিরাট অট্টালিকা দেখতে পেয়ে রাজকুমার তার পক্ষীরাজকে সেই দিকে উড়িয়ে নিয়ে চলল, নামলো একেবারে সেই অট্টালিকার ছাতে। সেখানে রেশমের বিছানায় বসে রাজকুমারী বীণা বাজাচ্ছে। কে যেন ওর বুকে হাত রেখেছে। চমকে ও জেগে উঠল! একটা হাত ওর বুকে চলাফেরা করছে। চীৎকার করতে গেলে একটা নরম কোমল হাত ওর মুখটা চেপে ধরলো—

আপ্পুন্নী, আমি!

এক মুহূর্ত···ওঃ···বুঝতে পেরেছি। আমাকে ভয় দেখাতে এসেছ কিন্তু আমি অত সহজে ভয় পাবার ছেলে নই। বুকের ওপর হাতটা তখনো চলাফেরা করছে। হাতটা কী উষ্ণ!

ওর চোখদুটো আবার আপনা আপনি বুজে গেল কিন্তু ঘুমিয়ে ও পড়ে নি। মুখেতে কার উষ্ণ নিশ্বাস পড়ছে। খুব আস্তে আস্তে একটা শব্দ— ভয় করছে ?

ওর ঠাণ্ডা শরীরটা হঠাৎ গরম হয়ে উঠল। উষ্ণ হাতটা শরীরের এখানে-ওখানে চলাফেরা করছে। সুগন্ধি সাবানের একটা মৃদু গন্ধ। সমস্ত শরীর যেন অবশ হয়ে আসছে। চোখ খুলতে ইচ্ছে করছে কিন্তু পারছে না।

পক্ষীরাজের ওপরে চড়া রাজকুমার আর রাজকুমারী মেঘের মধ্যে দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। গালেতে ফুলের পাপড়ির ছোঁয়া লাগছে, পাপড়িগুলো যেন উষ্ণ। পক্ষীরাজ উড়ছে— উড়ছে, ভয়ে রাজকুমারী তার দুই হাত দিয়ে রাজকুমারকে জড়িয়ে ধরেছে। ওর নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে।

পায়রাগুলো বুকের ওপর উড়ে এসে ঠোঁটে ঠোঁট ঘষছে। ও এখন কোথায় ? রেশমের পোশাক পরা জরির মুকুট মাথায় রাজ-কুমার কি সেইই নয় ? গাছের পাশ দিয়ে মেঘের মধ্যে দিয়ে উঁচুতে— আরো উঁচুতে উড়ে যাচ্ছে।

—আপ্পুন্নী দাদা !

মালুর গলা— কত বেলা হয়েছে খেয়াল আছে ? আপ্পুন্নী ধড়ফড় করে উঠে বসল। জানলা খুলে দিতেই বাইরের সব রোদ এসে ঘরের মধ্যে পড়ল। ওঃ খুব বেলা হয়ে গেছে তো। হঠাৎ ওর কী যেন মনে হল। সারারাত কি ও স্বপ্ন দেখেছে ? কুয়াশা মেশানো ভোরবেলায় যেমন দূরের সব-কিছু আবছা আবছা লাগে তেমনি সব-কিছু যেন অস্পষ্ট লাগছে। মাদুরটা গুটিয়ে রাখতে গিয়ে হঠাৎ কী যেন ঠং শব্দ করে মাটিতে পড়ল। লাল কাঁচের চুড়ির কতকগুলো টুকরো। প্রথমেই দেখলো মালু চলে গেছে না দাঁড়িয়ে আছে। নাঃ, চলে গেছে। চুড়ির টুকরোগুলো কুড়িয়ে নিয়ে ও সোজা বাগানের দিকে গেল। পুকুরে কানায় কানায় জল। একটার পর একটা কাঁচের টুকরোগুলো ও পুকুরে ছুঁড়ে ফেলল।

সকালের কাঁচা রোদে পুকুরের ঈষৎ হলদে জলে লাল কাঁচের টুকরোগুলো একটার পর একটা ডুবে যেতে লাগল।

নিজের ওপর কেমন যেন একটা ঘৃণা হল আর সেইসঙ্গে দুঃখও। কিন্তু তারই সঙ্গে আবার একটা গোপন আনন্দও মনকে ভরিয়ে তুলল। এই আনন্দ ও এক টুকরো মানিকের মতো বুকের মণিকুঠুরীতে লুকিয়ে রাখল।

সম্পূর্ণ একা থাকার সময় মাঝে মাঝে এই ঐশ্বর্য ও বার করে নিয়ে দেখত, তাকে নিয়ে খেলা করত, আদর করত।

* * *

ভাগাভাগির ব্যাপার নিয়ে মধ্যস্থতা করার অনেক লোক এল, কথাবার্তা অনেক হল, কিন্তু সমস্যার কোনো সমাধান হল না।

পাড়ার মাতব্বরেরা বাইরে বসে যখন ভাগাভাগির কথা বলত তখন ঘরের মধ্যে দিদিমার অসহ্য লাগত, বড়ো কষ্ট হত। আজ ছেষট্টি বছর দিদিমা এই নালুকেট্টুতে বাস করছে। এখানে জন্মেছে এখানেই মরার একান্ত আগ্রহ তার। দিনে বোধহয় দশ বার করে দিদিমা এ কথা বলে। কুট্টামামাকে সেদিন দিদিমা বলল—

কুট্টা, আমার মরার পর কি হাঁড়ি সরা ভাগ করলে হত না?

কুট্টামামা কিছু বলল না।

বড়ো মাসীর খুব ইচ্ছে যে নদীর ধারের জমিটা পায়। ওটাতে বছরে তিনবার ধান হয়। বড়োমাসী সব সময় অভিযোগ করছে—

আমাকে আর আমার ছেলেমেয়েদেরই ভুগতে হবে, আমাদের হয়ে তো বলার কেউ নেই।

উকীল কুমারন নায়ার আর কারুকুট্টী পান্নিকর রোজ বাড়িতে আসছে। পান্নিকরের মতে ভাগাভাগি অত সোজা ব্যাপার নয়। এতে অনেক সময় লাগে। জায়গা জমি সব নানা জায়গায় ছড়ানো-ছেটানো। সে-সব মাপজোক করা, দাম ঠিক করা, জমির ধার শোধ করা ইত্যাদি অনেক কাজ। এ-সব ঠিক করার আগে কার কত অংশ তা ঠিক করতে হবে।

দাদামশায়ের দুটো অংশ চাই, আজ অনেক বছর হল এ বংশের সব দেখাশুনো তিনি করে আসছেন। বাড়ির কর্তাকে সম্পত্তির দুভাগ দেওয়ার নিয়ম অনেকদিন থেকেই চলে আসছে। এ পরিবারের সম্পদ আর শ্রীবৃদ্ধির মূলে তো তিনিই। এ কথা যখন উকীল কুট্টামামার কানে তুলল তখন রাগে কুট্টামামা হ্যাক করে খানিকটা থুতু ফেলল,— অভিবৃদ্ধি? অভিবৃদ্ধি এ পরিবারের হয় নি, হয়েছে তাঁর বউয়ের পরিবারের।

কুট্টামামা আর দাদামশায়ের মধ্যে দেখাশোনা আজকাল খুব কম হয়। পান্নিকর আর কুমারন নায়ারই ওদের দুজনের মধ্যে কথা চালাচ্ছে। দাদামশায় পষ্টাপষ্টি বলে দিয়েছেন যে সম্পত্তির দু-ভাগ তাঁর চাই আর উত্তরদিকের ধানের জমিটাও তাঁর নামে লিখে দিতে হবে। এ যদি না হয় তা হলে তাঁর ভাগ পাওয়ার জন্য তিনি অন্য রাস্তা দেখবেন।

এই ঝগড়ায় মধ্যস্থতা করার জন্যে গ্রামের মোড়ল কালাত্তীল নাম্বিয়ার এল। সেদিন আপ্পুন্নীর ছুটি। স্কুলের শেষ পরীক্ষা, অনেক পড়ার ছিল, আজকে একটা ফয়সালা হবে এইরকম একটা কথা শুনেছিল। তাই উকীল এলে ও দক্ষিণদিকের বারান্দায় গিয়ে বসল।

গ্রামের মোড়ল নাম্বিয়ার এল। নাম্বিয়ারের আসার সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার আনার হুকুম হল। প্রথমেই ভাগাভাগির কথা না তুলে দাদামশাই আর নাম্বিয়ার এটা সেটা নিয়ে কথাবার্তা শুরু করলেন। উকীল কুমারন নায়ার খুব আগ্রহভরে কাছে দাঁড়িয়েছিল, কখন ভাগাভাগির কথা আরম্ভ হয়। গ্রামের মোড়ল আরম্ভ করল—

হ্যাঁ, তা কুঞ্জীকৃষ্ণন, তোমার ভাগনে সম্পত্তি ভাগ করার কী সব কথা যেন আমাকে বলছিল।

দাদামশায় উঠোনের এক দিকের কলাগাছগুলোর কাছে গিয়ে জোরে জোরে থুতু ফেললেন, তারপর বললেন—

হ্যাঁ হ্যাঁ, ভাগ করা হোক্-না!

—ওরকমভাবে বললে কি আর ভাগ করা যায় ?

—ভাগ করুক-না, আমার কি ? এই এত বড়ো পরিবারের সমস্ত ভার আমার মাথা থেকে নামবে। কিন্তু নাম্বিয়ার, একটা কথা...

—হ্যাঁ হ্যাঁ, বলো বলো।

—আমাদের এই ভডাকেপাট বংশ— মামা বেঁচে থাকতে এ পরিবার, এ বংশ যে এ গ্রামের নায়ার পরিবারদের মধ্যে কী ছিল তা তো আর তোমাকে খুলে বলার দরকার নেই। তুমি তো সব জানই।

—হ্যাঁ হ্যাঁ। জানি বৈকি।

—হ্যাঁ। তাই আমি বলছি। তুমি তো সব জান। তুমি তো আর আজকের লোক নও। চৌষটি জন লোক ছিল এককালে। সেই পরিবার যখন ভাগ হল তার পৌনে তিনভাগ শ্রী নষ্ট হয়ে গেল। কিন্তু তবু ভেবে দেখ বাড়িতে কুলদেবতা ভগবতী রয়েছেন ...তোমাকে আর কী বলব, তুমি তো জানই।

নাম্বিয়ার 'হ্যাঁ' 'হ্যাঁ' এই ভাবে মাথা নাড়তে লাগল।

—আর আমার একটা কথা তুমি শুনতে চাও ? আজ এই পরিবারের আছে কী— শুধু পুরোনো নাম আর নালুকেট্টু আছে। এই পরিবারের কর্তা হিসাবে আমার পুরো কর্তব্য আমি করেছি। হয়তো আমার কর্তব্যে খুঁত আছে, হয়তো ফাঁক আছে কিন্তু আজও যে ভডাকেপাট বংশ টিঁকে আছে তাতে কি আমার কোনো হাত নেই ?

দাদামশায় একটু থামলেন তারপর বেশ গম্ভীর স্বরে হাত-পা নেড়ে বললেন—

আমি তোমায় বলে দিলাম নাম্বিয়ার, এ ভিটেয় ঘুঘু চরতে আর বেশিদিন নেই।

তখন বেশ আস্তে কিন্তু ভারী গলার একটা আওয়াজ শোনা গেল—

ঘুঘু এমনিতেই চরতো।

মোড়ল দেখল সামনে দাঁড়িয়ে কুট্টামামা।

দাদু যেন কুট্টামামাকে দেখতেই পান নি এমন ভাবে বললেন—

আমার ইচ্ছে যে এ পরিবার যেমন ছিল তেমনিই থাকুক।

মোড়ল নাম্বিয়ার বললেন—

তোমার বলার তাৎপর্য আমি বুঝতে পারছি কিন্তু কুট্টন নায়ার এতে রাজী নয়। সে তার ভাগ চায়। এরকম হলে…আমি বলি ভাগাভাগি না করে কুট্টন নায়ার এখন যা পাচ্ছে তার একটা হিসেব করে বছরে একবার করে দেবার ব্যবস্থা করলে কেমন হয়?

কুট্টামামা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল না। মোড়ল জিজ্ঞেস করল—

কী কুট্টন নায়ার, তুমি কী বল?

—এ-সব তো অনেকদিন আগেই হওয়া উচিত ছিল।— তার পর নাম্বিয়ারের চেয়ারটা ধরে বলল—

আমার যা বলার আছে শুনুন। আমারও বয়স হয়েছে। একটা বারো-তেরো বছরের মেয়ে আমার। সেই কোন্ ছোটোবেলা থেকে আমি এ সংসারের জোয়ালে নিজেকে জুতেছি কিন্তু তার বদলে আমি কী পেয়েছি? বছরে চারটে ধুতি আর পঞ্চাশ সের চাল। আমি যদি কারুর বাড়িতে রান্নার কাজ করতাম তো এর চেয়ে বেশি পেতাম। ঠিক কিনা আপনিই বলুন?

কুট্টামামার বক্তব্য তখনো শেষ হয় নি।

—এ পরিবারের জন্য একজন কঠিন পরিশ্রম করেছে শুনলাম। ভাগনে-ভাগনীদের ভালোর জন্যে, তাদের সম্পত্তি বাড়াবার জন্য চারদিক থেকে জোগাড় করে এখানে এনে ঢেলেছে—না? তা হলে শুনে রাখুন— ভাগাভাগির জন্য এ পরিবার ধ্বংস হবে না, হয় যদি তা অন্য কারণে।

আপ্পুন্নী ভেবেছিল যে এ-সব শুনে দাদামশায় এই মুহূর্তে ফেটে পড়বেন, কিন্তু আশ্চর্য! দাদামশায় এর উত্তরে একটাও কথা না বলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন। এ তো ভারি আশ্চর্য ব্যাপার!

কুট্টা মামার গলার আওয়াজ আরো চড়ল।

—আচ্ছা, তা হলে আরো শুনুন আপনি। ভডাকেপাট পরিবার ধ্বংস হয়ে যাক তাতে এখানকার কর্তার কিছু আসে যায় না। কিন্তু পুনতোটায় তাঁর বউয়ের বাড়িতে সব-কিছু ঠিকমতো চললেই হল।

এবার দাদামশায় উঠে দাঁড়ালেন। কুট্টামামাকে একবার দেখে রাগে চীৎকার করলেন—

এই কুট্টা !

—গোপন করে রেখে কোনো লাভ নেই। যাদের জানা উচিত তারা জানুক।

—বেইমান, হারামজাদা, বল, বল যত পারিস বল। হারামজাদা, আমি তোর বাবার সম্পত্তি নিয়ে ওখানে দিয়েছি ? তোর বাবার···

মোড়ল দাদুকে উত্তেজিত দেখে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। সমস্ত ব্যাপারটাকে সামলাবার জন্য বলল—

আরে আরে ছেলেমানুষেরা ঐ রকম অনেক বাজে বকে। তা নিয়ে তুমি অত উত্তেজিত হলে চলবে কেন কুঞ্জীকৃষ্ণন্ ?

—আমার বলতে ভয় কী ? পুন্তোটায় ওদের টাকা-পয়সা, জমিজমা দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে। কী করে সেটা হচ্ছে শুনি ? ও-বাড়ি থেকে কেউ এ-বাড়ি এলে আমার বোনেদের তটস্থ থাকতে হবে, তাদের খাবার-দাবার পান-জল সব জোগাতে হবে। এ-বাড়ির মেয়েরা যেন ও-বাড়ির মেয়েদের ঝি-চাকর এই সেদিনও যাদের একপয়সার মুরোদ ছিল না—

দক্ষিণ দিকের ঘর থেকে কুট্টামামার এই-সব কথা শুনে দিদিমা কাঁদো কাঁদো গলায় বলল—

কুট্টা, একটু রেখেঢেকে কথা বল।

কিন্তু কুট্টামামা থামল না।

—সকাল থেকে সন্ধে অবধি মুখের রক্ত তুলে খাটব আর তার বদলে আমার সঙ্গে ব্যবহার করা হবে কুকুরের মতো। আমি যদি

অন্য কোনো পরিশ্রম করে আমারটা দেখতাম তো আজ আমার কিছু থাকত।

—কুট্টনায়ার অত উত্তেজিত হোয়ো না। আমাদের ধীর স্থির হয়ে কাজ করতে হবে। সব-কিছুরই একটা পথ আছে।

বলুক। বলুক ওর যত খুশি বলুক।—এইরকম একটা ভাব নিয়ে দাদামশাই উঠোনের এদিক্ থেকে ওদিকে পায়চারি করতে লাগলেন।

কুট্টামামাকে চুপ করতে দেখে মোড়লের সামনে এসে বললেন—

নাম্বিয়ার, এই এক্ষুনি একজন আমার সম্বন্ধে কি রকম ছোটোলোকের মতো কথা বলল শুনলে তো? ওকে, ওকে···দাদা-মশায়ের দম যেন আটকে যাবে— ওর বাবা যখন মারা গেল ও তখন এই এতটুকু, আমিই ওকে মানুষ করেছি। আর আজ দেখ তার কি রকম ঋণশোধ করছে।

অনেকক্ষণ কেউ কিছু বলল না। দাদামশাই আবার বললেন—

ঠিক আছে, ভাগই হোক্। এরপর আমার আর এদের সঙ্গে একসঙ্গে থাকাটা সম্ভব হবে না। হ্যাঁ— ভাগই হোক্, আমাকে তুমি যা যা করতে বলবে আমি তাই করব।

বাড়ির মধ্যে দিদিমা চোখ মুছল। দাদামশায় আবার বললেন,—

আজ এই এত বছর ধরে এ পরিবারের সমস্ত ধকল আমি সয়েছি তার বদলে এই অপমান আমার ভাগ্যে জুটল। যাক্ ভালোই হল, তবে আমি বলে রাখছি— আমার দুটো ভাগ চাই। আমি কারুর কাছ থেকে এক পয়সা বেশি চাই না। বাড়ির কর্তা হিসেবে এ আমার হক পাওনা। এ নিয়ম অনেক দিন ধরেই চলে আসছে তুমি তো জানই।

—আমি এতে রাজী নই—কুট্টামামার আওয়াজ চড়ল।

মোড়ল বলল—

—তা বললে হবে কেন? যা নিয়ম চলে আসছে।

—ও-সব আগেকার নিয়ম আজকের দিনে খাটে না।

এরপর কী কথাবার্তা হল আপ্পুন্নী শুনতে পেল না। মীনাক্ষী

মাসী ওকে কী একটা কাজে ডাকল। বাইরে যে দৃশ্য অভিনীত হচ্ছে তাতে আপ্পুন্নীর এতটুকু উৎসাহ নেই। তবে অভিনয় দেখতে ওর ভালোই লাগছিল।

সন্ধেবেলায় মোড়ল নাম্বিয়ার চলে গেল। উকীল কুমারন নায়ার বাড়ির ভেতর এলে বড়োমাসী জিজ্ঞেস করল—

কী, কিছু ঠিক হল?

—হ্যাঁ বাড়ির কর্তা ঠিক করেছেন উত্তর দিকের ধানের সবটা জমি তাঁর চাই আর বাড়ির দু-অংশ। উকীল কুমারন নায়ারের সঙ্গে আত্মীয় সম্বন্ধও আছে। তাই দিদিমার কাছ থেকে বিদায় নিতে গেলে দিদিমা বলল—

তোমাকে একটা কাজ করতে হবে বাবা।

—কী কাজ?

—আমার সম্পত্তিও চাই না, লাভও চাই না, আমার চাই কিছু শুকনো কাঠ।

কুমারন নায়ার ঠিক বুঝতে পারল না—

আমি কী করব তার?

—আমি এই নালুকেট্টুর মধ্যে চোখ বুজতে চাই। কিন্তু তোমরা সকলে মিলে তা হতে দেবে না দেখছি।

—আমি কী করব বলুন?

—নাঃ, তুমি আর কী করবে?

উকীল মাথা চুলকোতে চুলকোতে চলে গেল।

বেশ কিছুদিন সব চুপচাপ ছিল। হঠাৎ আবার একদিন গণ্ডগোল শুরু হল।

দাদামশায়ের কাছে উকীলের নোটিশ এসেছে, কুট্টামামা বাদী আর সকলে প্রতিবাদী।

সেদিন সারা সকাল আর সন্ধে দাদু উঠোনে পায়চারি করলেন। সারা সকাল বাড়ির লোকদের গালাগালি করলেন। এর মধ্যে মাঝে মাঝে গোলাবাড়ির ওপরে উঠে যাচ্ছেন, আর যখন নেমে

আসছেন তখন সারা মুখ লাল, এর মধ্যে একবার আম্মিনী মাসীকে ডাকলেন। আম্মিনী মাসী গোলাবাড়ি থেকে নেমে এলে বললেন—

কাল সকালে বাড়ি যাবার জন্যে তৈরি থাকবি। এখানে থাকার তোর কোনো অধিকার নেই।

আম্মিনী কিছু না বলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

—তোর যখন নিজের বাড়িঘর আছে তখন তোর এখানে পড়ে থাকার কোনো মানে হয় না।

আম্মিনী আস্তে আস্তে গোলাবাড়ির দিকে চলে গেল।

সেদিন রাতে আপ্পুন্নী ওর ঘরে শুয়ে ছিল। চোখ দুটো ওর খোলা ছিল। সকলে ঘুমিয়ে পড়েছে। ভোরের স্বপ্নের মতো এক রাত্রির স্মৃতি মনের মধ্যে যাওয়া-আসা করছে।

আম্মিনী চলে গেলে আর কি এ-বাড়িতে একবারও আসবে না? আগে আম্মিনী মাসীর সঙ্গে দেখা হলে কেমন যেন একটা বিহ্বল ভাব জাগত। এখন যেন লজ্জা করে। কিন্তু তবু আম্মিনী মাসী যখন চুল খুলে দাঁড়িয়ে থাকে তখন বড়ো দেখতে ইচ্ছে করে।

চারিদিক নিস্তব্ধ। আম্মিনী মাসী হয়তো ঘুমোচ্ছে। আচ্ছা, আম্মিনী মাসী যদি আবার আসে? সিঁড়িতে যেন কার পায়ের শব্দ? বুক বড়ো ধড়ফড় করছে। কাপড়ের খসখস শব্দ শোনা যাচ্ছে। যখন ওর দেহের ওপর একটা কোমল হাতের স্পর্শ পেল ও তাড়াতাড়ি সেই হাতটা জড়িয়ে ধরল।

নিঃশব্দে ও মাদুরে উঠে বসল, আম্মিনীও ওর পাশে বসল। ওর কাঁধে হাত দিয়ে আম্মিনী মাসি চুপচাপ বসে রইল। তারপর অনেকক্ষণ পরে খুব আস্তে আস্তে বলল—

আপ্পুন্নী—কাল আমি চলে যাচ্ছি, আপ্পুন্নী!

—আপ্পুন্নীর ওর মুখটা দেখতে খুব ইচ্ছে করল কিন্তু ঘন অন্ধকার। কিছুই দেখা যায় না।

—আবার কবে আসবে?—এ প্রশ্ন আপ্পুন্নী জিজ্ঞেস করল না।

কিন্তু এ প্রশ্ন ছিল সারা মন জুড়ে। ও ওর কাঁধে রাখা হাতদুটি চুড়িসুদ্ধ চেপে ধরল।

—আপ্পুন্নী, আমাদের বাড়িতে তুই আসবি তো ?

—না, কী করে আসব ?

—আমি আর এ বাড়িতে আসব না। কি রে আপ্পুন্নী, কথা বলছিস না যে ?

—উঁ !

—আপ্পুন্নী, একদিন তুই অনেক অনেক বড়ো হবি, তখন আম্মিনী মাসীকে ভুলে যাবি না তো ?

না, ভুলবে না। অর্ধনগ্ন সর্পসুন্দরীর ছবি ও কোনোদিনও ভুলবেনা।

—ভুলব না।

কিছুক্ষণ ওরা ওইভাবে বসে রইল। তারপর আম্মিনী মাসি বলল,

—যাই শুইগে যাই। আপ্পুন্নী তুই ঘুমো। ওঠার সময় ওর কানের কাছে ঠোঁটদুটো নিয়ে গিয়ে কেমন যেন আধোকান্না আধোহাসির স্বরে আম্মিনী মাসী বলল—

আর তোকে ভয় দেখাতে আমি আসব না রে।

পরের দিন সকালে আম্মিনী মাসী রওনা হল। যাবার আগে আম্মিনী যখন সকলের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছিল তখন আপ্পুন্নী সেখান থেকে পালিয়ে গিয়ে পশ্চিম দিকের উঠোনটার শেওলাধরা দেয়ালে কাঠ-কয়লা দিয়ে ছবি আঁকছিল।

আম্মিনী মাসি যখন চলে গেল তখন আপ্পুন্নী দেখে নি। ও যখন বাড়ির বাইরের উঠোনে এলো তখন দূরে মাঠের মাঝে একটা নীল ব্লাউজের অস্পষ্ট একটা রেখা দেখা যাচ্ছে।

* * *

সেদিন বেশ দেরি করেই আপ্পুন্নী স্কুলে গেল। সকালে সেদিন ফেনা ভাত হতে দেরি হয়েছিল। আজকাল বেশ কয়েকদিন হল ফেনা ভাত রাঁধতে দেরি হচ্ছে। ধানের বীজ সব খেয়ে খরচ করে ফেলা হয়েছে। গোলাবাড়ির ধান দাদামশাই সব বিক্রি করে

দিয়েছেন। আজকাল দাদামশাই খুব অল্প সময়ই বাড়ি থাকেন। শ্বশুরবাড়ি গেলে আট-দশদিন বাদে ফিরে আসেন। নারকোল সুপুরি পাড়িয়ে নিয়ে চলে যান। এ-বাড়িতে কী হচ্ছে না হচ্ছে, কেমন করে সব চলছে তা জানার দরকার তাঁর নেই।

বাড়িতে কি ভাবে যে কী হচ্ছে সেদিকে কুট্টামামারও নজর নেই। তাড়াতাড়ি বাড়ি এলে যদি দেখে রান্না হয় নি তো মীনাক্ষী মাসীকে বকে। পাশের বাড়ি থেকে ধান বা চাল ধার করে আনে মীনাক্ষী মাসী আর মাঝে মাঝে বলে—

সব আমার কপাল।

দাদামশাই পাট্টাদারদের বলে দিয়েছেন যেন তারা কুট্টামামাকে কোনো পয়সা না দেয়। কুট্টামামা অন্য পথ দেখেছে। সর্প মন্দিরের পাশের বড়ো আমগাছটা কেটে কুট্টিহাসানকে বিক্রি করে বাড়িতে দুবস্তা ধান কিনে পাঠিয়ে দিল। বাকী পয়সার হিসেব বড়োমাসী চাইলে তাকে এক ধমক দিল।

—চুপচাপ বসে থাক্, আর বেশি বাজে বকিস নি।

গাছ কাটতে লোকেরা যখন কুড়ুল নিয়ে বাড়ির ভেতরের উঠোন দিয়ে ঢুকল তখন দিদিমা সব জানতে পারল। সেদিন সারা সকাল দিদিমা কাঁদছিল।

তিনমাসের মধ্যে বাড়ির বাইরের সব গাছগুলো হাসান হাজীর কাঠুরেরা কেটে ফেলল।

নালুকেট্টুর ভেতর প্রতি মুহূর্তে যেন আপ্পুন্নীর দম আটকে আসছিল। দিদিমা কাঁদছে। বড়োমাসী সবসময় বিড়্‌বিড়্ করে অভিযোগ করছে। গায়ে একটা চাদর ঢাকা দিয়ে চুপচাপ আপন মনে বসে আছে ছোটো মেসোমশাই। আর মাঝে মাঝে ঘূর্ণী ঝড়ের মতো এসে উপস্থিত হচ্ছে কুট্টামামা, তার সঙ্গে হৈ-হৈ আর চীৎকার।

আপ্পুন্নীর সারা মন এই বাড়ির ওপর বিষিয়ে আছে। তবে মীনাক্ষী মাসীর জন্যে বড়ো কষ্ট হয়। সেদিন ও সুপুরির বাগান দিয়ে মীনাক্ষী মাসী লুকিয়ে লুকিয়ে আসছে দেখতে পেল। হাতের

ধামায় ওর কারুর বাড়ি থেকে ধার করে আনা ধান। তা দেখে আপ্পুন্নীর চোখ ছুটো জলে ভরে উঠেছিল।

সুখতুঃখ ভগবান মানুষের ভাগ্যে দিয়েছেন। কিন্তু মীনাক্ষী মাসীর জন্যে শুধু তুঃখই বা তিনি দিয়েছেন কেন আপ্পুন্নী তা বুঝতে পারে না।

সেদিন স্কুলে যেতে যেতে আপ্পুন্নী এই-সব কথাই ভাবছিল। যেতে যেতে রাস্তায় একটা গাছের নীচে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে বলে মনে হল। কাছে গিয়ে দেখে শঙ্করণ নায়ার। ওর মনে হল ও যেন আগুনের মধ্যে দিয়ে হাঁটছে।

—আপ্পুন্নী!

লোকটা ওর দিকই এগিয়ে আসছে। ও মুখ ফিরিয়ে হাঁটতে লাগল।

—আপ্পুন্নী!

আপ্পুন্নী এবারেও ফিরে তাকাল না। অনেকটা গিয়ে পেছন ফিরে তাকাল। নাঃ, লোকটা নেই। ওঃ, ওর সঙ্গে ভাব করতে এসেছে! আপ্পুন্নী সব শুনেছে, সব সহ্য করেছে। সব খবর ও জানতে পায় বন্যার কিছুদিন পরেই। মা ওই লোকটার সঙ্গে আছে। বড়ো মাসী এ খবর জানতে পেরে কি যাচ্ছেতাই না করল মার নামে। শুনে ওর মনে হচ্ছিল যেন ওর গায়ের চামড়া খসে যাবে। ছিঃ ছিঃ, তেঙ্গুমপোট্টা শঙ্করণ নায়ারের সঙ্গে···

সেদিন যখন এ খবর শুনল তখন একটা বিরাট ভার যেন ওর বুক থেকে নেমে গেল। ও যেন একটা বন্ধন থেকে এতদিন পরে মুক্ত হল।

—আমার সঙ্গে গল্প করতে এসেছে। শঙ্করণ নায়ার আবার কে? কেউ নয়।

সেদিন স্কুলে পৌঁছতে দশ মিনিট দেরি হল। দ্বিতীয় ঘণ্টায় ক্লাসে নোটিশ পড়া হল। ম্যাট্রিক পরীক্ষার টাকা দশ তারিখের আগে জমা দিতে হবে। দশ তারিখের আর ছদিন আছে। কোথা

থেকে ও পনেরোটা টাকা জোগাড় করবে? হঠাৎ মনে হল ওর যে-টাকাটা কুট্টামামা দিদিমার কাছ থেকে নিয়েছে সেইটা চাইলেই হবে।

বাড়ি ফিরে গিয়ে ও দিদিমাকে বলল—

দিদিমা, পরীক্ষার টাকা জমা দিতে হবে। পনেরোটা টাকা চাই।

—কুট্টামামার কাছে চা, আমি বলব ওকে।

কুট্টামামার কাছেই চাইবে ঠিক করল। কুট্টামামাকে ওর ভয় করে না। তার জন্যে মনের কোণে ওর কিছুটা শ্রদ্ধাও লুকানো আছে। দাদামশাই যেদিন ওকে মেরে শেষ করে দিতে গিয়েছিল সেদিন কুট্টামামাই ওকে বাঁচিয়েছে। কিন্তু কুট্টামামা খুব কম সময়ই আজকাল বাড়িতে থাকে। কখনো কখনো রাতেও বাড়ি থাকে না।

পরের দিন সন্ধের সময় মালু এসে ওকে কুট্টামামার আসার খবর দিল। কুট্টামামা বারান্দায় বসে বিড়ি খাচ্ছিল। কুট্টামামার মুখের ভাব দেখে ওর ভয় ধরল তবুও কাছে এসে বলল—

ম্যাটি.ক পরীক্ষার জন্যে পনেরো টাকা জমা দিতে হবে।

—আমি তার কী করব?

—কুট্টামামা...

—ওঃ দেনা করেছি তাই পাওনা আদায় করতে এসেছিস?

—আমি কী করব? টাকা জমা না দিলে...

—তোর কাছ থেকে কটা টাকা নিয়েছি এই তো! সে আমি একদিন শোধ করে দেব। আমার হাতে একটা কানাকড়িও নেই এখন।

আপ্পুন্নীর ভীষণ কান্না পেল কিন্তু কাঁদল না। বাড়ির ভেতর যাওয়ার সময় কুট্টামামা বলল—

তুই পড়াশুনো করে করবি কী? একটা টুকরো সাহেব হবি নাকি?

আপ্পুন্নী কোনো কথা না বলে বাড়ির ভেতর ঢুকলে মালু দৌড়ে এসে জিজ্ঞেস করল—

কি হল আপ্পুন্নী দাদা? পেলে টাকাটা?

আপ্পুন্নীর ভীষণ রাগ হল।

—যা, ভাগ্ এখান থেকে।

মালুর মুখের দিকে না তাকিয়ে ও ওর নিজের ঘরে চলল।

দিদিমার খুব দুঃখ হল।

—দিদিমার হাতে পয়সা থাকলে তোকে আর এত অসুবিধেয় পড়তে হত না।

কারুর কাছেই পয়সা নেই। মনে মনে বলল—

আপ্পুন্নীর কেউ নেই।

আপ্পুন্নীর বন্ধু মহম্মদ আপ্পুন্নীর অবস্থা সব জানে। ও বন্ধুর পরীক্ষার টাকাটা জোগাড় করার জন্যে অনেক চেষ্টা করল। ক্লাসের ছেলেদের কাছেও চেয়ে দেখল কিন্তু পেল না। তখন ও আপ্পুন্নীকে বলল—

—আপ্পুন্নী একটা কাজ কর-না। ভাস্করণের মার কাছ থেকে কিছু টাকা ধার চা না। ভাস্করণের মা তো তোর মাসী।

আপ্পুন্নী বলল—

মাসীর কাছে চেয়ে লাভ কি? চাইলে মাসী দেবে না। শুধু শুধু নিজের মান নষ্ট করে লাভ কি?

হ্যাঁ, টাকা তো দাদামশাই, বড়োমাসী সকলের কাছেই আছে কিন্তু চাইলে তারা দেবে না তা ও ভালো করেই জানে।

সারারাত চিন্তায় ওর ঘুম হল না। কত দুঃখকষ্ট সহ্য করে ও যখন জীবনের তোরণদ্বারে এসে উপস্থিত হয়েছে তখনই সব-কিছু ভেঙে চুরমার হয়ে যেতে চলেছে? কাল বিকেল চারটের আগে টাকা জমা দিতে হবে।

মহম্মদ ওকে কথা দিয়েছে যে ও খুব চেষ্টা করবে টাকাটা জোগাড় করতে। কাল দুপুরের মধ্যে ও যদি স্কুলে এসে উপস্থিত না হয় তা হলে আপ্পুন্নী যেন ধরে নেয় যে ও টাকাটা পায় নি।

পরীক্ষা দিতে পারলে ও ভালোভাবেই পাস করবে। পাস

করলে একটা কাজ পাবে। তখন আর ভিখিরির মতো কারুর কাছে হাত পাততে হবে না। তখন মাথা উঁচু করে ও হাঁটবে। সমস্ত-কিছু এখন একটা প্রশ্নের ওপর নির্ভর করছে। পনেরোটা টাকা কি এখন জোগাড় করা সম্ভব হবে ?

সেদিন খুব সকাল সকাল আপ্পুন্নী উঠে পড়ল। মুখ ধুয়ে পুকুর থেকে চান করে এসে আগের দিনের সার্ট আর ধুতি পরল। তারপর বই খাতা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। সদর গেট পেরিয়ে ওর মনে হল এত সকাল সকাল কোথায় যাবে ? ওদিন চারটের আগে ওকে টাকা জমা দিতে হবে। কোথায় যাবে ? কার কাছে চাইবে ?

নিজের মনে হাঁটতে আরম্ভ করল। স্কুলে যেতে হলে দক্ষিণে যেতে হবে। ও হাঁটতে লাগল উত্তরে। খানিকক্ষণ হাঁটার পর ও সড়ক ছেড়ে মাঠের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করল তারপর একটা সরু সড়ক ধরে হাঁটতে হাঁটতে এসে উপস্থিত হল একটা ছোটো টিলার কাছে। হঠাৎ ভালো করে দেখে ওর মনে হল এই তো সেই টিলাটা। যেদিন বাড়ি ছেড়ে চলে আসে সেদিন এই টিলাটার ওপরেই না ও বসে ছিল ? এখানেই না ওর সেয়দু আলি কুট্টির সঙ্গে দেখা হয়েছিল ? আজ আবার ও এখানে এসে উপস্থিত হয়েছে দু'বছর পর। দুবছর যেন কত সুদীর্ঘ কাল। রোদ যখন বেশ চড়া হয়ে গায়ে লাগল তখন ওর স্কুলের কথা মনে পড়ল। স্কুলে যেতে হবে কিন্তু পনেরো টাকার কথা ভাবলেই···

আপ্পুন্নী উঠে দাঁড়াল। স্কুলে গেলেই মাস্টারমশাই টাকা জমা দেওয়ার কথা জিজ্ঞেস করবেন, নয়তো হেডমাস্টারমশাই ডেকে জিজ্ঞেস করবেন—

টাকা জমা দেবে না ?

তো বলব—

না স্যার, আমি টাকা জমা দেব না।

—আজকে টাকা জমা দেবার শেষ দিন। জান তো?

—হ্যাঁ স্যার, জানি।

—আজ টাকা জমা না দিতে পারলে তুমি পরীক্ষা দিতে পারবে না।

—জানি স্যার।

—এক বছর মিছিমিছি নষ্ট হবে।

—নষ্ট হোক স্যার।

—টাকা জমা দেবে না ঠিক করেছ কেন?

—আমার টাকা নেই।

—বাড়িতে···

—আমার বাড়ি নেই স্যার, আমার কেউ নেই— আমার কেউ নেই।

—আহা বেচারী!

না, না, আমাকে অনুকম্পা যেন কেউ না করে। কেউ যেন আমার দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ না করে, আমাকে কেউ যেন বেচারী না বলে, আমি তা সহ্য করতে পারব না।

স্কুলে যখন ও পৌঁছোলো তখন ও ভীষণ ক্লান্ত। তখন দ্বিতীয় পিরিয়ড চলছে। ও এসে দরজায় দাঁড়ালে পর পঞ্চাশজোড়া চোখ ওর দিকে পড়ল। ভূগোলের মাস্টারমশাই বললেন—

গেট্ ইন্। এতক্ষণে সকাল হল?

আপ্পুন্নী নিঃশব্দে ক্লাসে ঢুকে একেবারে শেষের বেঞ্চিতে গিয়ে বসল। একবার সারা ক্লাসে চোখ বুলিয়ে দেখে নিল মহম্মদ এসেছে কিনা। নাঃ মহম্মদ আসে নি।

টিফিনের ঘণ্টা বাজলে পর বাইরে এসে দেখে মহম্মদ ঘেমে ভিজে গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। 'পেয়েছিস?'—এ কথা জিজ্ঞেস করতে ওর জিভ সরল না। ও শুধু চোখে প্রশ্ন নিয়ে মহম্মদের দিকে তাকাল। মহম্মদ ওর দিকে মিট্‌মিট্ করে তাকিয়ে বলল—

পেয়েছি।

বলে মহম্মদ ওর পকেট থেকে পনেরো খানা নোংরা এক টাকার

নোট বার করে ওকে দিল। আপ্পুন্নীর মহম্মদকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে হল। ও সাগ্রহে জিজ্ঞেস করল—

কোথেকে পেলি রে, কোথেকে?

—সে তোর জানার দরকার কি। তুই গিয়ে টাকাটা জমা দে।

—কবে টাকাটা ফেরত দিতে হবে?

—যখন তোর হাতে টাকা হবে তখন দিলেই হবে।

আপ্পুন্নী আর বেশি কথা না বলে টাকাটা নিয়ে আফিসে জমা দিল।

বিকেলে স্কুল থেকে ফেরার পথে মহম্মদ বলল—

আমি ভেবেছিলাম টাকাটা বুঝি আর জোগাড় করতে পারলাম না। কত জায়গায় যে ছোটাছুটি করলাম। শুধু কি আমি? উম্মাও* কত জায়গায় খোঁজ করল। চারিদিকে ছোটাছুটি করে বাড়ি ফিরে দেখি একজন লোক টাকা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

—কে রে মহম্মদ? কে?

—সে যে-কেউ হোক্-না।

—না না, বল-না কে?

—বললে তোর ভালো লাগবে না?

—বললে, আমার ভালো লাগবে না?

আপ্পুন্নী কী যেন একটু ভাবল।

মহম্মদ আবার বলল—

—যে-কেউ হোক্-না তোর তাতে কি?

—বুঝতে পেরেছি। টাকা দিয়ে সাহায্য করেছে কে বুঝতে পেরেছি।

—টাকা দিয়ে সাহায্য করেছে তোর মা।

মা! আপ্পুন্নী একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে গেল। মা? মা কেন তাকে টাকা দিতে গেল? এ সাহায্যের এতটুকু দরকার ছিল না। ও

*মুসলমানেরা মাকে উম্মা বলে।

মহম্মদের কাঁধদুটো জোরে জোরে ঝাঁকানি দিতে দিতে ক্রুদ্ধ স্বরে বলল—

তা আগে বলিস নি কেন ?

মহম্মদ ওর রাগকে উড়িয়ে দিয়ে হাসতে হাসতে বলল—

কেন, তোর মার টাকায় কি ষোলো আনা নেই ? যা, যা। বেশি বাজে বকিস নি।

বাড়িতে ফিরে নিজের ঘরে যখন ঢুকল তখনো মনটা বড়ো ভারী হয়ে আছে।

রাতে পড়ার সময় মালু এসে জিজ্ঞেস করল—

আপ্পুন্নী দাদা, পরীক্ষার টাকা জমা দিয়েছ ?

—হ্যাঁ।

—কোত্থেকে পেলে ?

—ওই এক জায়গা থেকে।

ওঃ মেয়েটার সব-কিছু জানা চাই। প্রদীপের স্বল্প আলোয় ও একবার মালুর দিকে তাকাল। মালুর ভিজে চুলের একটা বিশ্রী গন্ধ এসে নাকে লাগছে। গলায় সুতো বাঁধা লকেটের পাথরটার মতো ওর চোখ দুটো জ্বলছে। মালু যখন ওর সঙ্গে গল্প করতে কাছাকাছি এসে বসে তখন আপ্পুন্নীর ওর ওপর কেমন যেন একটা ঘৃণা হয়। দূর থেকে দেখলে আবার ওর ওপর সহানুভূতি জাগে। বেচারী মেয়েটা ! ভগবান ওকে কিছুই দেন নি, না রূপ, না ঐশ্বর্য।

বইয়ের পাতায় চোখ শুধু শুধুই ঘোরাঘুরি করছিল। ও ওর মনোযোগ বইয়ের দিকে দিতে চেষ্টা করল !

—Oh, Swallow, Swallow
If I could follow and light
Upon her lattice, I would pipe and frill
And chirp and twilter
Twenty million loves.

ক্লাসে ইংরাজীর মাস্টার এর মানে বলে দিয়েছিলেন, কবি দূর

দেশের কোনো এক সুন্দরী কন্যাকে একটা খবর পাঠাচ্ছেন। কবি ঐ মেয়েটিকে ভালোবাসেন। তিনি পাখিকে বলছেন,

Oh, were I thou that she
might take me in
And lay me on her bosom
and her heart
Would rock the snowy cradle
till I died.

আমি যদি তোমার মতো পাখি হতাম তা হলে সে আমায় তার বুকে শুইয়ে রাখত। আবার ওর মনোযোগ নষ্ট হয়ে গেল। বইয়ের অক্ষরগুলো চোখের সামনে থেকে মুছে গেল। একটা নীল সিল্কের ব্লাউজ··· কাজল-পরা টানাটানা ছুটি চোখ··· চমৎকার একটা গন্ধ।

ছিঃ ছিঃ এ-সব কী ভাবছে ও। পরীক্ষার আর তিনমাস বাকী আছে। ও আবার পড়াতে মন দিল :

—Why lingereth she clothe her heart with love,
Delaying as the tender arts delays
To clothe herself when all the woods are green.

আবার মনোযোগ নষ্ট হয়ে গেল। হঠাৎ মনে হল— আচ্ছা আম্মিনী মাসী এখন কী করছে ?

হয়তো ঘুমোচ্ছে। নরম তোষকে উপুড় হয়ে লাল চুড়িপরা ছুটো নরম হাতে বালিশটা জড়িয়ে ঘুমোচ্ছে। অনেকদিন আগে বইয়ের ঘুমন্ত রাজকুমারীর কথা মনে পড়ল।

ঘুমন্ত রাজকুমারী ! ক্লাস এইটে থাকতে পড়েছিল গল্পটা।

বছরের পর বছর ধরে ঘুমোচ্ছে রাজকুমারী। সেই ঘরে একদিন এসে ঢুকলেন রাজকুমার। পাতলা পর্দা সরিয়ে খাটের কাছে এসে হাঁটু গেড়ে বসে রাজকুমারীর গালে চুমো খেলেন রাজকুমার।

ভিজে ঠোঁটছুটো গালের ওপর—

লজ্জা করছিল তখন। এখন ভাবতে লজ্জার সঙ্গে একটা নিগূঢ় আনন্দও অনুভব করছে।

—এবার আমাকে একটা চুমু দাও। দাও, একটা দাও। আমি তোমাকে কত দিলাম।

আস্তে আস্তে ঠোঁটদুটো ওর গালটাকে ছুঁলো। তার বদলে গালে ঘাড়ে অজস্র চুমু। ওঠানামা করা বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে শোওয়ার সময় সমস্ত শরীর অবশ হয়ে গিয়েছিল।

এক অজানা অচেনা লোকে তাকে নিয়ে গিয়েছিল আম্মিনী। প্রদীপের আলোটা আর-একটু বাড়িয়ে দিয়ে ও পড়ল :

—Why lingereth she to···

—কীরে তোর বিছানায় যাবার সময় এখনো হয় নি ?

কী একটা দরকারে বড়ো মাসী নীচে এসে ওকে তখনো পড়তে দেখে জিজ্ঞেস করল।

—পড়ছি।

—সারারাত আলো জ্বালিয়ে তেল নষ্ট করার তেল তোর জন্যে কে কিনে রেখেছে— অ্যাঁ ?

ও তাড়াতাড়ি আলো নিভিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল।

* * *

আজ একমাস হল দাদামশাই শ্বশুরবাড়ি গেছেন। কুট্টামামা বাড়ির সব নারকেল গাছগুলো কুঞ্জানুকে ইজারা দিয়ে তার কাছ থেকে টাকা নিয়েছে। কুঞ্জানু নারকেল পাড়তে এলে পর বাড়ির মেয়েরা জানতে পারল। রান্নাঘরের উঠোনের নারকেলগুলো বাড়ির ব্যবহারের জন্য খরচ করা যাবে, বাদ বাকী সব কুঞ্জানুর।

কুঞ্জানু এসে বলে গেল—

—আমি টাকা গুণে দিয়েছি। আমার ভাগের গাছ থেকে নারকেল পাড়লে আমিও ছেড়ে কথা বলব না।

বাড়ির সকলে তা শুনল। ভড়াকেপাট পরিবার থেকে চাল ভিক্ষে করে দিন চালাতো কুঞ্জানুর মা। সেই কুঞ্জানু আজ তাদের

এ কথা শোনাল। হাতী কাদায় পড়লে ব্যাঙেও লাথি মেরে চলে যায়।

পৌষ-মাঘ মাসের ধান কাটার সময় হয়ে এসেছে। দাদামশায়ের অনুমতি না নিয়ে নদীর কাছটার ধানের জমিতে কুট্টামামা ধান কাটা শুরু করে দিয়েছে। উঠোনে ধান এসে জড়ো হচ্ছে দেখে বাড়ির লোকের মনে একটু আশ্বাস হল। যাক্ বেশ-কিছুদিনের অন্ন-সংকট ঘুচল। ফসলও খুব ভালো হয়েছে তাই এখন কদিন চিন্তার কিছু নেই।

কিন্তু পরের দিন কুলীরা এসে উপস্থিত হলে সকলে চমকে উঠল। ধান বিক্রি করতে যাচ্ছে কুট্টামামা।

—বড়ো মাসী মামাকে ডেকে বলল—

কুট্টা, তুই এই কাঁচা ধান বিক্রি করতে যাচ্ছিস ?

—হ্যাঁ।

—বাড়ির লোকেরা তা হলে খাবে কি ?

—তার জন্যে কিছু ধান আমি রেখে দিয়েছি। এখনো তো সব কাটা শেষ হয় নি।

—তুই যে যা ইচ্ছে তাই করছিস দেখছি।

—শোনো দিদি। আমি চাষবাস সব দেখছি। তা ছাড়া ধানে সার দেওয়া, ঘাস পরিষ্কার করা, পোকামাকড় মারার ওষুধ দেওয়া—এ-সবে একটাও পয়সা খরচ করেছ ?

বড়ো মাসী খুব রেগে গেল।

—তুই এমন ভাব দেখাচ্ছিস যেন এ-সব তোর নিজের সম্পত্তি।

—ভড়াকেপাটের আদ্ধেক ধান, ভড়াকেপাটের আদ্ধেক ঐশ্বর্য যখন পুনতোটার মামার শ্বশুরবাড়িতে যেত তখন তো একটা কথাও বলতে শুনি নি ? তখন কি জিভ আটকে গিয়েছিল ?

বড়ো মাসী আর একটা কথাও না বলে দুমদাম পা ফেলে বাড়ির মধ্যে চলে গেল। দিদিমা কী জিজ্ঞেস করতে এলে এক ধমক

লাগাল। খেয়ে সব উড়িয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছে বলে মালু আর আপ্পুন্নীকে খানিকক্ষণ গালাগালি করল।

বাড়ির অবস্থা এমন হয়েছে যে মুখ খুললেই ঝগড়া লেগে যাচ্ছে। কেউ কাউকে বিশ্বাসও করছে না। আঁপ্পুন্নী কিন্তু এই-সব ঝগড়া-ঝাটি থেকে একেবারে দূরে সরে আছে। ওকে নিয়ে যেন কোনো গণ্ডগোল না হয়, এই ওর প্রথম আশঙ্কা, আর দ্বিতীয় আগ্রহ এই ধূমায়িত অগ্নিকুণ্ড থেকে কোনো রকমে বাইরে বেরিয়ে আসা।

যতক্ষণ না সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসে ততক্ষণ ও ওর পরীক্ষার পড়া পড়ে। তারপর একটা নির্জন মতো জায়গায় গিয়ে কিছুক্ষণ বসে থাকে। যখন খাওয়ার ডাক পড়ে গিয়ে খেয়ে আসে। ভাত খাওয়ার পর যতটুকু পারে পড়ে। আলো বেশিক্ষণ জ্বালিয়ে রাখার হুকুম নেই। কেরোসিনের দাম অনেক।

শেষে পরীক্ষার দিন এলো, পনেরোই মার্চ। সেদিন ভগবতীর ঘরে গিয়ে ও অনেকক্ষণ প্রার্থনা করল। পরীক্ষা সবগুলো দেওয়ার পর ভরসা হল যে পরীক্ষা ভালোই হয়েছে। শুক্রবারে শেষ পরীক্ষাটা দেওয়ার পর মনে হল যেন ঘাড়ের ওপর থেকে একটা বিরাট বোঝার ভার নেমে গেল। মনটা বেশ একটা হালকা আনন্দে ভরে গেল। কিন্তু বাড়িতে এসে সব আনন্দ নষ্ট হয়ে গেল। বাড়িতে বড়ো মাসী আর কুট্টামামার মধ্যে ভীষণ ঝগড়া বেধে গেছে।

কেউ জিজ্ঞেস করল না ওর পরীক্ষা কেমন হল। ও পাস করলেই বা কি ? ফেল করলেই বা কি? কার তাতে কি যায় আসে? শুধু দিদিমা আশীর্বাদ করে—

—যত তাড়াতাড়ি পারিস নিজেরটা গুছিয়ে নে।

এখন ছুটি। ছুটির দিনগুলো অসহ্য লাগে। যতদিন না পরীক্ষার ফল বেরোয় ততদিন অবশ্য কোনোরকমে কেটে যাবে। তারপর? তারপর যা হবার হবে, ও আর ভাবতে পারে না।

সপ্তম অধ্যায়

বাড়ির সামনে হঠাৎ সেদিন রামকৃষ্ণন্ মাস্টার মশায়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। মাস্টারমশাই এদিকেই কোথায় এসেছিলেন। জিজ্ঞেস করলেন—

তোমার বাড়ি বুঝি কাছে?

—হ্যাঁ স্যার। এই যে আমার বাড়ি— বলে ও নালুকেট্টুর দিকে আঙুল দেখাল।

—পরীক্ষার ফল বেরোতে এখনো বেশ কিছুদিন দেরি আছে, তা এখন কী করছ?

—কিছু করছি না স্যার। একটা বই পর্যন্ত নেই যে পড়ি।

—তা আমার বাড়িতে এসো-না। অনেক বই আছে পড়ার। শুধু শুধু সময় নষ্ট কোরো না।

আপ্পুন্নী খুব খুশি হল। পোস্টাফিসের কাছে মাস্টারমশায়ের বাড়ি। বাড়ি বইয়ে ভর্তি। মাস্টারমশাই খুব পড়েন। শুনেছি কবিতাও লেখেন। প্রতিদিন বিকেলে আপ্পুন্নী মাস্টারমশায়ের বাড়ি যেতে লাগল। মাস্টারমশায়ের বাড়িতে খবরের কাগজও আছে। ও কিছুক্ষণ কাগজ পড়ে। মাস্টারমশাই ওকে একটা বই বেছে দেন, ওর সঙ্গে গল্প করেন। মাস্টারমশায়ের গল্প শুনতে আপ্পুন্নীর খুব ভালো লাগে।

একদিন সন্ধেবেলায় বাড়ি ফিরে দেখে দাদুর মেজো ছেলে গোপীমামা বাড়িতে এসেছে। গোপীমামা, দিদিমা আর বড়ো মাসীর সঙ্গে গল্প করছে। ও মামাকে দেখে একটু হেসে ওর কর্তব্য সারল। ওর ঘরের দিকে যেতে যেতে শুনতে পেল দিদিমা বলছে—

ভালোই হল, ওর একটা ভালো সম্বন্ধ হল।

কী ভালো হল, কার সম্বন্ধ হল?

গোপীমামা চলে গেলে পর দিদিমা আপ্পুন্নীকে বলল— সকলকে নেমন্তন্ন করেছে, আপ্পুন্নী তুই যাবি নাকি ?

—কোথায় ?

—দিদিমার বাড়ি। আঠাশে বিয়ে।

—কার ?

—আম্মিনীর।

—ওঃ।

তারপর ও আর-কিছু জিজ্ঞেস করল না। কিন্তু দিদিমা বলতে লাগল—

বর তেক্কন্কাণ্ডত্তের মাধবন্ নায়ার। খুব বড়ো বংশ। মাধবন্ নায়ার কলম্বোয় ছিল এতদিন। কিছুদিন হল গ্রামে এসেছে। হাতে অনেক পয়সা আছে। আম্মিনীর ভালোই হল।

হ্যাঁ, আম্মিনীর ভালো হোক। আপ্পুন্নীও মনে মনে বলল— আম্মিনী মাসীর ভালো হোক্, আম্মিনী মাসী সুখে থাকুক।

কিন্তু তবু কোথায় যেন একটা অব্যক্ত ব্যথা বাজতে লাগলো। এখন থেকে আম্মিনী মাসীর সঙ্গে দেখা হলে সে আর আম্মিনী মাসী থাকবে না, সে তখন মাধবন্ নায়ারের বউ। নাঃ দেখা হবে না, হলেও…

ওর জন্মাতে একটু দেরি হয়ে গেছে। পাঁচ ছয় বছর আগে জন্মালে ও একটা লোক হয়ে দাঁড়াত। স্কুলে-পড়া আপ্পুন্নী থাকত না *। মনটা কেমন যেন একটা অস্বস্তিতে ভরে গেল।

গ্রামে কোথাও বিয়ের খবর পেলে দিদিমা শুধু তারই কথা বলবে। এ আবার ভাইয়ের মেয়ে। রোজ সকালে দিদিমা বলবে আজ পনেরো তারিখ, আজ ষোল তারিখ। একুশ তারিখে সকালে ঘুম থেকে উঠেই ওর মনে পড়ল আজ আম্মিনীর বিয়ে, বড়োমাসীর

* আপ্পুন্নী, যদি আম্মিনীর চেয়ে বয়সে বড়ো হত তা হলে তার সঙ্গে আম্মিনীরও বিয়ে হওয়াটা অসম্ভব হত না।

ছেলেমেয়ে আগের দিনই বিয়েবাড়িতে চলে গেছে। মালুও ওদের সঙ্গে গেছে। মীনাক্ষী মাসীরও খুব যাওয়ার ইচ্ছে ছিল কিন্তু দিদিমা বলল—

—সকলে গেলে আমি কি হাওয়া খেয়ে থাকব নাকি ?

—এই রান্নাঘরে পচে মরা আমার কপাল, ব'লে বিড়বিড় করতে করতে মীনাক্ষী মাসী যাবে না বলে ঠিক করল।

আপ্পুন্নী একটা বই নিয়ে বাইরের বারান্দায় বসল। কিন্তু বই পড়তে ওর একেবারেই মন লাগছিল না। বাড়ির মধ্যেও বসে থাকা যায় না। দিদিমা ভীষণ বিরক্ত করছে। বিয়েবাড়িতে প্রতি মিনিটে কি হচ্ছে না হচ্ছে দিদিমা তার ব্যখ্যান দিয়ে যাচ্ছে। রাতে ভাত খাবার সময় দিদিমা এসে জিজ্ঞেস করল—

এখন কটা বাজে রে, আপ্পুন্নী ?

—আটটা।

—এখন তা হলে পাতা পড়ছে।

একটা কথা না বলে আপ্পুন্নী ভাত খেতে লাগল। ভাত আর কুমড়োর একটা তরকারি। একদম স্বাদ নেই। শোবার সময় শুনতে পেল দিদিমা বলছে—

এখন বোধহয় সকলের খাওয়া শেষ হল।

রাতে শুয়ে ওর মন আস্তে আস্তে বিয়েবাড়িতে চলে গেল। বিয়েবাড়ির সব দৃশ্য একটার পর একটা ওর চোখের সামনে ভাসতে লাগল।

···প্যাণ্ডেলে লোকে ভর্তি, বাড়ির ভেতর মেয়েরা আর বাচ্চারা। চারিদিকে ভীষণ গোলমাল হচ্ছে।

···এখন বোধহয় সকলে ঘুমোতে গেছে। আম্মিনী মাসীও নিশ্চয় ঘুমোতে গেছে। একা নয় সঙ্গে আর-একজন লোক। কুড়ি বছর সিংহলে বাস করা একটি লোক। কুড়ি বছর পরে ও লোকটা দেশে ফিরল কেন ?

ছুলো বেড়ালের মতো একজোড়া গোঁফ। কালো বেঁটে একটা

লোকের ছবি ও মনে মনে আঁকল। কে এই লোকটা? যেই হোক্-না কেন— আপ্পুন্নী তাকে ঘৃণা করে।

নরম বিছানায় ঐ লোকটার পাশে শুয়ে আছে আম্মিনী। বেতের মতো হিলহিলে শরীর আর মোচার ফুলের মতো গায়ের রঙ আম্মিনী মাসীর— সেই অপূর্ব সুন্দরী মেয়েটির পাশে ঐ লোকটা!

আচ্ছা ও কেন এ-সব কথা ভাবছে? আপ্পুন্নী উঠে জানলা খুলে দিল। বাইরে চাঁদের আলো কিন্তু ভেতরে বড্ড গরম। কলাগাছগুলো চাঁদের আলোতে স্নান করে আস্তে আস্তে মাথা দোলাচ্ছে। কী অদ্ভুত জ্যোৎস্না! নিমগাছটার ছায়া কেমন যেন পাঁচটা-মাথাওয়ালা একটা ভূতের মতো দেখাচ্ছে। ছায়া আর জ্যোৎস্নায় মিলিয়ে বাইরের প্রকৃতির মধ্যে কেমন যেন একটা ভয়-জাগানো সৌন্দর্য।

জ্যোৎস্না যতক্ষণ না পাণ্ডুর হয়ে গেল ততক্ষণ চোখ খুলে জেগে রইল। ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়া জানলা দিয়ে ঘরে ঢুকলে পর চোখের পাতা দুটো ঘুমে জড়িয়ে এল।

* * *

পরীক্ষার ফল বার হয়েছে, আপ্পুন্নী পাস করেছে। ও ভেবেছিল বুঝি পরীক্ষার ফল জুন মাসে বেরোবে। একদিন মাস্টারমশায়ের বাড়িতে গেলে মাস্টারমশাই ওর সামনে কাগজ রেখে বললেন—

এসো এসো আপ্পুন্নী, বসো। আমি চা আনতে বলি।

—কি ব্যাপার স্যার?

—তুমি পাস করেছ। এই দেখো তোমার নম্বর।

আপ্পুন্নী কাগজের দিকে তাকিয়ে দেখল নম্বরের সমুদ্র— তার মাঝে ওর নম্বরটা মাস্টারমশায় দাগ দিয়ে রেখেছেন। দেখে দেখে আশা যেন ওর মিটছিল না। কিছুক্ষণ পরে ও মহম্মদের নম্বর খোঁজ করতে লাগল। নাঃ মহম্মদের নম্বর নেই, ও পাস করে নি।

বাড়ি ফেরার সময় সারা রাস্তা ওর চেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছে করল— 'আমি পাস করেছি।' বাড়িতে কারুর শোনার আগ্রহ না থাকলেও সকলকে একবার বলবে ভেবেছিল। বাড়ির গেটের কাছে ঢুকতেই

দাদামশায়ের গলা শুনতে পেল। আজ অনেকদিন পরে দাদামশাই এসেছেন। ওর সমস্ত উৎসাহ নিভে গেল। ও কাউকে কিছু না বলে বাড়ির ভেতর ঢুকে গেল। সার্ট খুলে তোয়ালেটা হাতে নিয়ে চান করে আসবে ভাবল। কিছুক্ষণ অন্তত এই অশান্ত পরিবেশ থেকে একটু মুক্তি পাবে।

পোলের নীচটায় নদীতে খুব গভীর জল। চান করে বেশ আরাম আছে। নদী একেবারে শুকিয়ে গেছে। একটা শুকনো মতো নদী তির্‌তির করে বয়ে যাচ্ছে। এই নদী আবার বর্ষাকালে যে ভৈরবীর রূপ ধরে এখনকার চেহারা দেখলে তা বোঝা যায় না। তক্ষুনি নদীতে না নেমে ও বালুচরের ওপর দিয়ে হাঁটতে লাগল। নদীর জলে ছোটো ছোটো নুড়ি দেখা যাচ্ছে। জলে না নেমে ও জলের মধ্যে একটা বড়ো পাথরের ওপর বসল। পোলের ওপর একটা প্যাসেঞ্জার ট্রেন সব-কিছু থরথর করে কাঁপিয়ে দিয়ে চলে গেল। ট্রেনে লোক ভর্তি। কাউকেই ও চেনে না। কোথা থেকে আসছে, কোথাই বা যাচ্ছে, এই গ্রাম আর হাইস্কুল ছাড়া ও আর কোথাও যায় নি। বড়ো বড়ো শহর কেমন তা যেন কল্পনাই করা যায় না।

ও একটা ছোট্ট নুড়ি রেলের লোহার পাতে ছুড়লো, ঠং করে নুড়িটা আওয়াজ করে দূরে গিয়ে পড়ল। ওপরে অল্প নীলাভ আকাশ। সূর্য অস্ত গেছে। পশ্চিম দিকে লাল আর কালো রঙের কতকগুলো মেঘ এদিক্‌-ওদিক্ ছোটাছুটি করছে, অল্প অল্প লালচে সূর্যের আলো কালো জলের ওপর পড়েছে। ও চান করতে নামল।

সন্ধ্যা বেশ গভীর হলে ও জল থেকে উঠল। প্রকাণ্ড লৌহবর্ম যেন একটা বিরাট সরীসৃপের মতো এঁকেবেঁকে পড়ে আছে। দূরে সিগন্যালের আলো অন্ধকারে লাল চোখের মতো জ্বলছে।

পরদিন সকাল সকাল ও মাস্টারমশায়ের বাড়ি গেল। মাস্টার-মশাই ওকে দেখে বললেন—

এসো আপ্পুন্নী, বোসো। তারপর তোমার এখন প্ল্যান কি? আরো

পড়ার কথা ভাবছ নাকি ?

—না, স্যার।

—তা হলে কী করবে ঠিক করেছ ?

—একটা চাকরি-বাকরি খুঁজতে হবে স্যার ?

—হ্যাঁ, চাকরি একটা চাই বৈকি। আমিও চেষ্টা করব কিন্তু চাকরি পাওয়া আজকালকার বাজারে খুবই মুশকিল— জানোই তো।

—চাকরি না পেলে—

আপ্পুন্নী থেমে গেল।

—কী ?

—চাকরি না পেলে মরে যাওয়া ভালো স্যার। এরকম ভাবে বেঁচে থাকার ··· ও কথাগুলো শেষ করতে পারল না।

—আমার এখানে ইংরাজী কাগজ আসে। বিজ্ঞাপন দেখে চাকরির দরখাস্ত দাও। বাইরে তোমার আত্মীয়স্বজন কেউ আছেন নাকি ?

—না স্যার, আমার কেউ নেই।

—সার্টিফিকেট আসুক তারপর দরখাস্ত দিয়ো।

এক সপ্তাহের মধ্যে সার্টিফিকেট এলো। সব বিষয়ে আপ্পুন্নী খুব ভালো নম্বর পেয়েছে।

মাস্টারমশাই বললেন—

—তুমি এত ভালো নম্বর পেয়েছ। তোমার আরো পড়া উচিত ছিল।

আপ্পুন্নী বেদনা-ভরা চোখে মাস্টারমশায়ের দিকে তাকাল। ইংরাজী কাগজে বিজ্ঞাপন দেখার জন্য আপ্পুন্নী রোজ মাস্টারমশায়ের বাড়ি যেতে আরম্ভ করল। মাসখানেক বাদে একটা বিজ্ঞাপন নজরে পড়ল। রেলেতে কয়েকজন ক্লার্ক চাই। মাস্টারমশাই তাতে দরখাস্ত পাঠাতে বললেন। কিন্তু দরখাস্ত ফর্ম কিনতে আর তা রেজিস্ট্রি করে পাঠাতে দেড়টা টাকা চাই। এ দেড়টাকা ও কোথা থেকে পাবে ? কুড়িদিন অবশ্য সময় আছে কিন্তু সময় থাকলে

কী হবে? টাকা কোথা থেকে পাবে? দেড়টা টাকা যে এত বেশি টাকা সেটা ও আগে কখনো ভাবে নি।

সেদিন চান করে নদীর তীর দিয়ে টাকার কথাটা ভাবতে ভাবতে আপনার মনে হাঁটছে, হঠাৎ একটা ছোটো ছেলে দৌড়ে এসে বলল—

আপনাকে ডাকছে।

—কে?

—সেয়দু আলি কাকা। ঐ যে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে।

আপ্পুন্নী খানিকটা গিয়ে সেয়দু আলি কুট্টিকে দেখতে পেল। কাছে এসে সেয়দু আলি বলল—

—আরে আপ্পুন্নী তুমি তো খুব বড়ো হয়ে গেছ! আপ্পুন্নী একটু হাসল। তারপর জিজ্ঞেস করল—

—কবে এলেন আপনি?

—কাল সন্ধ্যায়।

—এখন কোথায় আছেন আপনি?

—ভায়নাটে, তা ছাড়া আবার কোথায় যাব। তারপর তোমার খবর কি?

—ঐ চলছে একরকম।

—এখন কোন্ ক্লাসে পড়ছ?

—পড়া শেষ হয়ে গেছে। আমি ম্যাট্রিক পাস করেছি।

—ম্যাট্রিক পাস করেছ?

—হ্যাঁ।

—তা এখন কী করবে ঠিক করেছ?

—এখন···এখন একটা চাকরির সন্ধান করছি। আর তখনি দেড়টা টাকার কথা মনে হল। বলবে কি সেয়দু আলি কুট্টিকে টাকার কথাটা? কিন্তু আত্মসম্মান এসে বাধা দিল।

—চাকরি তুমি পাবে বৈকি।

—চাকরি পেতে হলে তদ্‌বির করার লোক চাই। টাকা-পয়সা খরচ করা চাই। আমার এ দুটো কোনোটাই নেই, আমার কেউ নেই।

সেয়দু আলি বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে নিঃশব্দে ওর কথা শুনছিল। ও যেন কী চিন্তা করছিল। হঠাৎ কথা পালটে ও জিজ্ঞেস করল,

—তোমাদের বাড়ির কেস কতদূর গড়াল?

—কী আর বলব? অন্য কোথাও যাওয়ার উপায় নেই তাই এখানে পড়ে আছি।

—কী সব আজেবাজে বকছ। শোনো, অত ভেবো না। খোদা নিশ্চয় এর কোনো একটা উপায় বার করবেন।

আপ্পুন্নী চুপ করে রইল।

—ঠিক আছে, আমি আর দুদিন এখানে আছি। সুবিধেমতো একদিন তোমার সঙ্গে দেখা করব।

আপ্পুন্নী ভিজে তোয়ালেতে মুখ মুছে হাঁটতে শুরু করেছে। সেয়দু আলি কুট্টি আবার ওকে ডাকল—

শোনো, সব জিনিসেরই একটা সময় আছে, আর সব সমস্যার সমাধান খোদাই করেন।

মাঠের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে আপ্পুন্নী নিজের মনে পরিহাসের হাসি হাসল।

—ভগবান সব-কিছুরই উপায় করে দেন। তাই, দেড়টাকার চিন্তায় ওর মন আজ ক্ষতবিক্ষত হয়ে আছে।

* * *

ভগবান যে কাকে কখন কি ভাবে পথ দেখান তা সত্যিই খুব আশ্চর্যের। আজ পর্যন্ত কেউ ওকে একটা চিঠি পর্যন্ত লেখে নি, সেদিন তাই মালয়ালম অক্ষরে পেন্সিলে ঠিকানা লেখা একটা চিঠি পেয়ে ও খুবই অবাক্ হয়ে গেল। খুলে দেখে সেয়দু আলি কুট্টির চিঠি।

—প্রিয় আপ্পুন্নী নায়ার,

তোমার কথা আমি এখানকার এস্টেটের ম্যানেজার মেননের কাছে বলেছি। মেনন আমাকে কথা দিয়েছেন যে তিনি তোমাকে কিছু একটা জোগাড় করে দেবেন। তুমি তাই আর দেরি না করে এখানে তাড়াতাড়ি চলে এসো। সার্টিফিকেট এবং আর যা যা

দরকার সব নিয়ে এসো। কালিকট থেকে মানন্তওয়াডী বাসে এসে বাজারের কাছে নামবে। ওখানে খোঁজ করলে আমার দোকান দেখিয়ে দেবে। আসার দিনের তারিখ জানিয়ে একটা চিঠি দিলে আমি ছেলেকে নিয়ে বাস স্টপের কাছে দাঁড়িয়ে থাকব। খোদা সহায় —সেয়দু আলি কুট্টি।

খোদা সেয়দু আলি কুট্টি স্বয়ং— এই কথাই ওর প্রথমে মনে হল। ভডাকেপাটের কোণের অন্ধকার সেই ঘরটা থেকে ও মুক্তি পেতে চলেছে। এই ভেবে ও খুবই খুশি হল।

ওর বন্ধুবান্ধব কেউ নেই, ওকে সাহায্য করার কেউ নেই, এ কথা যখন ও ভাবছিল তখন ওকে অপ্রত্যাশিত ভাবে হাত বাড়িয়ে দিল এমন একজন যার চিন্তা ও মনেই আনে নি। এখন সবচেয়ে দরকারি জিনিস হচ্ছে যে যাওয়ার খরচের জন্য কিছু টাকা চাই। কোথায় পাবে এ টাকা, কার কাছে চাইবে?

ও সোজা মাস্টারমশায়ের বাড়ি গেল। মাস্টারমশাই তখন বাগানে কাজ করছিলেন। আজ আর ওর কোনো লজ্জা বা দ্বিধা ছিল না। ও মাস্টারমশায়কে ওর চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনার কথা বলে তাঁর কাছে কিছু টাকা ধার চাইল।

মাস্টারমশার বললেন—

এ তো খুব সুখকর। আমি তোমাকে এক্ষুনি টাকাটা জোগাড় করে এনে দিচ্ছি। বোসো একটু।

মাস্টারমশাই সার্ট পরে যেন কোথায় বেরিয়ে গেলেন। খানিকক্ষণ পরে যখন ফিরে এলেন তখন হাতে দশ টাকার নোট।

—তোমার ভাগ্য ভালো আপ্পুন্নী। নাও এই দশ টাকা।

কৃতজ্ঞতায় আপ্পুন্নীর চোখ জলে ভরে এল। কথা যেন আটকে গেছে। অনেক চেষ্টা করে বলল—

তা হলে আমি আসি স্যার।

হ্যাঁ এসো। Wish you good luck.

ঝড়ের বেগে আপ্পুন্নী হাঁটতে লাগল। কাল শুক্রবার। মহম্মদকে

একবার যাওয়ার কথা বলতে হবে। পরশুদিন সকালে রওনা হবে। আর যেন ওর এই গ্রামে ফিরে আসতে না হয়। আর যেন কখনো ওকে কোণের ওই অন্ধকার ঘরটায় শুতে না হয়।

মহম্মদের সঙ্গে দেখা করতে হবে। শুধু কি মহম্মদের সঙ্গে? নাঃ থাক্, সে-সব স্মৃতি হয়েই থাক্।

সে-রাতে বাড়িতে কাউকে কিছু ও বলল না। যাওয়ার আগে বললেই হবে। এত তাড়াতাড়ি কী দরকার? পরের দিন সকালে মহম্মদের বাড়ি গেল কিন্তু মহম্মদ বাড়ি ছিল না। ও মহম্মদের মাকে ওর গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা বলে চলে এল, জিনিস-পত্র বিশেষ-কিছু গোছাবার নেই, রাস্তায় পরে যাবার একটা সার্ট আর একটা মুণ্ড আলাদা করে রাখল। বাকী সার্ট আর মুণ্ডটা একটা থলেতে ভরল। নোংরা তোয়ালে, সার্টিফিকেট আর হেড্-মাস্টারের দেওয়া কনডাক্ট সার্টিফিকেটটাও ওর মধ্যে রাখল। সকাল সাড়ে নটায় বাস।

পরের দিন সকালে থলিটা নিয়ে ও দিদিমার ঘরের কাছে গেল।

—দিদিমা, আমি চললাম

—কোথায় রে আপ্পুন্নী?

—একটা চাকরির খোঁজ পেয়েছি।

—তাই নাকি? আহা. তোর ভালো হোক্। তা কোথায় কাজের খোঁজ পেলি?

—ভায়োনাটে।

—যাক্ এবার তোর দুঃখকষ্ট ঘুচল। ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন। তা বিদেশ-বিভূঁয়ে যাচ্ছিস, একটু সাবধানে থাকিস বাবা।

যাবার আগে ও একবার ওর কোণের ঘরটায় গেল। কিছু কি ভুলে গেছে? —না কিছুই ভোলে নি। তবু যেন কিসের একটা সন্দেহ বারান্দায় এলে পর দক্ষিণ দিকের ঘর থেকে বড়ো মাসী ডাকল,

—এই আপ্পুন্নী দাঁড়া, কিছু না বলে চলে যাচ্ছিস যে? —বড়োমাসীর কথায় যেন একটু স্নেহের আভাস।

—যা ফেন ভাত দেওয়া হয়েছে। খেয়ে যা।

আপ্পুন্নী খুব নির্বিকার স্বরে বলল—

আমার খিদে নেই।

—রাস্তায় খরচের জন্য যদি কিছু দরকার হয়—

মাসীর এই ঔদার্য ওকে অবাক করল না। এই তো সবে শুরু··· মুখ ফিরিয়ে না তাকিয়ে যেতে যেতে ও বলল— নাঃ পয়সার দরকার আমার নেই।

উঠোনে নেমে সদর দরজার দিকে অগ্রসর হয়ে একবার পেছনে তাকাল। বারান্দার কাছে দাঁড়িয়ে আছে মালু। মালুকে একবার বলে এলে হত। সদর দরজা খুলে বাইরে আসতেই সামনে কুট্টামামা আসছে দেখতে পেল। ও মামার দিকে না তাকিয়ে মাঠের আলের মধ্যে দিয়ে তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগল।

অষ্টম অধ্যায়

বাস পাকদণ্ডী বেয়ে বেয়ে ওপরে উঠছে। একপাশে সারি বাঁধা পাহাড় আর-একপাশে বনজঙ্গলে ভর্তি উপত্যকা। একটার পর একটা পাহাড়ের বাঁক উঠে একটা জায়গায় বাস থামলে পর আপ্পুন্নী বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখল। কী অপূর্ব দৃশ্য! একদিকে দুপুরের তীব্র রোদে সবুজ বনানী ঝল্‌মল্‌ করছে। অপর দিকে পাহাড়ের সারি। ও ওপর থেকে একবার নীচের দিকে তাকাল। পাহাড়ের গায়ে এঁকেবেঁকে ওঠা রাস্তার রেখা দেখা যাচ্ছে। নীচ থেকে লরীগুলো পাহাড়ের ওপর ঠিক যেন পিঁপড়ের মতো ওপরে উঠছে। পল্লীপুরম থেকে যখন ও বাসে উঠেছে তখন থেকেই ও যেন সম্পূর্ণ বদলে গেছে বলে ওর মনে হল। ও যেন একেবারে এক নতুন মানুষ। আগের সেই আপ্পুন্নী আর নয়।

বাস আবার চলতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে একসারি দোকানের কাছাকাছি এসে বাস থামল। কনডাক্টার আপ্পুন্নীকে বলল—

আপনাকে এখানে নামতে হবে।

আপ্পুন্নী বাস থেকে নামল। নারকেল পাতার ছাউনি দেওয়া কয়েকটা দোকান পরপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। টালি দেওয়া দোকান শুধু দুটো। এই নির্জন পার্বত্য প্রদেশে পর্যন্ত মানুষ দোকান-বাজার বসিয়েছে— আশ্চর্য! আপ্পুন্নী সেয়দু আলি কুট্টিকে আগে কিছু লেখে নি। এখন বাসটা চলে যেতে ওর মন কেমন যেন এক অজানা আতঙ্কে ভরে গেল। ও প্রথম দোকানটায় জিজ্ঞেস করল—

সেয়দু আলির দোকান কোন্‌টা?

সে-দোকানের নাম কেউ জানে না। অপর একটা দোকানে গিয়ে জিজ্ঞেস করতে পাশের দোকানটা দেখিয়ে দিল। আপ্পুন্নীর একটু আশ্বাস হল। নারকেল পাতায় ছাওয়া একটা দোকান। দোকানের সঙ্গে লাগোয়া একটা ছোট্ট বাড়ি। দোকানে জিনিস কেনার

লোকজন কাউকে ও দেখতে পেল না। দোকানের সামনে একটা নয়-দশ বছরের ছেলেকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ও জিজ্ঞেস করল—

এটা কি সেয়তু আলি কুট্টির দোকান?

—হ্যাঁ, কী চাই আপনার?

—সেয়তু আলি কুট্টি নেই?

—আপনার কী চাই বলুন-না।

—সেয়তু আলি কুট্টির সঙ্গে দেখা করতে চাই।

ছেলেটা তখন চেঁচিয়ে ডাকল—

বাপ্পা* তোমায় ডাকছে।

—কে?—সেয়তু আলি কুট্টির গলা।

—কে জানে?

দোকানের পেছন দিককার দরজায় ঝোলানো চটের পর্দা সরিয়ে সেয়তু আলি কুট্টি বাইরে এল। আপ্পুন্নীকে দেখে অবাক্ হয়ে বলল

—আরে, এ যে নায়ারদের ছেলে!

আপ্পুন্নী একটু হাসল।

—এসো এসো, ভেতরে এসো। এই···একটা টুল দিয়ে যা।

আপ্পুন্নী কপালের ঘাম মুছে দোকানে উঠল।

—বেশ ছেলে তো তুমি! আসার আগে একটা চিঠি দিয়ে জানালে না কেন?

—আপনার চিঠি পেয়ে তাড়াতাড়ি চলে এলাম।

—তা ভালোই হয়েছে। পথে কোনো আপদ-বিপদ্ হয় নি তো?

—না, কিছু না।

সেয়তু আলি উঠে একবার ভেতরে গেল আবার তক্ষুনি বেরিয়ে এল।

আর-একটা টুলে বসে সেয়তু আলি আপ্পুন্নীকে ঐ জায়গাটার কাহিনী বলতে লাগল।

*কেরালার মুসলমানেরা বাবাকে বাপ্পা বলে

—এই বিজন পার্বত্য প্রদেশে ত্রিবাঙ্কুর থেকে অনেক খৃস্টান এসে আজ বেশ-কিছুদিন হল বসবাস করতে আরম্ভ করেছে। আরো ভেতরে গেলে সায়েবদের চায়ের বাগান। বাজারের দোকানগুলোর মালিক বেশির ভাগই খৃস্টান। নায়ারের একটা চায়ের দোকান আছে। একজন মুসলমানের একটা শুঁটকি মাছের দোকান আছে।

এই নির্জন জায়গায় বাজারহাট করার লোক আছে কিনা আপ্পুন্নী জানতে চাইল। প্রায় শ' পাঁচেক লোক এই জায়গা জুড়ে আছে। তাদের সব কেনাকাটা এই বাজার থেকেই করতে হয়। চা বাগানে স্টোর খোলার আগে এখানে ব্যাবসা খুব ভালো চলত। এখন কোনোরকমে চলে যাচ্ছে।

সেয়্দু আলি কুট্টির মুদীর দোকান। আরো একটা মুদীর দোকান কাছেই আছে। তাই সেয়্দু আলি কুট্টির একটু অসুবিধে। আজ তেরো বছর হল সেয়্দু আলি এখানে এসেছে। প্রথমে ও চা বাগানে কাজ করত তারপর শুঁটকি মাছ বিক্রি করেছে। যখন লোক এসে বসবাস করতে শুরু করল তখন মুদীর দোকান দিয়েছে। এখন ওর শুধু এই প্রার্থনা যে কোনোরকমে ওর দিন গুজরান হয়। দোকান আর বাড়ি ওর নিজের নয়। মাসে আট টাকা করে ভাড়া দিতে হয়। কিছু পয়সা হলে বাড়ি আর দোকান কিনে নেবে এইরকম একটা ইচ্ছে আছে। কিন্তু তা যে হবে সে আশা খুবই কম। সেয়্দু আলি কুট্টি বলে যাচ্ছিল, আপ্পুন্নী শুনে যাচ্ছিল। চটের থলের ও-পাশ থেকে একটা আওয়াজ এলো—

শুনছ ?

সেয়্দু আলি বলল—

চলো-আমরা একটু চা খেয়ে আসি। সেয়্দু আলি কুট্টি উঠল। আপ্পুন্নী ভেতরে যাবে কি যাবে না ভাবছে দেখে সেয়্দু আলি বলল—

আরে, ভেতরে শুধু আমরাই আছি। এসো, এসো। দরজা পেরিয়েই একটা ছোট্ট মতো জায়গা। সেখানে মেঝেতে দুটো গ্লাসে

দু গ্লাস চা। একটা গ্লাসের কাছে কলাপাতায় কলা ভাজা আর কলা।

—'বোসো' ব'লে ওকে একটা ভারী পিঁড়ে দেখিয়ে সেয়দু আলি কুট্টি বলল—

বাসে-ট্রেনে এতক্ষণ এসেছে, নিশ্চয়ই খুব ক্লান্ত। নাও, চা খাও।

আপ্পুন্নী একনিশ্বাসে চায়ের গ্লাস শেষ করল। দরজার কাছে একজন স্ত্রীলোক এসে দাঁড়ালো।

—পাতুম্মা, এ কে বলো তো?

—কে?

—আমাদের দেশের লোক।

—তাই নাকি? কে গো?

—আমাদের কোন্তুন্নী নায়ারের ছেলে আপ্পুন্নী।

—ওমা, তাই নাকি? আমি ওকে যখন দেখেছিলাম ও তখন এই এতটুকু ছিল।—সেয়দু আলি কুট্টির বউ ছোট্ট একটা মুরগীর ছানার মাপ দেখাল। সেয়দু আলি হাসল।

এর মধ্যে ওর ছেলেটা গল্প শোনার জন্যে বাবার কাছে এসে বসল। বাবা এক ধমক দিল—

যা দোকানে গিয়ে বোস, এখন লোক আসার সময়।

ছেলেটা চলে গেলে সেয়দু আলি একটু হেসে আপ্পুন্নীকে বলল—

ওকে আমি ব্যাবসা করা শেখাচ্ছি।

দোকানে দোকানে আলো জ্বালানো হচ্ছে। জানলার বাইরে সন্ধ্যার অন্ধকার আস্তে আস্তে ঘনিয়ে আসছে। নির্জন পাহাড়ের ওপর কুয়াশা ঘন হয়ে ঝুলছে।

চা খাওয়া শেষ হলে সেয়দু আলি কুট্টি বলল—

এখন দোকানে লোক আসার সময়। তুমি একটু বসো, আমি এই আসছি।

সেয়দু আলি বাইরে গেলে পর ওর বউ পাতুম্মা আপ্পুন্নীর সঙ্গে

গল্প করতে বসল। প্রথমে সে গ্রামের সকলের খবরাখবর জিজ্ঞাসা করল। আজ দু-বছর হল পাতুম্মা তার ছেলেমেয়ে নিয়ে গ্রাম ছেড়ে এসেছে। নিজেদের বাড়ি ছিল দেনায় বাঁধা। বাড়ি বিক্রি করে দেনা শোধ করে এখানে চলে এসেছে। এখন যতদিন না নিজেদের বাড়ি হয় ততদিন আর গ্রামে ফিরে যাবে না বলে ঠিক করেছে। তারপর আপ্পুন্নীকে জিজ্ঞেস করল—

পারকুট্টি আম্মা ভালো আছে তো?

আপ্পুন্নী মুখ নীচু করে বলল—হ্যাঁ।

—তোমাদের সব ঠিকমতো চলছে তো?

—হ্যাঁ।

পাতুম্মার পেছনে দুটো কালো বড়ো বড়ো চোখ আপ্পুন্নী হঠাৎ দেখতে পেল। পাতুম্মা পেছন ফিরলে ওর মেয়েকে আপ্পুন্নী ভালো করে দেখতে পেল। ফর্সা রোগা মেয়েটা, মুখে একটা মিষ্টি হাসি।

মা মেয়েকে বলল—

কী রে কী দেখছিস? আমাদের গাঁয়ের লোক।

মেয়েটা লজ্জায় মুখ সরিয়ে নিল। পাতুম্মা বলল—

নবীশা বড়ো, ওর জন্ম কুডালুরে।

আপ্পুন্নী বাড়িটার চারিদিকে একবার চোখ বুলাল। ঘরের ওপরে কড়িকাঠ নেই। বাড়ির চাল ঘাস দিয়ে ছাওয়া, দেয়ালে চুনকাম করা হয় নি। ভেতরে দুটো ঘরের দরজা দেখা যাচ্ছে। তার পাশে একটা ছোটো বারান্দা। সেখানে একটা লণ্ঠন ঝুলছে। তার পাশে রান্নাঘর। নবীশা রান্নাঘরে যাচ্ছে আসছে, আপ্পুন্নী দেখতে পেল। যতক্ষণ না সেয়দু আলি কুট্টি ফিরে এল, ততক্ষণ ওর বউ আপ্পুন্নীর সঙ্গে গল্প করল। আপ্পুন্নী যেন তার কতদিনের চেনা এমনি ভাবে পাতুম্মা তার সঙ্গে গল্প করছিল। সেয়দু আলি কুট্টি বলল—

আমার এখানে তোমার একটু অসুবিধে হবে। তা হোক। আমরা একটু কষ্ট করে চালিয়ে নেব, কি বল?

আপ্পুন্নী একটু হাসল। ও তো আর এখানে থাকতে আসে নি।

—চান করবে না ?

আপ্পুন্নী চান করবে কিনা ভাবলো।

—চান করার এখানে খুব সুন্দর একটা জায়গা আছে। একটু গেলেই ছোট্ট নদী। জল খুব পরিষ্কার।

আপ্পুন্নী সার্ট খুলে তোয়ালে কাঁধে নিল। সেয়দু আলি বউয়ের কাছে তেল চাইল। পাতুম্মা তেল দিলে আপ্পুন্নী ওর রুক্ষ চুলে খুব করে তেল ঘষল।

—নবীশা, বাপ্পার টর্চটা দে।

নবীশা টর্চ নিয়ে এলে সেয়দু আলি কুট্টি টর্চটা নিয়ে আগে আগে চলল, পেছনে আপ্পুন্নী।

বেশ খানিকটা হাঁটার পর একটা জায়গায় পাথরের নুড়ির মধ্যে কুলুকুলু শব্দ শোনা গেল। জল অনেকটা নীচে। ওপরে অবারিত মুক্ত আকাশ। দূরে অনেকগুলো গাছ জায়গাটাকে ঘন অন্ধকার করে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের গায়ে হাজার হাজার জোনাকির আলো জ্বলছে। কী অপূর্ব দৃশ্য। এই জঙ্গুলে শীর্ণ নদীর এক ধারে দাঁড়িয়ে আপ্পুন্নী অন্ধকারে ঢাকা সেই পর্বতমালার বিরাট সৌন্দর্যের দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

বেশ ঠাণ্ডা, সমস্ত ক্লান্তি যেন জুড়িয়ে গেছে। ওর আর জলে নামতে ইচ্ছে করছিল না। ও জলের মধ্যে একটা পাথরের ওপর বসল। সেয়দু আলি কুট্টিও ওর পাশে আর-একটা পাথরে বসল। আপ্পুন্নী ওর চাকরির কথা ভাবছিল। সেয়দু আলি কুট্টি যেন ওর মনের কথা বুঝতে পারল।

—কালকে আমরা মেননের সঙ্গে দেখা করব। এস্টেটের সাহেব বিলেত চলে গেছে। মেননই এখন সব।

—কাজ কি হবে ?

—না হলে কি আর আমি তোমায় লিখি ? তোমার কষ্টের কথা কি আর আমি জানি না।— তারপর একটা বিড়ি ধরিয়ে বলল—

—আমি বললে মেনন আমার কথা রাখবে। গাঁয়ে আমাদের বাড়ি পাশাপাশি বললেই হয়।

সেয়দু আলি কুট্টি শঙ্কর মেননের গল্প করল। কুডাল্লুর থেকে ওর বাড়ি পাঁচ-ছয় মাইল দূরে। মেননের সঙ্গে ওর পরিচয় দেশে থাকতেই। সেয়দু আলি কুট্টি অনেকবার ওর অনেক কাজ করে দিয়েছে। অনেক মাছও খাইয়েছে। আপ্পুন্নির সন্দেহ তবু যায় না। বড়ো বড়ো লোকে এ-সব ছোটোখাটো উপকারের কথা মনেও রাখে না। আপ্পুন্নির মনোভাব বুঝে সেয়দু আলি কুট্টি বলল—

মেনন সেয়দু আলি কুট্টিকে কখনো ভুলে যাবে না।

আপ্পুন্নি এ কথার মানে জিজ্ঞেস করার আগেই সেয়দু আলি কুট্টি ওকে এক কাহিনী শোনাল। সেয়দু আলি যখন প্রথম দেশ থেকে এখানে আসে তখন শঙ্কর মেনন আনামালাই-এর একটা চায়ের বাগান থেকে এখানে বদলী হয়ে এসেছে। সেয়দু আলি ওর সঙ্গে গিয়ে দেখা করতে মেনন ওকে পাঁচটা টাকা দিল। কিন্তু টাকার চেয়ে দরকার ছিল ওর চাকরির। দেশে থাকতে ও মেননকে কত মাছ খাইয়েছে সে কথা মেনন বোধহয় ভুলে গেছে। লোকের যখন অবস্থা ভালো হয় তখন তাদের স্মৃতিশক্তিও কমে যায়।

সেয়দু আলি কুট্টি মেননকে খুব বিরক্ত করতে লাগল। মেনন তখন ওকে চা বাগানের কুলীর কাজ দিল। প্রত্যেক দিন এক টাকা করে মজুরী। মেনন ছিল তখন সহকারী ম্যানেজার। থাকার একটা খুব বড়ো বাংলো মেনন পেয়েছিল। সেই বাংলোর রান্নাঘরের বারান্দায় সেয়দু আলি কুট্টি শুতো। তখনো মেননের বিয়ে হয় নি। তাকে নিয়ে নানা গুজব শোনা যেত, সেয়দু আলি কুট্টি তাতে বেশি কান দিত না। কিন্তু বাড়িতে যখন একটা নতুন ঝি এলো তখন মেননের সম্বন্ধে সেয়দু আলির মত বদলে গেল। মেয়েটা যুবতী, জাতেও নায়ার নয়। মেয়েটার কাজকর্ম বিশেষ-কিছু ছিল না। রান্না করার একটা লোক ছিল। এটা-ওটা করার জন্য বাগানের অনেক

লোক ছিল। মেয়েটা শুধু মেননের খাবার নিয়ে গিয়ে টেবিলে রেখে দিত।

ওপরে একটা মাত্র ঘর ছিল। মেয়েটা সব সময় ওপরে থাকত। অন্য সব ঝি-চাকরেরা যেন এ-সব কিছু দেখেও দেখছে না এমন ভাব করত। সেয়দু আলি কুট্টি এর মধ্যে ওখান থেকে চলে গিয়ে অন্য জায়গায় একটা বাসা ভাড়া করেছে। বেশ কিছুদিন পরে শুনতে পেল নতুন ঝি আর ওপর থেকে নামে না। এর দু-একটা মাস পরে মেননের বাট্‌লার গোপালন এক রাতে এসে সেয়দু আলি কুট্টিকে ডেকে মেননের বাড়িতে নিয়ে গেল। রাত তখন দশটা। মেনন সিগারেট টানতে টানতে বারান্দার এদিক থেকে ওদিকে একটু চঞ্চল হয়ে হাঁটাহাঁটি করছে। মেনন সেয়দু আলিকে একটা ঘরের মধ্যে ডেকে নিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে বলল—

তোমাকে আমার একটা কাজ করতে হবে।

—কী কাজ?

—বলছি বসো। ব'লে মেনন বেরিয়ে গেল। কতক্ষণ যে ও ঘরে বসে ছিল তার হিসেব ওর ছিল না। চমক্ ভাঙল মেননের গলার আওয়াজে। ওকে ওর সঙ্গে আসতে বলে মেনন ওপরে উঠতে লাগল। সেয়দু আলি ওর পিছন পিছন উঠতে লাগল।

ওপরের ঘরের খাটে বাড়ির ঝিটা শুয়ে রয়েছে। সারা দেহ তার চাদরে ঢাকা। অল্প অল্প গোঙানি শোনা যাচ্ছে। তারপর হঠাৎ দেখে মেঝেতে, বাথরুমে, দরজায় রক্তের রেখা। সেয়দু আলি কুট্টি খুব ভয় পেয়ে গেল।

মেনন ঘরের একদিক থেকে একটা পুঁটলি বাঁধা কী-একটা জিনিস ওর হাতে তুলে দিয়ে নিচু স্বরে বলল—

এটাকে নিয়ে গিয়ে মাটি চাপা দাও। কেউ যেন জানতে না পারে।

সেয়দু আলি কুট্টির ভয় ভাব তখনো কাটে নি। পুঁটলিটা হাতে নিয়ে

দেখে কী যেন একটা ঠাণ্ডা কোমল জিনিস। কাপড় সরিয়ে দেখে একটা শিশুর মৃতদেহ।

—রান্নাঘরের জ্বালানি কাঠগুলোর কাছে কোদাল আছে। তাড়াতাড়ি যাও— মেনন চাপা স্বরে বলল।

পুঁটলিটা নিয়ে সেয়দু আলি বাগানে গেল। এখন সেখানে একটা ফুলের গাছ দাঁড়িয়ে।

জল একেবারে বরফের মতো ঠাণ্ডা। আপ্পুন্নীর চান করতে ইচ্ছে করছিল না। সেয়দু আলি কুট্টিকে চান করতে দেখে ও শুধু একটা ডুব দিল। ফেরার সময় ও কিছুক্ষণের জন্য সব ভুলে গেল, শুধু সেয়দু আলি কুট্টির কথাগুলো ওর মনের মধ্যে গুঞ্জরন করতে লাগল।

—ওখানে এখন একটা ফুলের গাছ দাঁড়িয়ে।

এই সর্বপ্রথম ও আর-একজনের বাড়িতে পাত পেড়েছে। পুরোনো নিয়ম মানলে নায়ারের ছেলে হয়ে মুসলমানের ছোঁয়া জল পর্যন্ত খাওয়া নিষেধ। এখন একদিকে সেয়দু আলি কুট্টি অপর দিকে মহম্মদ কুট্টি—সামনে মোটা চালের গরম ভাত আর লঙ্কার রঙে রাঙা তরকারী। পরিবেশন করছে পাতুম্মা।

ভডাকেপাটের বাড়িতে বাইরে থেকে ঘুরে এলে চান করতে হয়। নীচু জাতের লোকদের কুয়োর ধারেকাছে যেতে দেওয়া হয় না। এখন পাতুম্মার পরিবেশন করা ভাত খেতে আপ্পুন্নীর একটুও খারাপ লাগল না। কত কী পুরোনো সংস্কার কত সহজে ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে।

শোওয়ার জন্য ওকে একটা মাদুর আর একটা বালিশ দেওয়া হল। বালিশের ওয়াড়টা ছিল একটা ধোওয়া ছেঁড়া ওড়না। তার থেকে আতরের একটা মৃদু সৌরভ ভেসে আসছিল।

—রাতে দরকার হলেই ডেকো। এই টর্চও রইল।

—ঠিক আছে।

—ভয় করছে না তো?

—উঁ…উঁ…।

—এখন ভয় করলে চলবে না। তুমি আর ছেলেমানুষটি নও। তুমি এখন এক জোয়ান পুরুষ। —সেয়দ্ আলি কুট্টি হাসল।

খুব ক্লান্তি লাগছিল। আঃ বাতাসটা কী ঠাণ্ডা! বালিশে মুখ গুঁজে আপ্পুন্নী ভাবল।

—অদৃষ্টের কী পরিহাস! যে মানুষটাকে আমি সবচেয়ে ঘৃণা করতাম তারই বাড়িতে আমি আজ অতিথি!

নবম অধ্যায়

পাঁচ-ছয় বছর কেটে গেছে কিন্তু আপ্পুন্নীর মনে হয় ও যেন এখানে কত কাল বাস করছে। গাঁয়ের নদী, ধানক্ষেত, কেয়া-ফুলের ঝোপ, সেই ছোট্ট টিলাটা সব যেন আজ কতদূরে। এতদিন ইচ্ছে করেই ও গ্রামের স্মৃতি ভুলতে চেয়েছিল। নালুকেট্টুর সেই ছোট্ট অন্ধকার ঘরটা। তার এককোণে একটা গুটোনো মাদুর— তার স্মৃতি ভুলতে চাইলেও কিন্তু ভুলতে পারে নি। নইলে আজ এতদিন পরে আবার কেন অতীতের দিকে পিছন ফিরে তাকাতে ইচ্ছে করছে? অতীতের সে স্মৃতি সুখপ্রদ নয়। জীবনের সে তিক্ততার স্বাদ ও কোনোদিনই ভুলবে না। ওর সহকর্মী ভাস্করণ, কুরুপ, জোসেফ সময় পেলেই ওদের ছোটোবেলাকার দিনগুলোর কথা বলে। ওদের ছাত্রজীবনের কথা বলে। ওদের কত কী বলার আছে। ওরা যখন গল্প করত, ও তখন চুপচাপ শুনত। ওর কিছুই বলার ছিল না।

এখানে যখন ও প্রথম এসেছিল তখন ওর হাতে একটা চটের থলে, দুটো সার্ট, দুটো মুণ্ড আর একটা নোংরা তোয়ালে। হঠাৎ সেয়দু আলি কুট্টির কথা ওর মনে পড়ল। সেয়দু আলি কুট্টি ওর জন্যে অনেক করেছে। পরের দিন সন্ধের সময় ওকে এস্টেটের ম্যানেজারের বাংলোয় নিয়ে গেছে। তার কাছে কথা নিয়ে তারপর সেয়দু আলি কুট্টি বাড়ি ফিরেছে।

এক সপ্তাহ মাত্র আপ্পুন্নীকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল। যখন শুনতে পেল যে ওকে ফিল্ড-রাইটারের পোস্ট দেওয়া হচ্ছে তখন ও দরখাস্ত পাঠিয়েছিল. যখন কাজে ঢুকেছিল তখন মাইনে ঠিক হয়েছিল 145 টাকা। থাকার জন্য কোনো বাড়ি ভাড়া দিতে হবে না। প্রথমে পরিচয় হয়েছিল ভাস্করণ নাম্বিয়ারের সঙ্গে। নাম্বিয়ারের কোয়ার্টার্সে ওর জায়গা মিলল। মাসে 145 টাকা

মাইনে। জীবনে তখন পর্যন্ত ও 100 টাকার একটা নোট দেখে নি।

ভাস্করণ নাম্বিয়ার বলল—

—মন্দ কি মাইনে, এর ওপর আবার বছরে পাঁচ-ছয় মাসের বোনাস পাওয়া যাবে। ঐটাই একটা বড়ো লাভ।

বোনাস কী? না, একবছর কাজ করলে পাঁচ-ছয় মাসের মাইনে আলাদা পাবে। পরে আব্রাহাম জোসেফের সঙ্গে পরিচয় হল। প্রথম মাসটা একটু গোলমাল লাগছিল তারপর সব ঠিক হয়ে গেল।

145 টাকা হাতে পেয়ে অত টাকা দিয়ে যে ও কী করবে ভেবে পেল না। থাকা-খাওয়ার খরচ 43 টাকার মতো পড়ে। আস্তে আস্তে নতুন জীবনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিচ্ছিল।

চাকরটা এসে বলল—

চানের জল গরম করেছি।

—আসছি।

বাইরে চা-বাগানগুলো অন্ধকারে আস্তে আস্তে মুছে যাচ্ছে। কাপড় ছাড়তে হবে, চান করতে হবে, খেতে হবে, কিন্তু আরাম কেদারা ছেড়ে যেন উঠতে ইচ্ছে করছে না। বসে বসে অতীত দিনগুলোর কথা ভাবতে যেন বেশ লাগছে।

মাইনে পাওয়ার পরদিনই ও সেয়দু আলি কুট্টির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। ও যখন সেয়দু আলি কুট্টির দিকে একগোছা নোট এগিয়ে দিয়েছিল, সেয়দু আলি কুট্টি সে টাকা নেয় নি। ওকে বলেছিল—

এভাবে টাকা নষ্ট কোরো না। তোমার সারা জীবন এখন সামনে। ভবিষ্যতের জন্য কিছু রাখতে হবে।

টাকা জমাতে হবে এই ছিল ওর প্রথম থেকে সংকল্প। প্রয়োজন ছাড়া কিছুই খরচ করত না। দেশের খবর অনেকদিন পায় নি। চাকরি পাওয়ার পর মাস্টারমশায়কে একটা চিঠি লিখেছিল, তার উত্তর পাবার পর আর-একটা লিখেছিল কিন্তু সে চিঠির উত্তর পায় নি। পরে জেনেছিল মাস্টারমশাই ওখান থেকে বদলী হয়ে গেছেন।

আজ বেশ কিছুদিন হল মনের মধ্যে দেশে যাবার একটা প্রবল ইচ্ছে জাগছে। বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে নয়, এমনিই। দেশে ওর কোনো প্রিয়জন নেই। কেউ ওর প্রতীক্ষায় বসে নেই। তবু একবার দেশে যেতে মন বড়ো চাইছে। ভডাকেপাটের বাড়িতে গিয়ে একবার উঠবে। তারা সকলে দেখুক যে, যে আপ্পুন্নীকে তারা দূর ছাই করেছে। তাকে এতটুকু স্নেহ বা ভালোবাসা দেখায় নি, সেই আপ্পুন্নী আজ কি ভাবে নিজেকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। কি ভাবে আজ সে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। আর-একবার সে মাঠের আলের মধ্যে মাথা উঁচু করে হাঁটবে। দেখো তোমরা সবাই তোমাদের সেই কেউকেটা আপ্পুন্নীকে দেখো।

যাবার আগে সেয়্দু আলি কুট্টির সঙ্গে দেখা করতে হবে। আজ প্রায় আট-ন মাস হল তার সঙ্গে দেখা হয় নি। আগে আগে সেয়্দু আলির দোকানে সপ্তাহে একবার যেত। সেও মাঝে মাঝে আপ্পুন্নীর কাছে আসত।

চাকর আবার এসে তাড়া দিল—

জল ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

আপ্পুন্নী উঠে ঘরের মধ্যে গেল।

* * *

এস্টেটের রাস্তা সোজা গিয়ে বাস রাস্তায় মিশেছে। বাঁকের কাছে একটা বোর্ডে এস্টেটের নামটা লেখা রয়েছে। বাজারের কাছে সেয়্দু আলি কুট্টির দোকানের সামনে নামার পর আপ্পুন্নী বাইরে কাউকে দেখতে পেল না। দোকানের ভেতরে গিয়ে খোঁজ করল। সেয়্দু আলির ছেলেটা বলল—

বাপ্পা বিছানায়, আসুন, ভেতরে আসুন।

—কেন বিছানায় কেন? বাবার কী হয়েছে?

—বাপ্পার অসুখ।

আপ্পুন্নী চটের থলে সরিয়ে ভেতরে ঢুকল। একটা মাদুরে সেয়্দু আলি কুট্টি শুয়ে আছে। সেয়্দু আলিকে একেবারেই চেনা

যাচ্ছে না। ভীষণ রোগা হয়ে গেছে। মুখ শুকিয়ে গেছে। কণ্ঠার হাড়গুলো উঁচু উঁচু হয়ে আছে। আপ্পুন্নীকে দেখে সেয়্‌দু আলি কুট্টি একটু হাসল, তারপর বলল—

আপ্পুন্নী যে, কখন এলে? এসো বসো। বড়ো কষ্ট আমার। আর পারছি না।

—কী হয়েছে সেয়্‌দু আলি কুট্টি?

—বাত ব্যাধি। উঠতে পারি না। ডান হাতটা আর পাটা যেন অবশ হয়ে গেছে।

পাতুম্মা কাছে এসে চোখ মুছে বলল—

আজ তিনমাস হল বিছানায় এ ভাবে শোওয়া। পক্ষাঘাত, কবিরাজ বলেছে।

—আপ্পুন্নীকে বসতে একটা পিঁড়ে দাও।

—না না, পিঁড়ে চাই না, ব'লে আপ্পুন্নী সেয়্‌দু আলি কুট্টির বিছানায় বসল। একটু অপরাধীর মতো বলল, আমি কিছুই জানতাম না।

পাতুম্মা চোখ মুছতে মুছতে বলল—

আল্লা এই অবস্থা করেছেন। আজ কদিন ধরেই ভাবছি যে তোমার কাছে খবর পাঠাব।

পাতুম্মার মুখে আর হাসি নেই। দরজার কাছে এসে দাঁড়াল নবীশা। ওকেও কেমন যেন শুকনো শুকনো রোগা রোগা দেখাচ্ছে। আপ্পুন্নী চুপচাপ বসে রইল।

—এখন আমি উঠে বসতেই পারি না। এদের যে সব কী হবে।—সেয়্‌দু আলি কুট্টি বলল।

আস্তে আস্তে পাতুম্মা সব বলল। দোকানে বিক্রি একেবারেই হচ্ছে না। আজ পাঁচমাস হল দোকানের ভাড়া দেওয়া হয় নি। যে-কোনোদিন উঠে যেতে বলতে পারে।

—আর যে কী কপালে আছে তা খোদাই জানেন।

সকলেই নিঃশব্দে বসে রইল। কিছুক্ষণ পরে সেয়্‌দু আলি কুট্টি বলল—

পাতুম্মা, একটু চায়ের চেষ্টা দেখ।

আপ্পুন্নী তাড়াতাড়ি বলল—

না, না। আমার চা চাই না। এক্ষুনি চা খেয়ে এসেছি।

পাতুম্মা রান্নাঘরে ঢুকল।

পাতুম্মা চলে যেতে সেয়দু আলি কুট্টি বলল—

আপ্পুন্নী, এ সবই খোদার লীলা। যেমন খারাপ কাজ করেছি তেমন শাস্তি পাচ্ছি।

আপ্পুন্নী সেয়দু আলি কুট্টির দিকে চাইতে পারল না।

—আমি একটা খুবই খারাপ কাজ করেছি। তাই আল্লা আজ এভাবে আমাকে শাস্তি দিচ্ছেন।

সেয়দু আলি কুট্টিকে যে কী বলবে আপ্পুন্নী তা ভেবে পেল না।

—তোমার বাবা আর আমি একদিন একথালা থেকে ভাত খেয়েছি।

আপ্পুন্নীর সারামুখ লাল হয়ে উঠল। চোখ দুটো রগড়ে বলল—

এখন আর ও-সব কথা বলে লাভ কি ?

—তুমি সব জানো না। জানলে···

—আমি সব শুনেছি। আমি সব ভুলেও গেছি।

এই সময় নবীশা সেয়দু আলি কুট্টির বিছানার নীচে থেকে দেশলাইটা নিতে এলে সেয়দু আলি কুট্টি কী যেন বলতে গিয়ে চেপে গেল।

খোদা কিছুই ভোলেন না। আমার চোখদুটো অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। উঃ একটা মেয়ের মতো মেয়ে, একটা ডাকাবুকো ছেলে। সবই তাঁর লীলা।

আপ্পুন্নী গলা পরিষ্কার করে অনেক কষ্টে বলল—

আপনি এ নিয়ে আর কষ্ট পাবেন না।

এই সময় পাতুম্মা একটা গ্লাসে চা নিয়ে এল। চায়ে চুমুক দিতে দিতে আপ্পুন্নী বলল—

আমি কাল দেশে যাচ্ছি।

সেয়তু আলি কুট্টি খুব খুশি হল। বলল—

খুব ভালো কথা। যাও, একবার ঘুরে এসো।

আরো কিছুক্ষণ পরে আপ্পুন্নী উঠে দরজার কাছে গেল। পাতুম্মা দেয়ালে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, কাছে নবীশা।

—সেয়তু আলি কুট্টির চিকিৎসার জন্য যা যা করার দরকার তা সব করবেন। দোকানের ভাড়া আমি কালই দিয়ে দেব। কাল সকালে মহম্মদ কুট্টিকে আমার ওখানে পাঠিয়ে দেবেন।

লম্পের অস্পষ্ট আলোতে আপ্পুন্নী দেখতে পেল পাতুম্মার চোখে জলের ফোঁটা চিক্‌চিক্‌ করছে। আপ্পুন্নী আরো একটু আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল— কিছু চিন্তা করবেন না। আমি থাকতে আপনাদের কোনো ভাবনা নেই।

আপ্পুন্নী সেয়তু আলি কুট্টির কাছে বিদায় নিল। দেশ থেকে ফিরে এসেই ওর সঙ্গে দেখা করবে বলে কথা দিল। আপ্পুন্নী যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছে তখন সেয়তু আলি কুট্টি ওকে ডাকল,

—আজ অনেকদিন হল তোমাকে একটা কথা বলব ভাবছি।

—কী কথা ?

—তোমার মার কথা তুমি ভুলে যেয়ো না। তার তুমি ছাড়া আর কেউ নেই।

আপ্পুন্নীর কপালে ঘাম ফুটে উঠল।

—দেখা হবে সেয়তু আলি কুট্টি—ব'লে ও তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল। রাস্তার দুপাশে দোকানে দোকানে আলো জ্বলে উঠেছে। সন্ধ্যায় বাজারের ব্যস্ততা বাড়ছে। আজ পাঁচ বছরে এ বাজারের বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয় নি। পাঁচ বছর আগে এখানেই ও সর্বপ্রথম বাস থেকে নেমেছিল। পুরানো একটা সার্ট আর মুণ্ড পরে একটা চটের থলে হাতে ঝুলিয়ে ও বাস থেকে নেমে বিহ্বলভাবে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিল। সে আজ পাঁচ বছর আগেকার কথা।

পরের দিন সন্ধ্যার সময় ও পাল্লীপুরম স্টেশনে নামল। কুলির

মাথায় ওর বড়ো সুটকেসটা আর হোল্ডঅলটা চাপিয়ে দিয়ে ও সোজা হাঁটতে শুরু করল। পৌনে এক মাইল গেলেই করুন্নুর পোল পড়বে। পোলের নীচে পৌঁছে একবার ভালো করে তাকিয়ে দেখল বড়ো বড়ো থামগুলো জলের মধ্যে অর্ধেকটা ডুবে আছে। নদীর জল ঘোলাটে। জলের মধ্যে নানারকম লতাপাতা খড়কুটো ভেসে যাচ্ছে। খালি চুপড়ী হাতে তিন-চারটে লোক নদীর ধারে বসে ছিল, তারা একবার ওর দিকে চেয়ে দেখল।

নদী পার হয়ে ওকে ওপারে যেতে হবে। নৌকোটা তখন ওপারে। এখন কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। আপ্পুন্নী পাড়ে দাঁড়িয়ে এদিক্ ওদিক্ দেখতে লাগল। কোনো কিছুই বদলায় নি। সব ঠিক আগের মতোই আছে। নৌকো এপারে এল। নৌকোয় লোকে ভর্তি। তারা নামলে পর আপ্পুন্নী উঠে বসল। কুলীও ওর জিনিসপত্র নিয়ে উঠে বসল। মাঝি আগেকার চেনা লোক নয়। আপ্পুন্নী নৌকোয় উঠলে পর মাঝি হাঁ করে ওকে আর ওর জিনিসপত্রগুলো দেখতে লাগলো। দুটো লোক এই সময় ছুটে নৌকো ধরতে এল। তারা নৌকোয় উঠলে মাঝি নৌকো ছেড়ে দিল। এই লোক দুটোও হাঁ করে তাকে দেখছে— আপ্পুন্নী ওদের দিকে না তাকিয়েও বুঝতে পারলে। একটা লোক আপ্পুন্নীর কুলিটাকে জিজ্ঞেস করল—

কোথায় যাওয়া হচ্ছে?

—ওপারে।

স্বর একটু নামিয়ে আবার জিজ্ঞেস করল—

ভদ্রলোকটি কে?

—জানি না। রেলগাড়ি চড়ে এসেছেন।

দ্বিতীয় লোকটি তেমনি নীচুস্বরে বলল—

কোনো বড়োলোকের ছেলেটেলে হবে বোধহয়।

অপর পারে পৌঁছে আপ্পুন্নী আগে নামল। অপর যাত্রীদুটি

ওকে সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দিল। আপ্পুন্নী একটা আধুলি মাঝির দিকে ছুঁড়ে দিল।

—আমার কাছে খুচরো নেই বাবু।

—রেখে দাও তোমার কাছে ও পয়সা।

বুড়ো মাঝির চোখ দুটো জ্বলজ্বল করতে লাগল। অপর যাত্রীদুটি শ্রদ্ধা আর সম্ভ্রম মেশানো দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল।

রাস্তা দিয়ে আপ্পুন্নী কোনো দিকে না তাকিয়ে সোজা মাথা উঁচু করে হাঁটতে লাগল। মাঠে ধানকাটা শেষ হয়ে গেছে। আলের ওপর দিয়ে হাঁটার সময় ও একটা সিগারেট ধরাল। একটা বুড়ো লোক উল্টো দিক দিয়ে আসছিল, ওকে দেখে সসম্মানে পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াল।

দূর থেকে নালুকেট্টুর সদর দরজার গেটটা দেখা যাচ্ছিল। আপ্পুন্নী একটু তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগল। সদর দরজার গেট খুলে ও উঠোনে নামল। বাইরে কাউকে দেখতে পেলনা। একটুখানি সন্দেহ হওয়াতে ও খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। উত্তর দিকের উঠোনটায়ও কাউকে দেখতে পেল না। ও বাইরের বারান্দায় লাফ দিয়ে উঠে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলো,

—এ বাড়িতে কেউ নেই নাকি?

কোনো উত্তর নেই। ও ভেতরের দালানে আসার পর দেখতে পেল দরজা বন্ধ।

আবার ও উঠোনে নামল তখন ওর নজরে পড়ল গোলাবাড়ি আর নালুকেট্টুর মাঝের উঠোনটায় একটা কাঁটার বেড়া, ও তখন পশ্চিম দিকের উঠোনটায় গেল। ওখানে আরো একটা বেড়া দেখতে পেল। গোলাবাড়ি আর বারবাড়ির মাঝে এই বেড়া। বারবাড়ির উঠোনে একজন স্ত্রীলোক কী যেন একটা কাজ করছে, স্ত্রীলোকটি পেছন ফিরে কাজ করছে বলে আপ্পুন্নী ঠিক চিনতে পারল না। ও একটু কাশলো। স্ত্রীলোকটি পেছন ফিরে তাকাতে দেখে মীনাক্ষী মাসী! মীনাক্ষী মাসী কুলোটা মাটিতে রেখে উঠে দাঁড়াল।

খুব অবাক্ হয়ে মাসী ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে দেখে আপ্পুন্নী বলল—

কী মীনাক্ষী মাসী আমাকে চিনতে পারছ না ?

—আপ্পুন্নী !

মাসীর শুকনো শীর্ণ মুখে একটা আশ্চর্য সুন্দর হাসি ফুটে উঠল। মাসী বেড়ার কাছে এলে আপ্পুন্নী বলল—

মীনাক্ষী মাসী আমাকে চিনতে পারো নি তো ?

—তুই কত বড়ো হয়ে গেছিস আপ্পুন্নী !

আপ্পুন্নী নালুকেট্টু দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল—

ও-বাড়িতে কেউ নেই ?

—নালুকেট্টু মামার ভাগে পড়েছে। কখনো-সখনো আসে।

—আর এই গোলাবাড়ি ?

—কুট্টার আর মালুর। আজ একবছর হল ভাগাভাগি হয়েছে। কুট্টা সিঙ্গাপুরের রাঘবনকে গোলাবাড়ি বিক্রি করে দিয়েছে। এখন ওখানে কেউ থাকে না।

নালুকেট্টু দাদামশায়ের ভাগে আর গোলাবাড়ি কুট্টামামার, মীনাক্ষী মাসীর ভাগে এই বারবাড়িটা।

—আর বড়োমাসীর ভাগ ?

—দিদি আর তার ছেলেমেয়েরা তাদের বাড়িতে। তারপর বারবাড়িটা দেখিয়ে বলল—

এটা আমার ভাগের।

আপ্পুন্নী বেড়া ডিঙিয়ে বারবাড়িতে এলো। কুলির মাথা থেকে জিনিসপত্র নামিয়ে বাইরের সিঁড়িতে রাখল তারপর তাকে পয়সা দিয়ে বিদায় করল।

মীনাক্ষী মাসীর পেছন পেছন আপ্পুন্নী ভেতরে ঢুকল। নারকেল পাতায় ছাওয়া এই বারবাড়ি আগে ধান রাখার, ধান ঝাড়ার জন্য ব্যবহার করা হত। এখন ভেতরে দেয়াল তুলে তিন ভাগ করা হয়েছে।

—কে রে মীনাক্ষী ?

ভেতর থেকে একটা ক্ষীণ আওয়াজ শোনা গেল।

—কে ? আপ্পুন্নী জিজ্ঞেস করল।

—মা।

আপ্পুন্নী দেয়ালের অপর পাশের ঘরটায় গিয়ে দেখে দিদিমা একটা মাছুরে কম্বল ঢাকা দিয়ে শুয়ে আছে।

—কে রে মীনাক্ষী ?

আপ্পুন্নী দিদিমার বিছানার কাছে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে বলল—

দিদিমা আমি, আপ্পুন্নী।

দিদিমা অনেক কষ্টে উঠে বসল। শুষ্ক শীর্ণ তুটো হাত। সারা মুখ জরায় ভরা। চুলগুলো ছোটো ছোটো করে ছাঁটা। দিদিমা ওর দেহে হাত বুলিয়ে বলল—

আপ্পুন্নী, তুই তা হলে ফিরে এলি !

আপ্পুন্নী চুপ করে রইল।

—দিদিমার আর বেশি দিন নেই রে। চোখ তুটোয় ছানি পড়েছে। এখন যত তাড়াতাড়ি ভগবান ডেকে নেন, ততই ভালো।

দিদিমা আবার ওর মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে বলল—

তুই তো খুব বড়ো হয়ে গিয়েছিস রে।

—চার-পাঁচবছর পর দেখছ কিনা তাই।

ওখান থেকে বসে রান্নাঘরটা দেখা যাচ্ছিল। চার-পাঁচটা মাটির হাঁড়ি। তুটো কাঁসার থালা। একটা কড়া আরো সব কি খুচি খাচি। কিছুক্ষণ পরে আপ্পুন্নী উঠে বাইরের ঘরটায় এলো। মীনাক্ষী মাসী দরজার কাছে বাইরের দিকে শূন্যমনে তাকিয়েছিল। আপ্পুন্নীকে দেখে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল—

সবই ভাগ্য। শেষ সময়ে একজন ছিল সেও চলে গেল। তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলল—

যারা গেছে তাদের তুঃখকষ্ট ঘুচেছে।

—কুট্টামামা আর মালু এখন কোথায় ?

—ভডাকেমুরায় ।

আপ্পুন্নীর চোখ ভাঙা দেয়াল, গোবরলেপা উঠান, বেড়ার গায়ে ছেঁড়া কাপড়ের ওপর ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে নালুকেট্টুর ওপর গিয়ে পড়ল । নালুকেট্টু তালাচাবি বন্ধ । মীনাক্ষী মাসী জিজ্ঞেস করল—

আপ্পুন্নী, তুই ছুটি নিয়ে এসেছিস নাকি ?

—হ্যাঁ ।

—এখানে তুই থাকতে পারবি না । দিদির কাছে যাবি নাকি ?

—আমি এখানেই থাকব মীনাক্ষী মাসী । আমার জন্য তোমাদের কোনো অসুবিধে হবে না ।

মীনাক্ষী মাসী ভাবলেশহীন মুখে বলল—

আমার কোনো কিছুতেই অসুবিধে হয় না ।

আপ্পুন্নী সার্টটা খুলে দেয়ালে রাখা বাঁশের আলনায় ঝুলিয়ে রাখল । সুটকেশটা একদিকে সরিয়ে রাখল । তারপর ব্যাগ খুলে একটা দশ টাকার নোট মীনাক্ষী মাসীর হাতে দিয়ে বলল—

যা যা দরকার সব কেনো ।

শুক্লপক্ষের রাত । আশ্বিন মাসের জ্যোৎস্না । ভাত খাওয়ার পর রাতে আপ্পুন্নী উঠোনে পায়চারি করছিল । এ-বাড়ির পেছনেই সর্প মন্দির । সেখানকার বড়ো বড়ো গাছগুলোর মধ্যে জ্যোৎস্নার আলো পড়ে একটা ভয় মেশানো সৌন্দর্যের সৃষ্টি করেছে । চারিদিক নির্জন ও শান্ত । ঝিরঝির করে একটা ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে । জ্যোৎস্নায় একটা চোখ গেল পাখি ডেকে আকাশের বুকে ভেসে চলে গেল । হঠাৎ একটা অজানা, অব্যক্ত দুঃখ ওর সারা মনটাকে ভরিয়ে দিল । যে আনন্দ, যে উৎসাহ নিয়ে ও বাড়ি ফিরেছিল সে আনন্দ যেন হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল ।

পরের দিন গ্রামের সকলে জানতে পারল যে আপ্পুন্নী আজ পাঁচ বছর পরে গ্রামে ফিরে এসেছে । আগেকার সেই আপ্পুন্নী নয়—

চা বাগানের বড়ো চাকরিঅলা বাবু আপ্পুন্নী। হাতে তার প্রচুর টাকা। রোজ নাকি একটা দশ টাকার নোট বার করে মীনাক্ষীর হাতে দেয়। পুলায়াদের ছোটো ছেলেটা রোজ সেই টাকা নিয়ে বাজার করতে আসে। লোকে বলতে লাগল মীনাক্ষীর কপাল ভালো, ওর দুঃখকষ্ট এতদিনে ঘুচল।

এর মধ্যে একদিন কৃষ্ণন্ কুট্টি এলো। কৃষ্ণন্ কুট্টি বেশ বড়ো হয়ে গেছে। আপ্পুন্নী জিজ্ঞেস করল—

কি খবর কৃষ্ণন্ কুট্টি? ভালো আছিস তো?

—হ্যাঁ।

ব্যস, ওখানেই কথাবার্তা শেষ হয়ে গেল। কৃষ্ণন্ কুট্টি খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আঙুল মটকাতে লাগল তারপর ভেতরে গিয়ে দিদিমাকে এক মিনিটের জন্য দেখে এসে বেশ লজ্জা লজ্জা ভাবে বলল—

আপ্পুন্নী দাদা, মা তোমাকে একবার যেতে বলেছে।

—কেন? কিজন্যে?

—বিশেষ কিছুর জন্যে নয়। তোমার যদি এখানে থাকতে অসুবিধে হয় তো আমাদের ওখানে গিয়ে থাকতে পারো মা বলে দিয়েছে।

—আমি এখানে খুব ভালোই আছি।

কৃষ্ণন্ কুট্টি আমতাআমতা করে বলল—

মা একবার তোমাকে দেখতে চায়।

আপ্পুন্নী সিগারেটটা শেষ করে মাটিতে ফেলে দিয়ে জুতো দিয়ে চাপতে চাপতে বলল,

—মাকে গিয়ে বল্ যে মার যদি আমাকে দেখার এতই ইচ্ছে থাকে তা হলে এখানে এসে যেন দেখা করে।

কৃষ্ণন্ কুট্টির মুখ শুকিয়ে গেল।

—আমি অনেক কিছু ঠেকে শিখেছি।

নদীর ধারের কাছে থাকে আবুবকর। ও একটা রুই মাছ নিয়ে

দেখা করতে এলে আপ্পুন্নী মীনাক্ষী মাসীকে তার দামটা দিয়ে দিতে বলল।

সারাদিন আপ্পুন্নী ঘরের মধ্যে বসে থাকে। এটা সেটা পড়ে আর সন্ধেবেলা উঠোনে পায়চারি করে।

মীনাক্ষী মাসী সেই আগের মতোই আছে। কিছু জিজ্ঞেস করলে উত্তর দেয়। নইলে চুপচাপ থাকে। সকাল বেলাটায়ই সময় কাটে না। রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর অনেকক্ষণ ও উঠোনে পায়চারি করে, মাঝে মাঝে উঠোনে জড়ো-করা কতকগুলো কাঠের ওপর বসে জ্যোৎস্নায় ধোওয়া সর্প মন্দিরের দিকে তাকিয়ে থাকে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে বহুদিন আগেকার এক অর্ধনগ্ন যুবতীর ছবি ওর চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সে এখন কোথায় আছে জানে না। মীনাক্ষী মাসীর কাছে জিজ্ঞেস করলেই জানা যায় কিন্তু জিজ্ঞেস করে না।

একদিন বেড়াতে বেড়াতে ও সেই টিলাটার ওপরে গিয়ে উঠেছিল। টিলাটার ঢালু ভাগটা ওর ভাগে পড়েছে। পাথরের নুড়ি আর ঝোপেঝাড়ে-ভরা এই এতখানি জায়গার ও মালিক। ভাগাভাগি কেমন ভাবে হল মীনাক্ষী মাসীর কাছ থেকে ও শুনেছে। উত্তর দিকের ধানের সব জমি দাদামশাই পেয়েছেন। দাদামশাই আর তাঁর ছেলেমেয়েদের চার অংশ ছিল। কুট্টামামা পেয়েছে গোলাবাড়ির অংশ। যাদের হয়ে কেউ বলবার ছিল না তারা বাদ বাকী অংশ পেয়েছে। টিলাটার ওপরে দাঁড়িয়ে আপ্পুন্নী স্বপ্ন দেখতে লাগল পাথরের নুড়ি আর কাঁটাগাছে ভর্তি টিলাটা একদিন কেমন ও ফসলে ফসলে সবুজ করে তুলবে।

কে একজন যেন টিলার ওপর উঠছে দেখতে পেল। টোকা মাথায় দিয়ে লোকটি ওপরে উঠছে। কাছে আসতে দেখতে পেল কুট্টা-মামা। কুট্টামামার মুখের ভাব আগের মতো কাঠখোট্টা নয়। সারা মুখ হাসিতে ভরিয়ে কুট্টামামা ওর কাছে এসে বলল—

আপ্পুন্নী কবে এলি?

—আজ দিন-চারেক হল।

—মীনাক্ষী বলছিল যে তুই এখানে আছিস। ওখানে বসে কথাবার্তা বলার সুবিধে হবে না তাই এখানে এলাম।

আপ্পুন্নী মনে মনে ভাবল, ওঃ, তা হ'লে বেশ কিছু দরকারী কথাবার্তা বলতেই মামা এসেছে!

—কী কথা?

—ভাগাভাগির পর অবস্থা খুব খারাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

—কারুরই কি ভালো হয় নি?

—আমি আর মালু উত্তরদিকে ঐ কুট্টাপনের জায়গায় আছি।

—হ্যাঁ, শুনেছি।

—আমার আর আগের মতো কাজ করার ক্ষমতা নেই। মেয়েটার কথা যখন ভাবি তখন মনটা বড়ো খারাপ হয়ে যায়।

আপ্পুন্নী শুধু বলল, হুঁ।

—মালুর তুই যেন প্রাণ···

আরো কী যেন বলতে গিয়ে কুট্টামামা চেপে গেল।

—আমি তার কী করব?

—ওর এখন তুইই একমাত্র ভরসা।*

আপ্পুন্নীর মনে পুরানো স্মৃতিগুলো ঘূর্ণি ঝড়ের মতো একবার মনের মধ্যে ঘুরে গেল। ও নিরাসক্তভাবে বলল—

আমার ওপর ভরসা করে আর কি হবে—আমি তো আর ছোটোখাটো একটা সাহেব হই নি।

কুট্টামামার মুখ চুন হয়ে গেল।

—তুই এরকম বাঁকা ভাবে কথা বলছিস যে?

—আমাকে দিয়ে এর বেশি কিছু বলিয়ো না।

কুট্টামামা আর একটা কথাও না বলে টোকা মাথায় দিয়ে নীচে

* নায়ারীদের মধ্যে মামাতো পিসতুতো ভাইবোনে বিয়ে হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক।

নামল। কুট্টামামাকে চলে যেতে দেখে ওর কেমন যেন একটা হিংস্র আনন্দ হল। দূরে একটা ছোট্ট নদী বয়ে যাচ্ছে। সেই দিকে তাকিয়ে আপ্পুন্নী কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল।

মালুর কথা মনে হতে কষ্ট হল। বেচারী মেয়েটা কিন্তু ... ভাবতে ভাবতে ওর মনটা যেন কেমন হয়ে গেল। মামার ওপর প্রতিশোধ নিয়ে এক্ষুনি যে আনন্দ ও উপভোগ করছিল তার জন্য ওর নিজের ওপর ঘৃণা হল।

মালু নিশ্চয় এখন অনেক বড়ো হয়েছে। অনেক বছর আগে ও প্রথম যেদিন নালুকেট্টুতে এসে পুবদিকের বারান্দায় একা বসে ছিল, তখন মালুই প্রথম এসে ওর কাছে বসেছিল। ওর সঙ্গে গল্প করেছিল। কালো, রোগা হাড়গিলে মেয়েটা। মালুর ওপর ওর সহানুভূতি আছে কিন্তু তার বেশি ও মালুকে কিছুই দিতে পারে না।

শুভ্র মেঘখণ্ডগুলোর মধ্যে দিয়ে চাঁদের আলো যখন ছড়িয়ে পড়ল ও তখন বাড়ি ফিরল। রাতে শোওয়ার সময় ওর চোখের সামনে কতকগুলি মুখের ছবি ভেসে উঠল। কাজলপরা দুটি টানাটানা চোখ। পিঠের ওপর সাপের ফণার মতো হেলছে দুলছে কালো চুল। অপূর্ব সুন্দরী একটা মেয়ে। বেদনায় ভরা চোখদুটি দিয়ে তাকিয়ে থাকা একটা রোগা কালো মেয়ে।

বাড়ি আসার দিন-সাতেক পরে দাদামশায়ের সঙ্গে দেখা হল। উঠোনে সিগারেট মুখে ও যখন পায়চারি করছিল তখন নালুকেট্টুর সামনের দিক থেকে খড়মের শব্দ পাওয়া গেল।

—আপ্পুন্নী!

এই প্রথম আপ্পুন্নীর নাম দাদামশায়ের মুখ দিয়ে বার হল।

—আপ্পুন্নী, একবার এদিকে আয় তো।

—কেন?

—আয়-না একবার এদিকটা— স্বরটা খুব শান্ত।

আপ্পুন্নী অবাক্ হয়ে গেল। বাজপড়ার মতো যে দাদুর গলার

আওয়াজ ছিল সেই দাদুর স্বর এত শান্ত? আপ্পুন্নী যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না।

—আমি এখান থেকেই শুনছি।

বেড়ার এ পাশে এসে ও দাঁড়াল। ওর সারা দেহমন রাগে জ্বলছিল। নিজের অস্বস্তিভাব লুকোবার জন্যে ও আঙুল মটকাতে লাগল।

দাদুর মুখে আগেকার সেই কাঠিন্য আর নেই। দেহ আর মন দুইই ক্ষীণ হয়ে এসেছে, দেখলে তা বোঝা যায়। আপ্পুন্নীর চোখে চোখ রাখতে যেন দাদামশায়ের কষ্ট হচ্ছিল।

—আজ তিন-চারদিন হল ভাবছি যে একবার তোর সঙ্গে দেখা করব।

—কেন?

দাদুর বার্ধক্যপ্রপীড়িত জীর্ণ-শীর্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে আপ্পুন্নীর অনেকদিন আগেকার সেই ঘটনার কথা মনে পড়ল। সেদিন দাদু ওকে একটা ঘেয়োকুকুরের মতো গলা ধাক্কা দিয়ে বার করে দিয়েছিল, বাড়ির কাছাকাছি দেখতে পেলে পায়ের হাড় ভেঙে দু-টুকরো করে দেবে বলে ভয় দেখিয়েছিল। সেই মানুষটার দোর্দণ্ডপ্রতাপ আজ কোথায় গেল? কী অদ্ভুত শান্তভাবে মানুষটা তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

—আমি একটা দরকারে এসেছি।

—কি দরকার?

—ভাগাভাগির পর এই বাড়ি আমার ভাগে পড়েছে। পূর্ব-পুরুষের ভিটে। বাড়িতে কুলদেবতা ভগবতী রয়েছেন, সে-বাড়ি অন্যের হাতে যাওয়া ভালো নয় বলেই আমি নিয়েছি।

—ভালোই করেছেন।

—বাড়ির ওপর পাঁচশো টাকার দেনা রয়েছে। সেটা এখন কোর্টে উঠেছে।

আপ্পুন্নী কোনো কথা না বলে চুপচাপ শুনে যাচ্ছিল। একটু চুপ করে থেকে দাদামশাই আবার বললেন—

দশ তারিখের মধ্যে টাকাটা না দিতে পারলে সম্পত্তি নীলাম করে নেবে। হাজার হোক্ পূর্ব-পুরুষের ভিটে।

আপ্পুন্নী আর-একবার শুধু 'হুঁ' বলল।

—কেনার জন্যে মুসলমানেরা হাঁ করে আছে। কিন্তু ভগবতীর প্রতিষ্ঠা রয়েছে যে বাড়িতে সে-বাড়ি মুসলমানের কাছে বিক্রি করি কী করে?

আপ্পুন্নী বেশ একটু রূঢ়স্বরে বলল—

আমি তার কী করব?

—তোর কাছে টাকা আছে শুনলাম। আমাকে পাঁচশো টাকা ধার দে, আমি বণ্ড লিখে দিচ্ছি।

বেড়ার কাছে করুণমুখ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা এক বৃদ্ধের ছবি ওর চোখের সামনে থেকে মুছে যাচ্ছে। বারান্দায় লাফ দিয়ে উঠে ওর গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দিচ্ছে ওকে এক বৃদ্ধ তার ছবি ওর চোখের সামনে ভেসে উঠছে।

—শুনুন, আমার একদম ইচ্ছে নেই যে আমাদের পূর্ব-পুরুষের এই ভিটে থাক্— রাগ আটকে আপ্পুন্নী বলল।

—আপ্পুন্নী, তুই বলছিস কী?

—আর-একবার তা হলে বলছি। আমার এতটুকুও ইচ্ছে নেই যে এই নালুকেট্টু এমনি উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এখান থেকে একদিন গলা ধাক্কা দিয়ে আমাকে আপনি বার করে দিয়েছিলেন। সে কথা আপনি ভুললেও আমি ভুলি নি।

দুজনের মধ্যে হঠাৎ একটা ঠাণ্ডা নিস্তব্ধতা নেমে এল। তারপর ভাঙা গলায় দাদু বললেন—

সে যা হবার হয়ে গেছে। আমি তার জন্য অনুতপ্ত। ও-সব কথা এখন তুই ভুলে যা আপ্পুন্নী।

—ভোলা অত সহজ নয়।

—কোনো দিকে যখন কোনো উপায় খুঁজে পাচ্ছিলাম না তখন তুই এসেছিস শুনলাম। কতদিন আগেকার ভিটে।

—আমার হাতে পয়সা আছে কিন্তু পয়সা দেবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছেও আমার নেই।

দাত্থ বেড়ার গায়ে হাত রেখে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন। আপ্পুন্নীও চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। দাত্থ যখন কিছু না বলে চুপচাপ চলে যাচ্ছেন তখন আপ্পুন্নী দাত্থকে ডাকল।

—দাঁড়ান একটু।

দাত্থ ফিরে দাঁড়ালেন।

—মুসলমানেরা কিনে নেবে বলে আপনার আপত্তি। যদি আমি কিনে নিই?

দাদামশাই চমকে উঠলেন। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে বললেন—

ভেবে দেখি।

—ভেবে দেখার কিছু নেই। এখন এই মুহূর্তে ঠিক করুন। দেখি আমি কিনতে পারি কিনা। বাড়ি আর জমি-জায়গার কত দাম চাই?

দাত্থ শুনে যেন শিউরে উঠলেন।

—বলুন—এ হচ্ছে ব্যাবসার কথা। যদি দামে পোষায় তো আমি কিনব।

দাদামশাই কিছু না বলে চুপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন দেখে আপ্পুন্নীর খুব রাগ ধরল।

—কী—আপ্পুন্নীর পয়সার দাম নেই বুঝি?

—না, না, তা নয়।

—তা হলে দাম বলুন। নালুকেট্টু ভেঙেচুরে শেষ হয়ে এসেছে। দাম বলার সময় এ-সব মনে রেখে বলবেন।

—পোকর হাজী চার হাজার টাকা দিতে চেয়েছে।

আপ্পুন্নী একটু ভাবল, তারপর বলল—

আলোবাতাস ঢোকে না এমন একটি বাড়ি এই নালুকেট্টু। মানুষ এখানে বসবাস করতেও পারবে না। তবু আমি চার হাজার টাকাই দেব। যদি আপনি রাজী থাকেন তা হলে দলিলপত্র লেখার ব্যবস্থা করুন।

দাত্বর মুখটা আরো নীচু হয়ে গেল।

—কী ঠিক করলেন ?

খুব কষ্টে আস্তে আস্তে দাত্ব বললেন—

ঠিক আছে, তাই হবে।

—তা হলে দলিলপত্র লেখার ব্যবস্থা করুন।

দাত্বর খড়মের শব্দ আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে। দাঁড়িয়ে ও তা শুনতে লাগল।

ঘরে এসে শুয়ে পড়লে পর মীনাক্ষী মাসী এসে জিজ্ঞেস করল,

—মামা চলে গেছে ?

—হ্যাঁ।

—মামার এখন সব দিক দিয়েই কষ্ট।

দাত্বর জন্যে মীনাক্ষী মাসীর এই দরদ আপ্পুন্নীর একটুও ভালো লাগল না।

—কেন, কষ্ট কিসের ? শ্বশুরবাড়ির সব সম্পত্তি তো আছে।

—না, তার জন্যে নয়। বেচারী মারা গেল ?

—কে মারা গেল ?

—ওঃ তুই বুঝি জানিস না ? প্রথম প্রসব করতে গিয়েই বেচারী…

—কে মীনাক্ষী মাসী ?

—গত আষাঢ়ে আম্মিন্নী মারা গেছে।

আপ্পুন্নী আর-কিছু জিজ্ঞেস করলনা। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে কাঁপা হাতে দরজাটা ধরে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে রইল ! দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে শুনতে পেল মীনাক্ষী মাসী বলছে,

—আহা বেচারী, বড়ো ভালো ছিল মেয়েটা।

* * *

নালুকেট্টুর বন্ধ দরজা আপ্পুন্নী খুলল। দক্ষিণ দিকটা অন্ধকারে ঢাকা। জানলাগুলো সব খুলে দিতেই ঘরের বাইরে থেকে এক ঝলক্ আলো ঘরের মধ্যে উছলে পড়ল। বদ্ধ বাতাসের কেমন যেন একটা গুমোট গন্ধ। মাঝের ছোট্ট উঠোনটা নোংরায় ভর্তি চয়ে রয়েছে। থামগুলো সব উইয়ে কেটে ফেলেছে। উত্তর দিকে একটু এগিয়ে গিয়ে ও থামল। কোণের সেই ঘরটা। ওই অন্ধকার ঘরটায় তিন বছর ও কাটিয়েছে। এ কথা ও যেন আর বিশ্বাস করতে পারছিল না। ওখানে দাঁড়ানোর সময় সেই আবছা অন্ধকারে কতকগুলো কাঁচের চুড়ির রিম্ ঝিম্ শব্দ ও শুনতে পেল। বেলফুল আর চন্দনের গন্ধ এখনো কি বাতাসে আটকে আছে? ঠিক ব্যথা নয়, সমস্ত মন যেন এক শূন্যতায় ভরে গেছে।

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠল। তালাচাবি বন্ধ একটা ঘর শুধু ও খুলল না। ওটা তাঙ্ক মাসী আর তার বরের ঘর। সেই সাজানো-গোছানো ঘরে এখন ইঁদুর লাফালাফি করছে। বাড়ির দেওয়ালগুলো ভেঙে এসেছে। এখানে ওখানে চুনবালি খসে পড়েছে। সারা বাড়িটা যেন মৃতদেহের মতো ঠাণ্ডা, স্তব্ধ। দিনেরবেলা হলেও আপ্পুন্নীর কেমন যেন গা ছম্‌ছম্ করছিল। কত পূর্ব-পুরুষের স্মৃতি-বিজড়িত এই বাড়ি। তাদের আত্মারা হয়তো এ বাড়ির চারিপাশে ঘোরাঘুরি করছে।

এই পুরানো নালুকেট্টুর মালিক এখন ও। পাঁচ বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে যে টাকা ও জমিয়েছিল তা সমস্ত এই বাড়ি কেনার পিছনে খরচ করেছে। টাকা সব খরচ হয়ে যাওয়াতে ওর এতটুকুও দুঃখ হয়নি বরং ও একটা খুব তৃপ্তিলাভ করেছে।

একদিন এই বাড়ি থেকে একটি মেয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। সে তার ভালোবাসার মানুষকে বিয়ে করেছিল বলে তাকে আর এ বাড়িতে ঢুকতে দেওয়া হয় নি। হঠাৎ চিন্তাসূত্র অন্য দিকে চলে গেল।

সেই স্ত্রীলোকটি আজ কোথায় ? কেমন ভাবে সে আজ তার জীবন-যাপন করছে ? বাড়ির বিনানুমতিতে সেই স্ত্রীলোকটি বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিল। তার জন্য তাকে সারা জীবন শাস্তি পেতে হয়েছে। সারা জীবন তাকে কষ্টভোগ করতে হয়েছে। কেউ তার দিকে ফিরে তাকায়ও নি। শুধু তাই নয়— তার শ্রাদ্ধশান্তি চুকিয়ে দিয়ে তার বাড়ির লোকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেছিল। সেই স্ত্রী-লোকটির ছেলে আজ সেই বাড়ির মালিক। বেদনার সঙ্গে তার মনে উদয় হল ঐ স্ত্রীলোকটি তার মা। সেই মাকে সে এতদিন ভুলে ছিল। বাবা মারা যাবার পর কত কষ্টে তাকে মানুষ করেছিল তার মা। বামুনদের বাড়ির ধান ভেনে, ধান সেদ্ধ করে তাকে বড়ো করেছে তার মা।

কী অকৃতজ্ঞ সে ! এ-সব সে ভুলে গিয়েছিল। কেউ যখন সে স্ত্রী-লোকটির দিকে সাহায্যের জন্য হাত বাড়িয়ে দেয় নি তখন শুধু একজন তার সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছিল। সে স্ত্রীলোকটি তো নিজের থেকে এ সাহায্য চায় নি। শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে যখন সে মাটিতে পড়ে যাচ্ছিল তখন তার হাত দুটি ধরে একজন তাকে সে পতন থেকে রক্ষা করেছিল। সে কি এমন-কিছু অন্যায় ? ও নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করল।

দোষ কার ?

এই নালুকেট্টু থেকে সেই স্ত্রীলোকটিকে তাড়িয়ে দিয়েছে যারা তাদের, না ওর ?

বাড়ির মধ্যে যেন দম বন্ধ হয়ে যাবে বলে ওর মনে হল। ঘামে নেয়ে আপ্পুন্নী সদর দরজার কাছে এল। বাতাস নেই। একটা পাতাও নড়ছে না।

এতদিন ধরে সে নিজেকে ভুল বুঝেছিল যে ওর কেউ নেই। এ পৃথিবীতে ও একেবারে একা। এ পৃথিবীতে ওর কেউ নেই এ কথা বলার সময় ওর মনে যেন কেমন একটা অহংকার জেগে উঠত। ওর তো অনেকেই আছে। তা হলে এতদিন নিজের সঙ্গে মিছে এ বঞ্চনা

কেন করেছে? অপরের কাছে ঋণের দেনা কি ওর শোধ হয়েছে? ঋণের এ শৃঙ্খল এখনো কি তাকে বেঁধে রাখে নি?

দূরে ভায়োনাটের পাহাড়ের ছায়ায় একটা ছোট্ট বাড়ির একটা ঘরে ওর মন চলে গেল। সেখানে ঘরের কোনো এক কোণে এক মুছলমান যুবক তার টাকা পয়সার হিসেব করছে। মন আবার আর-একটা জায়গায় উড়ে চলে গেল। সেখানে একজন শিক্ষক তার ক্লাসের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কত কী আলোচনা করছে। সম্পূর্ণ শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে ও বসে পড়ল। জীবনের লাভ-ক্ষতি জয়-পরাজয়ের হিসেব-নিকেশ করতে মন এতদিন বৃথাই চেষ্টা করছিল।